সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

৯০ বর্ষ ॥ প্রথম সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসরোজমোহন মিত্র

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৭০০০০৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

৯০ বর্ষ ॥ প্রথম সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসরোজমোহন মিত্র

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৭০০০০৬

॥ সূচীপত্র ॥

নিধিরাম আচার্য ও তাঁহার বিদ্যাসুন্দর কাব্য

শ্রীঅশোককুমার দেওয়ান

প্রাচীন বাংলা পুঁথি সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। অন্যান্য মংগল কাব্যের কাহিনীর ন্যায় এখানে কেবল স্বর্গলোকের দেবীমাহাত্ম্য প্রচারিত হয় নাই, মর্ত্যলোকবাসী মানব মানবীর সহজাত ভোগতৃষ্ণাই এই কাহিনীর প্রধান উপজীব্য। ইহার উপর বিভিন্ন কবিগণের রচিত বিবিধ কাব্যগ্রন্থসমূহ একসময় এত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল যে এগুলি রাজদরবারে সুধীমজলিসের সমাদর লাভ করা ছাড়াও দীনতম পল্লীতেও রসজ্ঞ গ্রামবাসীগণের রসের পিপাসা মিটাইত। কাহিনীর বিশেষ প্রকৃতির কারণে প্রকাশ্য সাহিত্য দরবার ছাড়াও এইগুলি তৎকালীন বাঙালী রক্ষণশীল সমাজে, অন্তঃপুরিকাগণের নিভৃত শয়নমন্দিরের যবনিকা ভেদ করিয়া কাব্য রসিকাদের উপাধানের তলে গোপন আশ্রয় লাভ করিত। আধুনিককালে আসিয়াও মানব রসে সিক্ত এই কাহিনী তার জনপ্রিয়তা হারায় নাই, যে জন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত "ওগো সুন্দর চোর বিদ্যা তোমার কোন সন্ধ্যার কনকচাঁপার ডোর" বলিয়া এই কাব্য কাহিনীর দুই নায়ক নায়িকাকে স্মরণ করিয়া "চৌর পঞ্চাশিকা" শিরোনামে একটি অনবদ্য কবিতা রচনা করিতে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র সহ খ্যাত অখ্যাত বহু প্রাচীন কবি বিভিন্ন ভাবে এই কাহিনীকে সংস্কৃত করিয়া অথবা অন্যান্যদের সহিত এই কাহিনীকে গ্রথিত করিয়া অন্নদামংগল, কালিকামংগল বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি বিভিন্ন শিরোনামে প্রচুর পুঁথি রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই সব পুঁথির কোন কোনটি বাংলার প্রত্যন্তসীমা ছাড়াইয়াও বিজাতি ও বিভাষীদের গৃহাভ্যন্তরে সমুন্নত আসন লাভ করিয়াছিল। তেমনি একজন স্বল্পখ্যাত কবি নিধিরাম আচার্যের স্বল্পালোচিত একটি পুঁথি "বিদ্যাসুন্দর" বা "কালিকামংগল" প্রসংগে এই নিবন্ধে আলোচিত হইতেছে।

এই পর্যন্ত নানা পুস্তক ও সাময়িকীতে বহু পণ্ডিত, গবেষক ও সমালোচক কর্তৃক বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর উৎপত্তি, ইহার রূপকার্থ, বিভিন্ন কবি ও তাঁহাদের কাব্য পরিচয় সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর প্রচুর আলোচনা হইয়াছে। অতএব নূতন করিয়া প্রসংগটি অবতারণার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। তদুপরি আজকাল আর আগের ন্যায় অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি কিংবা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ে পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীগণ ছাড়া সাধারণ পাঠকদের মধ্যে প্রাচীন পুঁথি সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ ও আকর্ষণ তেমন লক্ষ্য করা যায় না। তবে নূতনতর তথ্যাবলীর আলোকে এবং ভিন্নতর দৃষ্টি কোণ হইতে পুনর্মূল্যায়নের তাগিদে যে কোন বিষয়ের পুনরালোচনার প্রয়োজনীয়তা সর্বদাই থাকিয়া যায়। সম্প্রতি নিবিড় অরণ্যবেষ্টিত পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি উপজাতীয় পল্লীতে পূর্বোক্ত নিধিরাম আচার্যের রচিত চাকমা বর্ণে হস্তলিখিত একটি বাংলা পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

একটি বিচিত্র সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এবং অভিনব পরিব্রাজন ভূমিতে এই কাব্য কাহিনীটির ভূমিকা এক স্বতন্ত্র তাৎপর্য এবং মূল্য বহন করে বলিয়া ইহার

পুনরালোচনা করিলে তথ্যানুসন্ধিৎসু গবেষক এবং সচেতন পাঠকদের কৌতূহল উদ্রিক্ত করিতে পারে। বিশেষতঃ, আলোচ্য পুথিতে কাব্যটির কাল নির্ণয় বিষয়ে এমন কয়েকটি তথ্য রহিয়াছে যে জন্য পুনরালোচনার মাধ্যমে বিষয়টির পূর্ণতর সমীক্ষা গ্রহণ প্রয়োজন।

সাহিত্য গবেষকদের নিকট চট্টগ্রাম অঞ্চলের অষ্টাদশ শতকের কবি নিধিরাম আচার্যের নাম এবং তৎকর্তৃক রচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যটি একেবারে অজ্ঞাত নয়। ডঃ সুকুমার সেন তাঁহার "বাংগালা সাহিত্যের ইতিহাস" গ্রন্থে (পৃঃ ৫১৭, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ৩য় সং) পুথির রচনাকাল এবং সংক্ষিপ্ত কবি পরিচিতি দিয়াছেন। তৎসংগে কাহিনীর চরিত্রগুলি ও স্থানাদির নাম উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু কাব্য পরিচিতি দেন নাই। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে (পৃঃ ১০৪২, ৩য় খণ্ড, ১ম সং) মন্তব্য করিয়াছেন,—"চট্টগ্রামে নিধিরাম আচার্য নামে আর একজন কবির কালিকামংগল (১৬৭৮ শক ১৭৫৬ খ্রীঃ) পাওয়া গিয়াছে। এই দুই কবীন্দ্র কবিচন্দ্র এবং একজোড়া নিধিরাম মিলিয়া কালিকামংগলে পাড়ি জমাইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু ভারতচন্দ্র থাকিতে ইঁহারা সমুদ্রের পার্শ্বে কূপ খননে মাতিয়াছিলেন কেন বুঝা যাইতেছে না।" তিনি কবি পরিচিতি বা কাব্যপরিচিতি দেন নাই তবে উপরের উদ্ধৃতিতে পুথিটির কাব্যমূল্যের নিকৃষ্টতা সম্বন্ধে পরোক্ষ ইংগিত দিয়াছেন। অধ্যাপক শাহেদ আলী প্রণীত চট্টগ্রাম জিলা কাউন্সিল কর্তৃক প্রকাশিত "বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান" পুস্তকে এই পুথিটি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। পুথিটির কাব্যমূল্য সম্বন্ধে আর কোন সময় কাহারও দ্বারা ইহাপেক্ষা বিস্তৃততর আলোচনা হইয়াছে কিনা তাহা আমাদের জানা নাই। অন্যান্য লেখক ও সংকলন কর্তাদের তালিকাতেও বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর একজন কবি হিসাবে নিধিরাম ও তাঁহার কাব্যটির নাম উল্লেখ আছে। পুথিটির প্রসংগ শুরু করার পূর্বে এতদসম্পর্কিত বিষয়ে কিছু বলার প্রয়োজন মনে করি।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমার অন্তর্গত তাহার উপান্তবর্তী জেলা পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় অধিবাসীদের বৃহত্তম অংশ চাকমাদের বাহ্যিক পরিচয় উভয় বাংলার শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অধিকাংশের নিকট জানা থাকিলেও তাহাদের আন্তরিক পরিচয় অনেকের কাছে এখনও অজ্ঞাত। জাতিতাত্ত্বিক বিচারে ইহারা মংগোলীয় মানবশ্রেণীর অন্তর্গত এই বিষয়ে কোন দ্বিমত নাই, কিন্তু ভাষাগত দিক দিয়া ইহারা সন্দেহাতীত ভাবে আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে, জাতিগত বিচারে তাহাদের বাঙালী বলা না গেলেও তাহাদের ভাষা বাংলার সমতুল। কেহ কেহ তাহাদের ভাষাকে বাংলার একটি উপভাষা হিসাবে চিহ্নিত করিতে চাহেন, আবার অন্যেরা আর্য ভাষাগোষ্ঠিরই একটি স্বতন্ত্র ভাষা হিসাবে ইহার মর্যাদা দাবী করেন। এই ভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলীর অধিকাংশই বাংলা তৎসম, তদ্ভব এবং প্রচলিত দেশী শব্দ হইতে, কতকগুলি অবিকৃতভাবে এবং অনেকগুলি ধ্বনি বিকৃত হইয়া এই ভাষার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই ভাবে প্রচুর হিন্দী, আরবী, ফারসী ইত্যাদি বিদেশী শব্দ, সোজাসুজি হউক বা বাংলার মাধ্যমে হউক, ইহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। প্রচুর প্রাকৃত (পালি) এবং বর্তমানে অপ্রচলিত বাংলা শব্দেরও সাক্ষাৎ মিলে, তৎসংগে প্রতিবেশী জনগোষ্ঠীর কিছু কিছু অনার্য ভাষার শব্দও এই ভাষায় অনুপ্রবিষ্ঠ হইয়াছে। কিন্তু কেবল শব্দাবলী (Vocabulary) দ্বারা একটি ভাষার জাতিগত প্রকৃতি নির্ণয় করা যায় না। পদ্ধতিগত গবেষণার মাধ্যমে ইহার রূপতত্ত্ব, ব্যাকরণ, বাকরীতি, ধ্বনি, লিপি

ইত্যাদি ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন দিক বিচার করিয়া সুনির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত এই পর্যায়ে এই সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত অভিমত দেওয়া যায় না। সুতরাং বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এইখানে নাই বিধায় এ বিষয়ে প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ গ্রীয়ারসনের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি—Chakma…is based on South Eastern Bengali but has undergone so much transformation that it is almost worthy of the dignity of being classed as a separate language.

বর্তমানে দেশের একান্তে পর্বতমালা বেষ্টিত দুর্গম অরণ্যাঞ্চলে অবস্থিত হইলেও সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া বাংলার সাংস্কৃতিক আবহমণ্ডলে বাস করা হেতু তাহাদের সংস্কৃতি, বিশেষতঃ ভাষা ও সাহিত্যের উপর পার্শ্ববর্তী বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সমৃদ্ধ ভাষা ও সংস্কৃতি গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তাহাদের কথায়, গানে, বিশ্বাসে, সংস্কারে, সামগ্রিক জীবনবোধে আপাত বৈষম্য সত্ত্বেও একটি অন্তর্নিহিত ঐক্য এই প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করে।

কবে প্রথম একটি মৃদু বায়ুপ্রবাহ পর্বতের পাষাণ প্রাচীর ডিঙাইয়া সমতল বাংলার পেলব মাটির সৌরভ এ অঞ্চলে ছড়াইয়া দিয়া জন চিত্তকে আমোদিত করিয়াছিল ইতিহাস তাহা জানিবার মত কোন সূত্র রাখিয়া যায় নাই। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের কমনীয় রূপটির সংগে উপজাতীয় জনগণের প্রথম পরিচয়ের ক্ষণটিও জানিবার উপায় নাই,—যে পরিচয়টি ক্রমে গাঢ় হইয়া শিলাময়, রুক্ষ প্রকৃতির কোলে লালিত উপজাতীয় সন্তানদের রুক্ষতর প্রকৃতিকেও অভাবনীয় কোমল রসে সিক্ত করিয়াছিল। জাতীয় জীবনে নানা বিপর্যয়, নানা ঘাত প্রতিঘাত, নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়া দেশ হইতে দেশান্তরে, স্থান হইতে স্থানান্তরে চলিতে চলিতে তাহার যাযাবরী জীবনে বৃহত্তর বাংলার গণমানসের সংগে তাহার পরিচয় ক্ষণে ক্ষণে ছিন্ন হইয়াছিল সন্দেহ নাই—কিন্তু আবার কখন যে কিভাবে অলক্ষ্যে এই ছিন্ন সূত্র জোড়া লাগিয়া দুই ভিন্ন জীবনাচারী মানুষের হৃদয়কে একসূত্রে গাঁথিয়া দিয়াছিল ইতিহাস তাহারও কোন সূত্র রাখিয়া যায় নাই।

যাইহোক, নিজস্ব ভাষায়, নিজস্ব বর্ণমালায় সাহিত্যচর্চার ইতিহাস এবং ঐতিহ্য তাহাদের বহুদিনের। বাংলা পুঁথিসাহিত্যের ঢঙে প্রাচীন চাকমা কবিগণের রচিত নানা বিষয়ের উপর পালাগান, বারমাসি, চৌতিশা বীরত্বগাথা, প্রেমগীতি প্রভৃতি পল্লী অঞ্চলে এখনও বেশ জনপ্রিয়। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট এগুলি আগের ন্যায় আর সমাদর পাইতেছে না। তথাপি বংশ পরম্পরায় শ্রুত হইয়া নামিয়া আসিতে আসিতে এগুলি এখনও প্রাকৃতজনের মুখে মুখে গীত হইতে শোনা যায়।

সেই আমলে এই অঞ্চলে কোন টোল, পাঠশালা ছিল না। মামুলি শিক্ষায় শিক্ষালাভের কোন সুযোগও তাহাদের ছিল না। কিছু কিছু জ্ঞানান্বেষী ব্যক্তি কঠোর জীবন সংগ্রামের মধ্যেও তাহাদের খণ্ড অবসরে বাড়ী বসিয়া নিজের চেষ্টায় স্বল্প বাংলা শিখিয়া পুঁথি পড়ার মত বিদ্যা আয়ত্ত করিত এবং রামায়ণ, মহাভারত, বিবিধ পুরাণ কথা সহ সহজলভ্য পুঁথিগুলি সংগ্রহ করিয়া নিজেদের জ্ঞানের ও রসের পিপাসা মিটাইত। সংস্কৃত জ্ঞানও তাহাদের ছিল না। উন্নততর ধ্রুপদী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় কিংবা তাহার গভীরতায় অবগাহন করিবার যোগ্যতা অর্জনের সুযোগও তাহাদের ছিল না। যেই সব সরল এবং সহজলভ্য পুঁথিগুলি, কাহিনীর মনোহারিত্বে বা ইহাদের কাব্যোৎকর্ষে তাহাদের আকৃষ্ট

করিত সেইগুলি বার বার পড়িয়া তাহারা মুখস্থ করিত, অন্যদের পড়িয়া শুনাইত। শ্রোতাদের মধ্যে কেহ কেহ শুনিয়া শুনিয়া মনে রাখিত অথবা নিজস্ব লিপিতে লিখিয়া রাখিত। বানান শুদ্ধ করিয়া লিখিবার তাহাদের তেমন বালাই ছিল না, কারণ ভুল ধরিবারও এমন কেউ ছিল না। পুথির সব কিছু বুঝিয়া উঠাও তাহাদের পক্ষে সাধ্য ছিল না, বিশেষতঃ চাকমা ভাষায় অপ্রচলিত কঠিনতর বাংলা শব্দগুলির অর্থবোধ করার ক্ষমতা সকলের ছিল না। কিন্তু অর্থ বোঝা না গেলেও কাব্যের ধ্বনি ঝঙ্কারটিও কম মূল্যবান নয়। আমরাই কি গান শোনার সময় গানের সবকথাগুলির অর্থ বুঝিয়া লইতে পারি বা বুঝিবার চেষ্টা করি? সুরের ঝঙ্কারটিই উপভোগ করি মাত্র। সুতরাং অর্থ বুঝিতে না পারিলেও আবৃত্তিকালে ধ্বনিটি শুনিয়াই তাহারা একটি অর্থহীন আনুমানিক শব্দ শিখিয়া রাখিত বা লিখিয়া রাখিত। পরিণামে এই সব পুথির অনেক পদেরই অর্থবোধ্যতা নষ্ট হইয়া বর্তমানে পাঠকদের নিকট দুর্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ করিয়া, একের পর এক অনুলিখিত হইতে হইতে দারুণভাবে বিকৃত হইয়া অনেক পদের মধ্যেই বস্তু বলিতে আর কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবে বিচক্ষণ পাঠক কর্তৃক চেষ্টা করিলে এগুলির অর্থোদ্ধার করা দুরূহ হইলেও অসম্ভব নয়। যাই হোক, এইভাবেই তাহাদের মধ্যে কিছু পুথি বাঁচিয়া রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে আলোচ্য পুথিটি সহ মুগলুব্ধ, গোরক্ষবিজয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আবার এই সব পুথির অনুকরণে বাংলায় বা নিজেদের ভাষায় কাব্যসৃষ্টির প্রয়াসও চলিত। তালপাতায়, তুলট কাগজে বা হরিতালী কাগজে লিখিত এই সব ২/১টি পুথির এখনও সন্ধান মিলে। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি হইতে আরম্ভ করিয়া এখানে এই ধারা বিংশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এমন কি এই শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত ইহার রেশ পুরা থামে নাই। অথচ অন্যত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক হইতে পুথি সাহিত্যের ধারা স্তিমিত হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ শতাব্দীর মাঝামাঝি আসিয়া তাহার দম প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছিল। সেই সময় হইতে ঈশ্বরগুপ্ত, রংগলাল, পরে মধুসূদন প্রমুখ শক্তিশালী কবিগণের হাতে বাংলা কবিতার নূতন রীতি প্রবর্তিত হইয়া যখন পয়ার ত্রিপদী ছন্দের পুরাতন কাব্যরীতির মৃত্যু ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছিল তখনও এখানে কেহ কেহ পয়ার ছন্দে কবিতা রচনায় হাতে খড়ি দিতেছিল। ইহারও পরে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র বিহারীলালের কাল পার হইয়া বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলার কাব্যভুবন যখন প্রখর রবিজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল তখনই সেই তীব্র আলোক ছটা এই অঞ্চলের গহন অরণ্যজাল ভেদ করিতে পারে নাই এবং অনেকে পুরাতন রীতির কাব্যচর্চা ছাড়ে নাই। পরিবেশের পশ্চাদ্‌পদতার কারণে সমাজের উর্ধ্বস্তরের কিছু লোক ছাড়া, কেবল কাব্য নহে, যাবতীয় জাগতিক ব্যাপারেই বাহিরের দুনিয়ায় কি ঘটিতেছে তাহার খোঁজ রাখার সুযোগ তাহাদের ছিল না।

এই সব পুথিপত্র এখন দুষ্প্রাপ্য। যুগবিবর্তনের সাথে সাথে রুচিরও যেমন পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, প্রয়োজনের তাগিদে রীতি এবং পদ্ধতিরও পরিবর্তন হইয়াছে। দুঃখজনক হইলেও নিজস্ব লিপিচর্চা এখন প্রায় সকলে ছাড়িয়া দিয়াছে। বাংলা তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রাচীন লিপিতে লিখিত এই সব পুথিরও আর সেজন্য কদর নাই। তথাপি পূর্বপুরুষগণের সহিত প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ অনেকে এইগুলিকে কুলুংগিতে, ভাঙা টিনের বাক্সে বা মাচার এক কোণায় অনাদরে হইলেও সঞ্চয় করিয়া রাখিত। কিন্তু একটি

অভাবিতপূর্ব বিপর্যয় ইহাদিগকে তাহাদের শেষ আশ্রয়স্থল হইতেও রক্ষা করিতে পারিল না।

এই শতাব্দীর ষাটের দশকের গোড়ার দিকে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার সংগে সংগে কৃত্রিম হ্রদের ফুঁসিয়া উঠা কালো জল যখন তাহাদের সর্বস্ব গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল তখন এই অঞ্চলের সব চাইতে প্রাচীন জনবসতি এলাকার, সব চাইতে অগ্রসর, সব চাইতে সংস্কৃতিচেতন কিঞ্চিনূন এক লক্ষ চাকমা অধিবাসী প্রাণের মায়ায়, ত্বরিতে যাহা কিছু কুড়াইয়া লইতে পারা যায় তাহা লইয়াই পূর্বপুরুষের দীর্ঘ স্মৃতি বিজড়িত বাস্তুভিটা ছাড়িয়া অন্যত্র সরিয়া পড়িতে বাধ্য হয়। অচিরাৎ অন্যান্য সব কিছুর সাথে পূর্বপুরুষগণের সযত্ন লালিত এই সব অমূল্য অশুর সম্পদ কাপ্তাই হ্রদের অতল গভীরে চিরদিনের মত তলাইয়া যায়। সর্বস্ব হারানোর বেদনায় মুহ্যমান, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় শঙ্কাকুল, পলায়নপর, ভীত ত্রস্ত মানুষের কাছে এই সব কালবিবর্ণ, কীটদষ্ট, ছিন্ন পুথির মূল্য কোথায়? স্মরণ করিয়া কান্না পাইলেও এগুলি উদ্ধারের আর কোন সম্ভাবনা নাই।

যাইহোক, এইবার মূল আলোচনায় ফিরিয়া আসি। রোদে শুকান (untanned) হরিণের চামড়ায় বেশ শক্ত করিয়া বাঁধান পুথিটি ফুলস্কেপ সাইজের কাগজকে অর্ধেক আকারে ভাজ করিয়া ইহার ১০১ পৃষ্ঠায় চাকমা বর্ণে লিখিত। দক্ষিণ পার্শ্বটি পোকায় কাটিয়া নষ্ট করায় লেখারও কিছু কিছু অংশ নষ্ট হইয়াছে তথাপি পুথিটি প্রায় সম্পূর্ণ। শেষ পৃষ্ঠায় লিপিকরের পিতৃ পরিচয় সহ নাম, ঠিকানা ও লিপিকাল দেওয়া আছে। লিপিকাল মোটেই প্রাচীন নয়, মাত্র ১৩৫৩ সাল। এই বিচারে গবেষকদের পক্ষে ইহা মূল্যহীন। কিন্তু মনে হয় আদিতে ইহা প্রাচীন কোন পুথি হইতে নকল করা হইয়াছিল এবং পরবর্তীকালে আবৃত্তি শুনিয়া অন্যান্য লিপিকর কর্তৃক অনুলিখিত হইয়াছে। মূল পাণ্ডুলিপিটি প্রাপ্ত অন্যান্য পুথি অপেক্ষাও প্রাচীনতর হইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস। স্থানে স্থানে পুথির রচনাকাল দেওয়া আছে, যথাস্থানে তাহা আলোচিত হইবে।

পুথির রচয়িতা যে নিধিরাম আচার্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহার সর্বাংগে বিক্ষিপ্ত নিধিরামের বা শুধু কবিরত্ন, লক্ষ্মীর তনয় ইত্যাদি ভণিতায় বিশটিরও বেশী পদ পাওয়া যায়। যথা—

"বিবিধ বিধানে পূজে কালিকার পায়
দুর্লভ আচার্য শিশু নিধিরামে গায়।"
"গুরু রামচন্দ্র পদ বন্দিয়া মাথায়
লক্ষ্মীর নন্দন কবি নিধিরামে গায়।"
"সরস্বতী পাদপদ্মে করিয়া প্রণাম
বিরচিত শ্রীকবিরত্নে কয়ে কবি নিধিরাম।"
"বন্দিয়া সে পদাম্বুজ গংগারাম সুতাসুত
জ্যোতির্বিদ কুলেতে উৎপত্তি
রইয়া সুরের গ্রাম গায়ে কবি নিধিরাম
গুরুপদ করিয়া ভকতি" ইত্যাদি

এই সব ভণিতা হইতে তাঁহার যে কুলপরিচয় পাওয়া যায় তাহা ডঃ সুকুমার সেন প্রমুখ অন্যান্য লেখকগণ প্রদত্ত কুল পরিচয়ের সংগে এক। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ, পিতা দুর্লভ আচার্য, মাতা লক্ষ্মী, গুরু রামচন্দ্র, মাতামহ গংগারাম। কিন্তু পিতৃপ্রধান সমাজে পিতামহের না হইয়া মাতামহের পরিচয় কেন? ডঃ সুকুমার সেনের উদ্ধৃত ভণিতায় দেখিতে পাই "গংগারাম সুতসুতাসুত"। ইহাতে দৌহিত্র না বুঝাইয়া পৌত্রীর পুত্র বুঝায়। এই পুথিতে আছে "গংগারাম স্বতাস্বত"। আগেরটির ন্যায় ইহাও কি লিপিকারের ভুল? চাকমা বর্ণমালার একটি বৈশিষ্ট্য এই ঃ—বাংলার ন্যায় ব্যঞ্জনবর্ণের সংগে "অ" স্বর নয় "আ" স্বরই যুক্ত। স্বরটিকে অকারান্ত করিতে হইলে ইহার উপর রেফাকৃতির একটি চিহ্ন বসাইতে হয়। লিপিকরের অসাবধানতাবশতঃ প্রথমত এর মাথায় ঐ চিহ্নটি না পড়ায় "সুতসুত" না হইয়া "স্বতাসুত" হওয়া বিচিত্র নয়।

যাবতীয় পুস্তকেই পুথির রচনাকাল ধরা হইয়াছে ১৬৭৮ শকাব্দ বা ১৭৫৬ ইং—ভারতচন্দ্রের "অন্নদামংগল" রচনার ৪ বৎসর পরে। নীচের ভণিতা হইতে লেখকগণ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

"শকাব্দ ষোড়শ শত জলনিধি বসু
দেবীবৎ বিরচিল নিধিরাম শিশু।"

আলোচ্য পুথিতে অবিকল এই পদটি নাই, তবে ইহার অনুরূপ একটি—এবং একটি মাত্রই অত্যন্ত বিকৃত পদ পাওয়া যায়—

"সুকন্দ সুরজ জল দিব ভসু
বিরচিত বই দেবি নিধিরাম সিসু।"

যাহারা পাণ্ডুলিপি লইয়া ঘাটাঘাটি করেন তাঁহাদের কাছে এই পাঠবিকৃতির সম্ভাব্য কারণগুলি ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। তদুপরি চাকমা লিপিকরের বেলায় আরও কতকগুলি কারণের কথা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। উদ্ধৃতিতে শব্দগুলির মধ্যে যে ভাবে ফাঁক রাখা হইয়াছে পুথিতে সেরূপ নাই। বাংলা প্রাচীন পুথির ন্যায় অক্ষরগুলি একটানা ভাবে লেখা হইয়াছে, কেবল প্রতি চরণের শেষে দাঁড়ি বসান হইয়াছে। তাহা ছাড়া আগাগোড়া 'স' দিয়া লেখা। ইহার কারণ এই যে—শ, ষ, স এই শ্বস ধ্বনিগুলির জন্য চাকমা বর্ণমালায় একটি মাত্র বর্ণই আছে 'স'। এমন কি মাঝে মাঝে 'চ' এবং 'ছ' কেও 'স' লেখা হয়। সুকন্দকে শকাব্দ, সুরজকে ষোড়শ, ভসুকে বসু ধরা যাইতে পারে। জল দিব কথাটিকে জল নিধির স্থলে জলদেব বা জলাধিপ অর্থাৎ বরুণ বা সমুদ্র ধরা যাইতে পারে। বইদেবি কথাটি অনুলিপি প্রস্তুতকালে বর্ণ বিপর্যয়ের ফলে সৃষ্ট—ইহা সহজবোধ্য। "কবি শশাঙ্ক" গণনা পদ্ধতি অনুসারে দক্ষিণাগতিতে সংখ্যাবাচক শব্দগুলির অর্থ দাঁড়ায় ১৬৭৮ শক। এই হিসাবে পূর্বোক্ত গণনা ঠিক।

কিন্তু আলোচ্য পুথিটিতে নিম্নোদ্ধৃত পদটি সহ আরও কতিপয় পদ পুথিটির রচনাকাল নির্ণয়ের ব্যাপারে গুরুতর সংশয় সৃষ্টি করিয়াছে।—

"গজ বেদ কাল চন্দ্র স্বকের সময়
শ্রী কবিরত্নে কয়ে লকথীর তনয়।"

শব্দগুলির সংখ্যামান ধরিয়া "অঙ্কস্য বামাগতি"র হিসাবে সংখ্যাটি দাঁড়ায় নিম্নরূপ ঃ—চন্দ্র—১। কাল—৩। বেদ—৪। গজ—৮। = ১৩৪৮ শক বা ১৪২৬ খ্রীস্টাব্দ (স্বক কথাটি

নিশ্চয়ই সক বা শক শব্দের ভুল বানান)। তাহাই যদি হয় তবে ইহা কাল কৌলীন্যে অধিকাংশ প্রাচীন পুথিকেই হারাইয়া দিবে। তবে ভাষা দেখিয়া ইহা তত প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। গজ, বেদ ও চন্দ্র শব্দের অন্য কোন সংখ্যামান আছে বলিয়া আমার জানা নাই। 'কাল'শব্দটির ব্যবহারও অন্য কোন সংখ্যার জন্য ছিল কিনা তাও জানা নাই। আমার যতদূর অনুমান হয় কবি এখানে কাল কথাটিকে ঋতু অর্থে (গ্রীষ্মকাল বর্ষাকাল ইত্যাদি) ব্যবহার করিয়া ইহার সংখ্যামান ধরিয়াছেন—৬। এই হিসাবে পুথির রচনাকাল দাঁড়ায় ১৬৪৮ শক বা ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দ—তাহা হইলেও ইহা ভারতচন্দ্রের অন্নদামংগল রচনার ৪ বৎসর পরে নয় বরং ২৬ বৎসর পূর্বে। পুথিটিতে অনুরূপ আরও দুইটি ভণিতা আছে। যথা :—

২১ পৃষ্ঠায়—"গজ বেদ কাল চন্দ্র সক লিয়ুজিত
দৈববিতু নিদিরাম সিসু বিরচিত।"
৫২ পৃষ্ঠায়—"গজ বেদ কাল চন্দ্র সক লিয়ুরত
কবিরত্নে গায়ে শ্বেন জাদির বিদনোত।"

প্রথমোক্ত পদে লিপিকর প্রমাদের ফলে নিযুক্তিত বা নিয়োজিত শব্দটি লিয়ুজিত বলিয়া ধরিয়া নেওয়া কষ্টকর নয়। প্রাচীন বাংলা লিপির সংগে যাহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন যে ন ও ল এর আকারে বিশেষ তফাৎ ছিল না। সতর্কতা অবলম্বন না করিলে ন কে ল এবং ল কে ন পাঠ আশ্চর্য নয়। আবার স ও য এর আকারেও প্রভেদ গুরুতর নয়। পদে অন্যান্য শব্দের বানান বিকৃতি ধর্তব্য নয়। পরের পদটিও একই প্রকারে লিপিকর প্রমাদের ফল বলিয়া বিশ্বাস। সম্ভবতঃ কোন চাকমা লিপিকর কর্তৃক প্রাচীন লিপিতে লিখিত কোন বাংলা পুথি হইতে চাকমা লিপিতে বর্ণান্তর করিবার কালে এই লিপিপ্রমাদ ঘটিয়াছে। লিপিকর পরম্পরায় বিকৃতি ক্রমশঃ ইহাপেক্ষা গুরুতর আকারে পরিণত হইলেও আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছুই ছিল না।

একই রচয়িতা কর্তৃক একই পুথিতে দুই প্রকার কাল জ্ঞাপক ভণিতা বিস্ময়কর। অতএব সন্দেহ করা যাইতে পারে যে দুইটির মধ্যে একটি কৃত্রিম বা প্রক্ষিপ্ত। কোন লিপিকর কর্তৃক বিকৃত পাঠ শুদ্ধ করিতে যাইয়াও এইরূপ ঘটিতে পারে। এখন কোনটিকে প্রক্ষিপ্ত বলিব? যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে অংকের দক্ষিণাগতি প্রাচীনত্বের বিরোধী। এই বিচারে প্রথমটিকেই অর্বাচীন, অতএব প্রক্ষিপ্ত ধরিতে হয়। অধিকন্তু, পুথিটিতে এই পদ আছে মাত্র একটি। তাহারও মূল পাঠ যে ইহাই ছিল তেমন কোন গ্যারাণ্টি নাই। পক্ষান্তরে "গজ বেদ কাল চন্দ্র" কথাগুলি স্পষ্ট ভাবে বারবার তিনবার পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। চাকমা লিপিকর কর্তৃক স্বরচিত পদের প্রক্ষেপ অবিশ্বাস্য—প্রয়োজনই বা কি?

'শকাব্দ ষোড়শ শত জলনিধি বসু"—এই পদটিকে কেমন যেন খাপছাড়া বলিয়া মনে হয়। একই পদে শুদ্ধসংখ্যা ও শব্দসংখ্যার ব্যবহার অস্বাভাবিক। ষোড়শ সংখ্যা বুঝাইবার জন্য কি নিধিরামের সংখ্যাবাচক শব্দের এতই অভাব পড়িয়াছিল যে "জলনিধি বসুর" সংগে তিনি ইহাকে জুড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন? এমনও কি হইতে পারে না যে, নিধিরাম আসলে শকে ইন্দু বা শকে বিধু দিয়াই পদটি আরম্ভ করিয়াছিলেন যাহা পরে লিপিকর প্রমাদের ফলে বিকৃত হইয়া যথাক্রমে 'সুকন্দ' বা 'শকাব্দে' পরিণত হইয়াছে? প্রয়োজনীয় সংখ্যা পাওয়ার জন্য তো মূলে ইহার সহিত সংখ্যাবাচক 'রস' শব্দটিও ব্যবহৃত হইয়া থাকিতে পারে

যাহা পরে লিপিকর বা সংস্কারকদের হাতে পড়িয়া বা অন্য যে ভাবেই হউক 'সুরজ' বা ষোড়শে পরিণত হইয়াছে। যাহা হউক, এইগুলি নেহাৎ কল্পনা মাত্র—কষ্ট কল্পনাও বলা যাইতে পারে। তবে যুক্তির খাতিরে কথাটি উত্থাপন করা অন্যায় নহে। কেন না প্রশ্ন উঠিয়াছে দুই প্রকার কালবাচক ভণিতা হইতে কোনটিকে আমরা মৌলিক বলিয়া গ্রহণ করিব। যেইটিকেই গ্রহণ করি না কেন কালের ব্যবধান মাত্র ৩০ বৎসরের। তথাপি ইতিবৃত্তকারগণের পক্ষে এই তিরিশটি বৎসরের ব্যবধানও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

আলোচ্য পুথিটি ব্যতীত অন্যের দ্বারা সংগৃহীত পুথিগুলি দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই। ঐ সমস্ত পুথিতে যদি অত্র পুথির কালবাচক ভণিতাগুলি থাকিত তবে সেইগুলি সাহিত্য সমালোচকদের চোখে পড়িল না কেন? অতএব অনুমান করিতে দ্বিধা নাই যে পুথিগুলির মধ্যে যথেষ্ট পাঠ বৈষম্য রহিয়াছে। একই পুথির বিভিন্ন অনুলিপিতে নানাকারণে সামান্য পাঠ বৈষম্য থাকিতে পারে। কিন্তু এই মূল্যবান ভণিতাগুলি বাদ পড়ার হেতু কি? এই প্রশ্নের অনেকগুলি সম্ভাব্য উত্তরের মধ্যে দুইটি হইল—(১) লিপিকর বর্তৃক পুথি সংক্ষেপ করিতে যাইয়া অনেক পদের সহিত এই গুরুত্বপূর্ণ ভণিতাগুলি বাদ পড়িয়াছে। (২) লিপিকরের স্বরচিত পদের সহিত পুথিতে এই ভণিতাগুলি যুক্ত হইয়াছে। নানা যুক্তিতে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিকে অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়। এই কারণে লিপিকাল অর্বাচীন হইলেও আলোচ্য পুথির মূল পাণ্ডুলিপিটি সংগৃহীত অন্যান্য পাণ্ডুলিপি অপেক্ষা প্রাচীনতর এবং রচনাকালের ব্যাপারে অধিকতর প্রামাণ্য বলিয়া ধারণা করা অযৌক্তিক নয়। উভয় প্রকার পুথির পাঠ মিলাইয়া দেখা হইলে এই রহস্য উদঘাটিত হইতে পারে। এখানে আরও কয়েকটি প্রশ্ন—"নিধিরাম শিশু" কথাটির প্রকৃত অর্থ কি? শিশু শব্দটি কি কেবল বিনয় বাচক বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে? "দুলর্ভ আচার্য শিশু নিধিরামে গায়" পদটিতে শিশু অর্থে পুত্র বুঝান হইয়াছে। সুতরাং নিধিরাম শিশু বলিতে কি নিধিরাম পুত্রকে বুঝান যায় না? নিধিরাম পুত্র কি পরবর্তীকালে তাঁহার পিতৃরচিত কাব্য সংস্কারে হাত দিয়াছিলেন?—যে কারণে দুই রকম কালজ্ঞাপক ভণিতার মাধ্যমে কাব্যে তাঁহার প্রচ্ছন্ন স্বাক্ষর রহিয়াছে? এই পর্যায়ে এই সব প্রশ্নের মীমাংসা হইবার নয়।

বিষয়টিকে কিন্তু আরও একটি দিক হইতে বিচার করা যাইতে পারে। প্রথমোক্ত "শকাব্দ ষোড়শ—"অথবা এই পুথির অতিমাত্রায় বিকৃত "সুকন্দ সুরজ—"পদ দুইটির জলনিধি বা জলাধিপ শব্দগুলির সংখ্যামান ৭ না ধরিয়া ৪ ধরিয়াও হিসাব করা যায়। জলনিধির অর্থ সমুদ্র বা সিন্ধু। ডঃ ওয়াকিল আহমদ তাঁহার "বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত" গ্রন্থে (পৃঃ ২১২) উল্লেখ করিয়াছেন যে—"জ্যোতিষে চার সংখ্যা বুঝাতে সিন্ধুর ব্যবহার আছে"। জাহাংগীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুল কাইয়ুম তাঁহার "পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা" পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন যে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় "অনল রন্ধকর লকণ পরিব'ই/সক সমুদ্দকর অগিনি সসী"—অবহট্ট ভাষায় রচিত বিদ্যাপতির এই পদটির দ্বিতীয় পংক্তির 'সমুদ্র' কথাটির সংখ্যামান ৪ ধরিয়াই শকাব্দ নির্ণয় করিয়াছেন—১৩২৪। মনে রাখা দরকার, নিধিরাম ছিলেন—"দৈববিৎ", "জ্যাদির বিদুনাত" অর্থাৎ জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ। এইবিচারে পদটি অকৃত্রিম অবস্থায় যাহাই থাকুক না কেন", "শকাব্দ ষোড়শ শত জলনিধিবস্থ" কথাগুলির সংখ্যামান দাঁড়ায় ১৬৪৮ অর্থাৎ "গজ বেদ কাল চন্দ্র" কথাগুলির সংখ্যামানের সংগে হুবহু এক।

তাহাই যদি সত্য বলিয়া গৃহীত হয় তবে প্রবন্ধের প্রথমদিকে উদ্ধৃত ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ভারতচন্দ্র থাকিতে ইঁহারা সমুদ্রের পার্শ্বে কূপ খননে মাতিয়াছিলেন কেন বুঝা যাইতেছে না"—এই বাক্যস্থিত প্রচ্ছন্ন অপবাদের বোঝা হইতে অন্ততঃ এই নিধিরামকে মুক্তি দিতে হইবে। কারণ কাব্য প্রতিভার বিচারে নিকৃষ্ট হইলেও কাব্যকালের বিচারে নিধিরাম ভারতচন্দ্রের অগ্রজ।

যাইহোক, সুনিশ্চিত ভাবে এই মীমাংসা গ্রহণ করিবার পূর্বে বিভিন্ন পুঁথির পাঠান্তর নির্ণয় করিয়া পদ্ধতিগতভাবে তুলনামূলক পাঠ সমালোচনার প্রয়োজন। ইহা বিশেষজ্ঞগণের কাজ, আমাদের ন্যায় সাধারণ পাঠকদের নয়। আলোচ্য পুঁথিটির সংক্ষিপ্ত একটি কাব্য-পরিচিতি দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য—ইহার পাঠ সমালোচনা বা কাব্যমূল্যবিচার করিবারও কোন উদ্দেশ্য নাই। যোগ্যতর ব্যক্তিগণের হাতেই এই ভার সমর্পিত থাকিবে।

এইবার পুঁথিবিধৃত কাহিনীর পরিচয় দিতে চেষ্টা করিতেছি—যতদূর সম্ভব কবির নিজস্ব রচনায় যাহাতে প্রয়োজন বোধ করিলে অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ অন্যান্য পুঁথির সংগে পাঠ মিলাইয়া ইহার প্রকৃতি নিরূপণ করিতে পারেন। তৎপূর্বে আরও দুই একটি কথা বলিয়া রাখা দরকার। পুঁথির স্থানে স্থানে প্রচুর পাঠবিকৃতি ঘটিয়াছে। ফলে ইহার অনেক কিছুই আমার পক্ষেও বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় নাই। এক লিপি হইতে অন্য লিপিতে বর্ণান্তর করার সমস্যা তো আছেই, তদুপরি বাংলা বর্ণ ও ভাষায় অনভিজ্ঞ পরবর্তী লিপিকরগণের নিকট হইতে বিশুদ্ধ বানান আশা করা যায় না। এইজন্য উৎকট এবং অজস্র বানান বিকৃতিতে পুঁথি কন্টকিত। নিজেদের উচ্চারণরীতি অনুসারে শব্দের বানান করিতে গিয়াও অনেক বাংলা শব্দকে "চাকমা বাংলায়" পরিণত করা হইয়াছে। পুঁথিতে যে ভাবে আছে সেভাবে লিখিতে গেলে অর্ধেক শব্দই পাঠকদের নিকট দুর্বোধ্য হইয়া উঠিবে। সুতরাং অর্থ-বোধ্যতার প্রয়োজনে বিকৃত বানানগুলিকে শুদ্ধ করিয়া এখানে উপস্থিত করা হইয়াছে। ইহাতে মূল বাংলা পুঁথির সংগে ইহার পাঠ হয়ত মিলিবে না। অবিকৃত পাঠ পুঁথির কাল নির্ণয় ইত্যাদির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় হইলেও বর্তমান নিবন্ধে এই রীতি অনুসৃত হইতে পারে নাই। বানান শুদ্ধ করা ছাড়া অন্য কোন ভাবেই পাঠ পরিবর্তনের অপচেষ্টা করা হয় নাই। লিপিকর প্রমাদের ফলে যেখানে ছন্দের মাত্রা এবং যতি ভংগ হইয়াছে সেই সকল সহজে সংশোধনযোগ্য পদগুলিও অবিকৃত রাখা হইয়াছে। সেই সমস্ত শব্দের আনুমানিক পাঠ গ্রহণ করা হইয়াছে সেগুলিকে ( ) চিহ্নের মধ্যে স্থাপন করা হইয়াছে। যেগুলির নিজের কাছে অর্থবোধ্য হয় নাই সেগুলির পার্শ্বে (?) চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম পৃষ্ঠার শিরোভাগে আছে 'ইতি স্রি বিত্যা সুন্দর'। "তারপরই "বিসমিল্লায় গলদ" লইয়া পুঁথি আরম্ভ হইয়াছে।

'গজকন্ন সুদান্ন কনত মুসিক্ক বা (হন)
কার্তিক সহিত বন্দম তাহার চরণ।

প্রথম চরণের শুদ্ধপাঠ কি ছিল তাহা জানা না গেলেও বুঝিতে অসুবিধা হয় না যে গজমুণ্ডধারী, মুসিক বাহন, সিদ্ধিদাতা গণেশকে লক্ষ্য করিয়াই বন্দনা শুরু হয়ইয়াছে। ইহার পর 'প্রণমহু সুর্বেশ্ব জগত ঈশ্বর' হইতে শুরু করিয়া মোট ৩৪টি চরণে বিভিন্ন দেবদেবী, মাতাপিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, লোকপাল, দ্বিজগণ, তীর্থস্থান, ব্যাসদেব, কবিগণ প্রভৃতির বন্দনা। দীর্ঘ বন্দনাভাগ শেষ হইবার পর কাহিনী শুরু হইয়াছে।

করিবারে পদাবলী মনে হইসে রংগ
এবে কিছু কই শুন পুরাণ প্রসংগ।
কালিকা পুরাণ ভাষায় শুন সাবহিতে
শুনিলে আপদ তরে না পারে লংঘিতে।
শ্রীবিদ্যা সুন্দর দুই কাব্য মনোহর
তাহার প্রসাদ কিছু শুনিবা উত্তর॥
রত্নাব (তী) নামে দেশ নানান রত্নময়
গুনাধার নামে রাজা তথা নিবসয়॥
স্বর্ণময় লঙ্কা জিনি রত্নাবতী নাম
সংসারেতে দিতে নারে তাহার উপ্লাম॥

অন্যান্য পুথিতে রাজার নাম দেখা যায় গুণ সাগর, গুনসার ইত্যাদি, কিন্তু এই পুথিতে আগাগোড়াই নাম পাই গুণাধার। ইহার পরে গুণাধারের গুণগান। নির্মলকীর্তি, সিংহবিক্রম রাজা, সেবকের ন্যায়, নীতি ধর্ম সহকারে, অতি সমাদরে প্রজা পালন করেন।

শত্রু সম দুষ্ট জনে করে সংহার (ণ)
শিষ্ট জন পুত্র তুল্য করয়ে পালন॥
রোগ শোক নাই তথা কালেতে মরণ
সর্বদায়ে উমা (?) হরি সংকীর্তন॥…
কলাবতী নামে কন্যা তাহার রমণী
ধর্মশীলা গুণবতী রূপে রম্ভা জিনি॥…
কর্মদোষে চিরকাল না হয় সন্ততি
পুত্রের লাগিয়া রাজা মনে হয় (তুতি)॥
লোক মুখে শুনিলেক কালিকা প্রশংসা
কালিকা সাধনা করে মনে করি আশা
মহাযজ্ঞ আরম্ভিল করি কুতুহল
রাশি রাশি কাষ্ঠ আনি জ্বালিল অনল॥
ঘৃত মধু হোমে (?) যত সংখ্যা নাই আর
পুঞ্জে পুঞ্জে মণিমুক্তা ঢালে ভারে ভার॥

এই ভাবে কঠিন কালিকা সাধনা চলিতে লাগিল।

এই মতে হল্য যদি দ্বাদশ বৎসর
সন্তুষ্ট হইল মাতা দিল দরশন॥…
লম্বিত যুগল জটা বড় চিকন কালা
লোল জিহ্বা চতুর্ভুজ গলে হাড়মালা॥
এক হস্তে (খর্পর) আর হস্তে কারা
আর হস্তে দৈত্যমুণ্ড বাজায়ে মন্দিরা॥

রাজা আনন্দজলে ভাসিয়া দেবীর পাদপদ্মে 'বিবিধ বিধানে' পূজা করিয়া পুত্র বর চাহিলেন—

তুষ্ট হয়্যা মহাকালী পুত্রবর দিল

বর দিয়া মহাকালী অন্তর্ধান হইল।

যথাসময়ে রাণী পুত্র প্রসব করিলেন—

পুত্র মুখ দেখি রাজা আনন্দ অপার
আপনারে ধন্য মানে রাজা গুনাখার।

জ্যোতিষী ডাকিয়া আনা হইল, "মন দিয়া শুন কহি সে সব বাখান' বলিয়া দৈবজ্ঞ শিশুর বুদ্ধি, বিদ্যা, বল, বিক্রম ইত্যাদির ব্যাখ্যা করিলেন।

এত শুনি মহাসপ্ত (?) করিল রাজায়
বহুধন দিয়া কল্ল্য দৈবজ্ঞ বিদায়।
শুভদিনে স্থাপিত পূজা কল্ল্য গুনাখার
বাছিয়া (?) সুন্দর নাম রাখিল তাহার।
দিনে দিনে বাড়ে কুমার কালিকার বরে
পরীক্ষা (?) জে দিতে বলে পঞ্চম বৎসরে।

পঞ্চম বৎসরে হঠাৎ কিসের পরীক্ষা বুঝা গেল না। মনে হয় পরীক্ষা নয়—বিদ্যাশিক্ষা। সুন্দরের মংগল চিন্তায় দেবী নিজেও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। শেষে একশত দাসী লইয়া নিজে বাগদেবীর নিকট চলিলেন। সরস্বতী তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে দেবী বলিলেন,—তুমি আমার কথা রাখিলে বলিতে পারি। সরস্বতী যখন বলিলেন, "তোমার বাক্য না রাখিবে কাহার শক্তি ?" তখন দেবী বলিয়া ফেলিলেন, "দয়া করি তার কণ্ঠে করহ বসতি"। ইহার পর গুরুগৃহে দ্বাদশ (?) বৎসর বিদ্যাশিক্ষার পর নানান শাস্ত্র পাঠ করিয়া পরম পণ্ডিত হইয়া সুন্দর গৃহে ফিরিল। পাত্র মিত্র প্রজাগণের অনুরোধে গুনাখার "শুভদিনে যুবরাজ করিল সুন্দরে।"

এইবার—

এইখানে এই কথা হউক অবসান
বিদ্যার প্রসং (গ) কিছু কর অবধান।

উজানী নগরের রাজা বীরসিংহ, যিনি—

প্রচণ্ড প্রতাপ রাজা বুদ্ধি বিচক্ষণ
দানে পূর্ণ (?) কল্পতরু ধর্ম পরায়ণ।
প্রভাতের সূর্য সম বুদ্ধি সুনির্মল—ইত্যাদি।...
চন্দ্ররেখা নামে কন্যা তাহার রমণী
মহাসতী পতিব্রতা রূপেতে ইন্দ্রানী।
তান ঘরে জর্মিয়াছে বিদ্যা নামে কন্যা
ত্রৈলোক্য মোহিনী বিদ্যা সর্বলোকে ধন্যা।
আপনি ভারতী মাতা কণ্ঠে অধিষ্ঠান
বিদুষী পণ্ডিতা কন্যা জগতে বাখান।

ইহার পর বিদ্যার রূপ বর্ণনা। কাব্যের সর্বাংগ ব্যাপিয়া বিদ্যার অথবা সুন্দরের রূপ বর্ণনার অংশগুলি কাব্যের মনোহারিত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু রসভংগ করিয়াছে ইহার পাঠ বিকৃতি। রসের ভোজে আয়োজন বড় কম হয় নাই। কিন্তু লিপিকরগণ অপটু হাতে ভোজ্য পরিবেশন করিতে যাইয়া ভোজটি মাটি করিয়াছে। উপমা উৎপ্রেক্ষা

ইত্যাদি বিবিধ কাব্যালঙ্কার প্রয়োগের অভাব নাই। কিন্তু অনেক সময় হাতের অলংকার পায়ে, নাকের অলংকার কানে পরাইয়া কাব্যলক্ষ্মীর আসল চেহারাটিকে শ্রীহীন করিয়া ফেলা হইয়াছে। তথাপি এই সব বিকৃত এবং অর্থহীন শব্দজালের মধ্য হইতেও দুই একটি পদ 'মেঘ রন্ধ্রচ্যুত তপনের জলদর্চি রেখার" মতই ক্ষণে ক্ষণে কাব্যকে দ্যুতিময় করিয়া তুলিয়াছে। রূপসী, বিদুষী বিদ্যার যোগ্য বর মিলে না।

"প্রিতিমবীর রাজা আইল্যা শুনি সয়ম্বর
একজন না আসিল বিদ্যা যোগ্য বর।"

কারণ বিদ্যার প্রতিজ্ঞা, শাস্ত্রবাদে যে তাহাকে পরাজিত করিতে পারিবে, তাহাকেই সে বিবাহ করিবে। কিন্তু কেহই বিদ্যাকে তর্কে পরাস্ত করিতে পারে না। অবশেষে, লোকমুখে সুন্দরের প্রশংসা শুনিয়া রাজা মাধব ভট্টকে ডাকিয়া সুন্দরের উদ্দেশ্যে রত্নাবতী নগরী যাইতে আদেশ করিলেন। মাধব ভট্ট সুন্দরের নিকট উপস্থিত হইয়া নানা কথার শেষে বিদ্যার প্রসংগ অবতারণা করিয়া তাহার রূপের প্রশংসা করিতে লাগিল।

এতেক শুনিয়া বীরে মদন বিভোল
কহ কহ করিয়া করয়ে উতরোল।

ইহার পর বিদ্যার রূপ বর্ণনা। এই অংশটি বেশ দীর্ঘ। সুন্দর-জিজ্ঞাসা করিল. "কেমত বদন শোভা?" মাধব ভট্ট বিদ্যার অপরূপ বদন কান্তির বিবরণ দিলে সুন্দর জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন নাসার ঠাস? নাসিকার বর্ণনা দেওয়া হইলে সুন্দর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, 'কিরূপ চিকুর তার কিরূপ সাজনি?" এমনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন চলিতে লাগিল, কেমত নয়ন? কেমত দশন, কেমত চলন, কিরূপ কাখালী? মাধবভট্টও একটির পর একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়া প্রতি অংগ খুঁটিয়া খুঁটিয়া বিদ্যার রূপ বিশ্লেষণ করিয়া চলিল। দুই একটি পদ তুলিয়া দিতেছি—

সুরংগ অধর তার জিনিয়া হিংগুল
ঝরিল বান্দাল পুষ্প লজ্জায়ে আকুল।...
মাথার চিকুর ভার জলদ বরণ
হাটিয়া যাইতে করে পৃথিবী মার্জন।...
খঞ্জন চকোর আর কুমুদ কুরুংগ
নয়ান দেখিয়া তার অপমানে ভংগ।...
ভ্রূভংগে শোভে যেন (আখণ্ডল) প্রভা
কন্দর্প কুসুম (ধনু) জিনি তার (?) শোভা।...
কটিতে কিংকিনী বাজে চরণে নুপুর
রুনুঝুনু শব্দ করে শুনিতে মধুর।

সবিস্তারে বিদ্যার রূপ বর্ণনা করার পর মাধব ভট্ট—

পৃথিমবীতে রূপ নাহি তাহার সমান
তোমার যোগ্য নারী বিধি করিল নির্মাণ।—বলিয়া বিদায় লইল।

বিদ্যার কথা স্মরণ করিয়া সুন্দরের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িল।

শরীর কম্পিত হইল মুখে নাহি রা

চমকি চমকি উঠে থির নহে গা।
হাস্য রস নাহি তাতে মুখে নাহি শব্দ
কামানলে দহে তনু অবিরত তপ্ত।

ভাবিতে ভাবিতে সুন্দর অচেতন হইয়া পড়িল। তাহার অবস্থা দেখিয়া এবং ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া সকলে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। রাজা ক্রন্দন জুড়িলেন, পাত্রমিত্র শোকাকুল হইয়া পড়িল। পরিচর্যার পর চেতন পাইয়া আসল কারণ গোপন করিয়া সুন্দর বলিল, বায়ু দোষে 'শরীর ঘূর্ণিত' হইয়া পড়িয়াছে।

এ বলিয়া তথা হস্তে হইল বাহির
সুন্দরী উদ্দেশ করি চিত্ত কল্যা থির। এবং উজানী নগরের উদ্দেশ্যে
বা ভা (?) নামে এক অশ্ব মহা বলবান
তাহাতে চড়িয়া বীর করিল প্রয়ান।

এদিকে সুন্দরের খোঁজ না পাওয়াতে "পুরী মধ্যে উঠিলেক ক্রন্দনের রোল"। ইহার পর আড়াই পৃষ্ঠাব্যাপী রাজারাণীর বিলাপোক্তির পর একটি সংস্কৃত শ্লোক—যাহার মর্মোদ্ধার করা সাধ্যাতীত। ইহার পর কাহিনীর ধারা আংশিক ভাবে ছিন্ন হইয়াছে। কারণ পূর্ব অধ্যায়ে "কতদিনে পাইল গিয়া উজানী নগর" বলা হইলেও কখন, কিভাবে সুন্দর মালিনীর ঘরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহা কাহিনীতে নাই। কাহিনী পুনরারম্ভ হইয়াছে সুন্দর ও মালিনীর কথোপকথন দিয়া। মালিনীর প্রশ্নের উত্তরে সুন্দর নিজের পরিচয় দিয়া রাত্রি বাসের জন্য তাহাকে অনুমতি দিবার জন্য অনুরোধ করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল —'কার লাগি পুষ্প গাঁথ কহত মালিনী ?' মালিনী বীর সিংহ সুতা বিদ্যার পরিচয় দিয়া তাহার প্রতিজ্ঞার কথাও ব্যক্ত করিল, সংগে সংগে অন্যস্থানে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করার জন্য সুন্দরকে অনুরোধ করিল। কারণ—রাজার কোতোয়াল রাত্রি দিন তার অনুচরগণ সহ ঘুরিয়া বেড়ায় এবং —

যার ঘরে পায়ে পরদেশী পরবাসী
বিচার না করি তার গলে দেয় ফাঁসি। বিশেষতঃ—
রাজার নন্দিনী কন্যা পরম বিদুষী
তারে রক্ষা (হেতু) কোতোয়াল ফিরে অহর্নিশি।

সুন্দর বিস্মিত হইয়া বলিল—

স্ত্রী হয়্যা রাজকন্যা বিদুষী পণ্ডিতা
শুনিতে অশক্য লাগে অপরূপ কথা।
রাজকুলে জন্মি কেনে বিভা নাহি হয়
কিমতে (?) বিফল বরে তাহার জইবুন সময় ?

মালিনী পুনরায় বিদ্যার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহাকে শাস্ত্রবাদে পরাজিত করার জন্য উপদেশ দিলে সুন্দর উপহাস করিয়া বলিল,—

বিদ্যার গুরুরে আন আমার গোচর
পড়াইয়া দিতে পারি দ্বাদশ বৎসর।

যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত সুন্দর সেই রাত্রি মালিনীর ঘরে রহিল। ভোরবেলা মালিনী মালঞ্চ হইতে "চিত্র বিচিত্র পুষ্প গন্ধ মনোহর' তুলিয়া আনিলে সুন্দর বলিল—

আমি তোমার পুষ্প গাঁথি তুমি যাহ হাটে
রাজভক্ষ্য দ্রব্য কিনি আনি দেহ ঝাটে।…
এথায়ে কুমার ধ্যায়ে জগত জননী
বিনিসুতে পুষ্প গাঁথে বীর মহামুনি।
পুষ্পে পুষ্পে দিয়া গাঁথে কৈরব কমল
তার পাশে গাঁথিলেক কুমুদ সকল।
অমূল্য রত্ন দিয়া গাঁথে পুষ্পহার
নবীন জলদে জেন বিজলী সঞ্চার।

রাঁধিয়া বাড়িয়া ভোজন সমাপ্ত করিয়া 'কর্পূর তাম্বুল" মুখে দিয়া মালিনী বিদ্যার ঘরে চলিল। মালিনীর সাজসজ্জার বর্ণনাটি চমৎকার।

পরিল বিচিত্র সাড়ি মালিনী বিদগ্ধী
মুখ পদ্ম শোভা করে পূর্ণ জলনিধি।
সুবর্ণের ঝাম্পে (?) খোপা বাঁধিলেক টানি
তাহাতে তুলিয়া দিল শত বর্ণ (?) মালি।
শিরেতে সিন্দুর দিল নয়নে কাজল
বিচিত্র কুণ্ডল কর্ণে করে ঝলমল।
দুই হস্তে কংকন দিল দুই হস্তে তাড়
গলায়ে তুলিয়া দিল গজমুক্তা হার।
সুবর্ণ কাঁচুলি কুচে শোভয়ে সোনার (?)
হাসিতে প্রকাশ করে নাশে অন্ধকার।
গলে শোভে মালিনীর সপ্তসারি হার
দুই সারি দন্ত শোভে হিংগুল আকার।
পায়েতে নূপুর দিল কটিতে কিঙ্কিনী
বিদ্যারে ভেটিতে তবে (?) মালিনী সুন্দরী।…
কর্পূর তাম্বুল খাই খঞ্জন গমন
ভূমিতে না লাগে পাঅ হংসের গমন।
হাসি হাসি চলি যায়ে মালিনী সুন্দরী
নগরনাগরী গণ চায়ে ফিরি ফিরি।

'অনাসুতে' পুষ্প দেখিয়া বিস্মিত বিদ্যা জিজ্ঞাসা করিল,—

এতকাল অবধি পুষ্প আসিছ জোগাই
কোন কালে হেন পুষ্প আমি নাহি পাই।
কেবা গাঁথিয়াছে পুষ্প সত্য কহ মোরে।
আজুকার পুষ্পে কেন সর্বঅংগ জুড়ে।
কি হেতু অমূল্য গন্ধ আজুকার ফুল
কম্পিত শরীর মোর চিত্ত যে ব্যাকুল।

আর বিনে পুষ্প কেন সর্বঅংগ পুড়ে। ইত্যাদি বিদ্যার সন্দেহ হইল যে মালিনীর ঘরে কোন 'বিদগ্ধ' রহিয়াছে—যে এই পুষ্পমাল্য গাঁথিয়াছে। মালিনী বলিল, তাহার ঘরে ভগিনীপুত্র পাঁচ বৎসরের একটি শিশু আছে মাত্র। ইহাকে ছাড়া কাহাকেও পাওয়া গেলে 'অবিচারে আমার কাটিয়ো নাক কান'। এদিকে সুন্দর ব্যাকুল হৃদয়ে মালিনীর উদ্দেশ্যে পথের পানে চাহিয়া রহিয়াছে,—'চাতক রহিছে জেন জলধর আশে'। মালিনী উপস্থিত হইতেই সুন্দর জিজ্ঞাসা করিল, "সুন্দরী বিদ্যায় কি বলিল পুষ্প দেখি ?" মালিনী বলিল, আজ রাজকন্যা আমাকে বড়ই অপমান দিয়াছে, আমি মিথ্যা কথা বলিয়া কোন রকমে সরিয়া আসিয়াছি কিন্তু 'প্রত্যয় না জায়ে কন্যা।' অতএব, তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও। সুন্দর না ঘাবড়াইয়া বলিল, কি দোষে নৃপতি দণ্ড করিবে আমারে ? অতিথি আসিলে কেবা বিমুখ করায় ? "অতঃপর শ্লোক আবৃত্তি করিয়া অতিথির গুরুত্ব বর্ণনা করিলে মালিনী রাজী হইয়া বলিল,

"মোর ঘরে থাক তুমি রাজার নন্দন
অবশ্য কন্যার সংগে হবে দরশন।

পুঁথিতে ইহার পর "বিদ্যাসুন্দর স্বপ্ন কথন"। নায়ক নায়িকা পরস্পরকে স্বপ্নে দেখিয়া 'মদনে বিভোল" হইয়া পড়িল। বিদ্যা দেখে, নায়ক—

হস্তে ধরি বিদ্যারে যে তুলি লইল কোলে
আলিংগন চুম্ব দিয়া প্রিয় বাক্য বলে।

আর সুন্দর দেখে,—

বসিয়া সুন্দরী কন্যা মাগে আলিংগন
শয্যাতে বসিয়া করে প্রেম বিলাসন।
বাম পাশে বসাইয়া দুই হাতে ধরি
হাস্য কথা লাস্য (?) কথা কয়েন সুন্দরী।

পরক্ষণেই স্বপ্ন ভাংগিয়া যায় আর—

সপন দেখিয়া আঁখি মেলিল সুন্দর
চারিদিকে নিরক্ষিল অন্ধকার ঘর।

উভয়েই স্বপ্ন ভংগ বেদনায় কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল। সখীগণ বিদ্যাকে আর মালিনী সুন্দরকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। পরদিন সুন্দরের গাঁথা বিনিসুতে মালা লইয়া বিদ্যার কাছে গেলে তাহার ব্যগ্রতা দেখিয়া মালিনী সব কিছু প্রকাশ করিয়া সুন্দরের রূপগুণ বর্ণনা করিল। অধীর হইয়া বিদ্যা বলিল, 'ঝাটে গিয়া আন কুমার মোর অন্তপুরী।" মালিনী ভাবিয়া বলিল,—

"যমের দক্ষিণ দ্বারে তোমার অন্তপুরী
কার শক্তি পুরীমধ্যে আসিবারে পারি (?)
কন্যা বলে নানান শাস্ত্রে বিদগ্ধকুমার
লীলায়ে আসিতে পারে পুরীতে আমার।

ফিরিয়া আসিয়া—

হাসিয়া মালিনী বলে শুন যুবরাজ
পরিহর সর্ব দুঃখ সিদ্ধ হবে কাজ।

তোমারে যাইতে আজ্ঞা দিলা রাজসভো
গুপ্ত পথে কোনমতে যাইতে পার তথা।
এতেক শুনিয়া তবে হাসে যুবরাজ
কত বড় কার্য লাগে যাইতে পুরীমাক
এ বলিয়া যুবরাজে অংগ শুচি হয়্যা
কালিকা তপনা করে উদ্দেশ করিয়া।

'তপনা' শেষে 'ভক্ত বৎসলা দেবী দিলা দরশন'। 'জয় জগৎ মাতা' ইত্যাদি বলিয়া সংস্কৃতে দীর্ঘ ভজনা শেষে দেবী সন্তুষ্ট হইয়া সুন্দরের প্রার্থনা মত বর দিলেন।—

কুমারের বাক্যে দেবী হাসে খলখলি
হইল সুড়ংগ তুমি কর গিয়া কেলি।

দেবীর বরে অভিসারের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে।

অস্ত গেল দিনমণি নিশি উপস্থিত
নিশি আসি উদিলেক নক্ষত্র সহিত।
মালিনী বিদ্যার ঘরে হইসে একপথ
সুড়ংগে প্রবেশ কল্ল্য বীর বিদগত।…
বিদ্যার সকল সখি সুখে নিদ্রা যায়
চমকিয়া কর্ণ পাতি সুনয়ে বিদ্যায়।…
দুইজনে চারিচক্ষু হইল মিলন
সাক্ষাতে দেখিল জেন দ্বিতীয় মদন
ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া বিদিত (?)
খাট হস্তে ঢুলি বিদ্যা পড়িল ভমির্ত (?)

সুন্দর কর্তৃক পরিচর্যার পর চেতন পাইয়া বিদ্যা লজ্জায় আরক্ত হইয়া হেট মাথায় কতক্ষণ বসিয়া রহিল। তারপর চোর বলিয়া সুন্দরকে তিরস্কার করিতে লাগিল। কিন্তু সুন্দরও কম যায় না। সে উল্টা বলিয়া বসিল—

যদি বা আমারে দেখ চোরের চরিত
তবে কেনে আমাবে দেখি হইলা মোহিত?

যাইহোক, অনেক কথা কাটাকাটির পর অবশেষে শাস্ত্র বিচারের কথা উঠিল। বিদ্যা বলিল, যদি তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পার 'তবে সে জিনিবা তুমি মোর প্রাণেশ্বর'। পুঁথি এখানে পুনরায় খণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়। কারণ বিদ্যার প্রশ্নের অংশটি ছাড়াই সুন্দরের উত্তর শুরু হইয়াছে—

সর্ব শাস্ত্র বিদগ্ধ বলিল সুন্দর
শোলোক বর্ণনা করি দিলেক উত্তর।

একে বিকৃত সংস্কৃত তদুপরি বাংলায় হেঁয়ালীপূর্ণ ভাষ্য। সুতরাং বক্তব্য বুঝিয়া উঠা দুঃসাধ্য। বস্তুতঃ পুঁথিতে বিস্তর দুর্বোধ্য সংস্কৃত শ্লোকের কোনটিরই অর্থবোধ করা নিবন্ধকারের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। নিধিরাম সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ লিপিকরগণের হাতে পড়িয়া তাহার ভাষা কিম্ভূতকিমাকার পদার্থে পরিণত হইয়াছে।

চাকমা হস্তলিপির নিদর্শন, পুথির ২১ পৃষ্ঠার একটি অংশ

পরপর দুইটি শ্লোকে এবং বাংলায় তাহাদের ব্যাখ্যা শুনিয়া বিদ্যা "সাধু সাধু" করিয়া উঠিল এবং—

পুষ্পমালা লয়ে বিদ্যা মন কুতূহলে
নমস্কার করি দিল কুমারের গলে।
নাগর নাগরী যোগ্য হইল দুইজন
চান্দ সুরুজে জেন হইল মিলন।
গন্ধর্ব বিবাহ করি নির্জনে গোপনে
আনন্দে মদন কেলিভুঞ্জে দুইজনে।

ইহার পর কখনও ত্রিপদী কখনও পয়ার ছন্দে দীর্ঘ ৬/৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী নায়ক নায়িকার "প্রেম বিলাস" এবং ক্ষণ বিচ্ছেদের আক্ষেপ ও পুনর্মিলনের উচ্ছ্বাস বর্ণনা। এই জাতীয় কাহিনীতে সমকালীন কাব্য সাহিত্যে সম্ভোগ বিলাসের যে কুৎসিৎ চিত্র অংকিত দেখিতে পাই সেই তুলনায় আলোচ্য কাব্যে একেবারে নির্ভেজাল না হইলেও নিতান্ত নিরামিষ বস্তুই পরিবেশন করা হইয়াছে।

এইভাবে সুড়ংগ পথে বিদ্যার শয়ন কক্ষে গোপন অভিসার চলিতে লাগিল।

নিতি নিতি আইসে যায় থাকয়ে গোপনে
না জানে অন্যজনে মালিনী বিহনে।

ফলে অঘটন যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়া গেল. বিদ্যা অন্তঃসত্ত্বা হইয়া পড়িল। একদিন হারাবতী ও মালাবতী নাম্নী দুই সখী বিদ্যার গর্ভলক্ষণ টের পাইয়া মহিষীকে জানাইয়া দিল। রাণী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বিদ্যার ঘরে উপস্থিত হইয়া ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন এবং—

কেমনে সাহস করি চোর সান্ধাইয়া
শৃঙ্গার করহ তুমি তস্কর লইয়া। বলিয়া ভীষণ গালাগালি করিতে

লাগিলেন। বিদ্যা 'উদর হইল ডাংগর প্লীহার কারণ' ইত্যাদি কাজে অঙ্গুহাত দেখাইয়া "সাহসে কপট করি ভাণ্ডায়ে জননী।" কিন্তু "শুনি উপহাস্য কল্প্য রাজার মহিষী" এবং—

সত্বরে রাজারে গিয়া জানাইল সকল
শুনিয়া নৃপতি হইল জ্বলন্ত অনল।

লজ্জায় এবং ক্রোধে আকুল হইয়া রাজা কোতোয়ালকে চোর খুঁজিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু তিন দিন ধরিয়া একলক্ষ সৈন্য লইয়া সারা নগর চষিয়াও যখন চোর পাওয়া গেল না তখন কোতোয়াল রাজার কাছে গিয়া বলিল,—

অভিপ্রায় (?) থাকে চোর বুঝি অন্তঃপুরী
গুপ্ততে থাকিয়া তাহার জবুন করে চুরি।

রাজার অনুমতি পাইয়া অন্তঃপুরী সন্ধান করিয়াও যখন চোর পাওয়া গেল না তখন কোতোয়াল এক বুদ্ধি বাহির করিল। জায়গায় জায়গায় সিন্দুর মাখাইয়া ধোপানীকে বলিয়া রাখিল, "যার বস্ত্রে সিন্দুর পাও মোরে দিবে আনি।" সেই রাত্রেও সুন্দর বিদ্যার পুরীতে গিয়া—

বিবিধ বিধানে কেলি নিশি গঙাইল
বনপ্রিয়া নাদ শুনি বাসায় চলিল।

বসনে সিন্দুর সব হইল জড়িত
বিলম্ব না করি বস্ত্র বর্জিল ত্বরিত।

সকাল বেলা—বিস্ময়ে নৃপতি যোগ্য দেখিয়া বসন
বলে গিয়া ধোপানীরে কোতোয়াল খান।...
বিদায় ধোপানীরে কল্ল্য বহুত রত্ন দিয়া
বেড়িল মালিনী পুরী নিশাভাগে গিয়া।

খুঁজিতে খুঁজিতে পুরীর কোণায় সুড়ংগ আবিষ্কৃত হইলে সৈন্যগণ "চোর পাইলুম পাইলুম সবে করে উতরোল"। সেই সময় সুন্দর মালিনীর ঘরে ছিল। শব্দ শুনিয়া—

ভয় পায়া যুবরাজ কন্যারে এড়িয়া
মালিনীর ঘরে জায়ে সুড়ংগ বাহিয়া।
সুড়ংগের দ্বারে দেখি কটক বিস্তর
তথা হস্তে নিঃসরিয়া আইল বিদ্যার ঘর।
সর্ব বুদ্ধি হত হইল নাই কিছু সন্ধি
ব্যাধের হস্তেতে জেন মির্গ হইল বন্দী।

সুন্দর কন্যাকে আলিংগনে বন্ধ করিয়া বিলাপ শুরু করিল। মাঝে মাঝে বিদ্যার সান্ত্বনা বাণী। অবশেষে বিদ্যা বলিল—

আমার বস্ত্র আভরণ তোমারে পরাই
কেহ যদি জিজ্ঞাসিলে সখী বলি কই।...

তারপর— অংগ হতে খসাইয়া পুরুষের বেশ
পরাইল নেতের সাড়ি হরিষ (?) বিশেষ।
ঝুটানি বানদিয়া দিল রত্ন রাজি প্রাণ ?
তাহাতে তুলিয়া দিল মণিমুক্তা ছড়া।
সুচারু শ্রীফল যুগ হৃদে দিল তুলি
তাহাতে তুলিয়া দিল সুবর্ণ কাচুলি।
হেন মতে আভরণ পরাই সর্ব অংগে
(   ) মৃদুস্বরে হাসে মনুরংগে।
এস এস সখী বুলি ডাকয়ে সদাই
সম্মুখেতে বসাইল সখীরূপ সাজাই।

কোতোয়াল বিদ্যার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া চোর না পাইয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেল। শেষে দেখা গেল—

যত সখী লেখা ছিল একজন বাড়াহা
সবে বলে নারী মধ্যে আছে সখীচোরা।

শেষ পর্যন্ত যুক্তি করিয়া কোতোয়াল বাহিরে একটি 'খন্দক' খুঁড়িয়া সখী সহ রাজকুমারীকে তাহা পার হইয়া যাইতে বলিল। 'বামপদ অগ্রে দিয়ে যায় বামাগণ' কিন্তু—

সুজনে আপনাগুণ সংকটে না ছাড়ে
জানিশুনি কল্ল্য পাপ বিনাশর তরে।

এই মতে পার হইল সকল কামিনী
তার পাছে পার হইল রাজার নন্দিনী।
তার পাছে ইন্দুমতী সখী হইল পার
তার পাছে ডান পদে লঙ্ঘিল কুমার।
সর্প চলিল যেন গিলিবারে ভেক
সিংহ যেন লর দিল গজ ধরিবারে
লম্ফ দিয়া কত্তুয়ালে ধরিল কুমার।
হরিণ দেখিয়া স্নেন ব্যাধ দিল ঝাপ
ক্রোধে কত্তুয়ালে বলে কোথায় যাইবা পাপ।
স্ত্রীবেশ ধরি বেটা স্ত্রী কর চুরি
মোর হস্তে পড়ি আজ যাইবে জমপুরি।
পঞ্চদিন অবধি আমার নাই অন্নপানি
আশা পূর্ণ হইল স্নেন আজুকা যে জানি।

এইবার বিলাপের পালা বিদ্যার। বন্দীকে ছাড়িয়া দিবার জন্য অনেক স্তবস্তুতিতেও যখন কাজ হইল না তখন বিদ্যা বহু মাণিক্যরতন, অলংকারাদি উৎকোচ প্রদানের চেষ্টা করিল। কিন্তু শত প্রলোভনেও কোতোয়ালের মন টলিল না। সখীগণ সান্ত্বনা দিতে লাগিল, এমন কি কঠিন হৃদয় কোতোয়াল পর্যন্ত বিদ্যাকে প্রবোধ দিতে লাগিল।

রাজসভায় নীত হইলে তাহার কন্দর্প সদৃশ রূপ দেখিয়া রাজা সহ সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া সুন্দরের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। "এমন সুন্দর বীর কাটিবে রাজায়" ভাবিয়া সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িল।

সুন্দর সংস্কৃত শ্লোক আউড়াইয়া সরস্বতী বন্দনা শুরু করিল—

আসিল বৈকুণ্ঠ বাসী বিষ্ণুর ঘরণী
সুন্দরের কণ্ঠেতে হইল (?) নিবাসিনী।

কাহিনীর ১৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী পরবর্তী অংশে শ্লোকের পর শ্লোক আবৃত্তি করিরা বিদ্যার রূপগুণ এবং 'রজনী শৃঙ্গার'-এর বিবরণ লিপিকরের হাতে এই শ্লোকগুলির এমন বিকৃতি ঘটিয়াছে যে এইগুলি হইতে কোন বস্তু উদ্ধার করা সম্ভব নয়। শ্লোকের পর পরই বাংলা ভাষ্য।

সুন্দরের মুখে শুনি বিদ্যার কথন
মুখে বস্ত্র দিয়া হাসে যত সভাগণ।
সভার ভিতরে চোরের শুনি হেনবাত
অগ্নি হেন কোপে জ্বলে উজ্জানীর নাথ।

রাজা হুকুম করিলেন—

সভামধ্যে কয়ে চোরে নাই ভয় লাজ
শীঘ্র করি কাট চোরে না করিয় ব্যাস (?)

কিন্তু পুনরায়—আরবার যুবরাজে জোর করি হাত
কহিতে লাগিল শ্লোক রাজার সাক্ষাৎ।

এই ভাবে শ্লোক চলিতে লাগিল। ক্রমে সুন্দর বাড়াবাড়ি করিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে রাজার

ক্রোধও বাড়িয়া চলিল। সুন্দরের নির্লজ্জ উক্তি শুনিয়া রাজা নিজেই 'লজ্জায়ে আকুল' হইয়া আদেশ করিলেন—বাপের গোচরে কয়ে ঝিয়ের বাখান

শীঘ্র করি কাট নিয়া দক্ষিণ মশান।

অবশেষে— তবে রাজা বীর সিংহ ক্রোধ বিবর্জিত

বন্ধন মোচন কল্য জানিয়া বিহিত।

কিন্তু এই "বিহিত' বিবরণ পুথিতে নাই। কাহিনী ধারার বর্ণনায় এই পদটি আকস্মিক এবং অসংগতিপূর্ণ। কাহিনীতে হঠাৎ এইভাবে 'ক্রোধ বিবর্জিত" হইবার পূর্বাপর কারণ উল্লেখ না থাকায় বোঝা যায় যে এখনেও পুথি কিঞ্চিৎ খণ্ডিত। যাহাই হউক, রাজা পরিচয় জানিতে চাহিলে অভিমানে ক্ষুব্ধ সুন্দর উত্তর করিল—

সভাতে আনিয়া মোরে কলল্যা বিড়ম্বন (?)

পরিচয় দিয়া মোর কোন প্রয়োজন।

কিন্তু এমন সময় মাধব ভট্ট আসিয়া সুন্দরের বিশদ পরিচয় প্রকাশ করিলে চতুর্দিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। সুন্দরের প্রতি আদর অভ্যর্থনা শুরু হইল। গায়ে তৈল মাখাইয়া 'পঞ্চ শত কুম্ভ' গংগোদকে স্নান করাইয়া তাহাকে নানা বসন ভূষণে সজ্জিত করা হইল। পরিশেষে এইভাবে 'সুন্দরী বিদ্যার দুঃখ হইল অবসান' এবং সুন্দরের হাতে 'অর্ধরাজ্য সমে কন্যা সমর্পে নৃপতি'।

এইবার 'রত্নাবতী' লইয়া কিছু শুন সমাচার—

সর্বদেশ বিচারিয়া না পাইল সুন্দর

নিশিদিশি দম্পতিয়ে কান্দে নিরন্তর।

রাজকার্য এড়িলেক শয়ন ভোজন

পুনর্বার কালিকারে করে আরাধন।

দেবী সদয় হইয়া সুন্দরকে স্বপ্নে দেখা দিয়া পিতা মাতার দুর্দশা বর্ণনা করিলেন। তাহার বিমর্ষতার কারণ জানিতে চাহিলে স্বামীর মুখে স্বপ্ন বিবরণ শুনিয়া বিদ্যাও বলিল—'যথায় তথায় যাও তুমি আমি যামুই সংগ'। রাজা অনুমতি দিলেন।

কুমারি যাইব দেশে শুনি সর্বজন

উজানীর ঘরে ঘরে উঠিল ক্রন্দন।

বিদায়ের আয়োজন শুরু হইল। কোতোয়াল আসিয়া ক্ষমা চাহিল, মালিনীকে বহু ধনরত্ন দান করা হইল, রাজার আদেশে দিব্য রথ সাজান হইল।

নানান রত্ন হীরা মণি মাণিক্য পাথর

দাসদাসী হস্তী ঘোড়া দিলেক বিস্তর।

তবে রাজা বীরসিংহ পাত্রমিত্র লয়্যা

এক মাস পথ তবে (?) দিল বাড়াইয়া।

অযোধ্যা ছাড়ি যেন বনে গেল রাম

উজানীর লোক কান্দে ত্যাজি গৃহকাম।

কতদিনে যুবরাজ মিলে নিজ দেশ

শুনিয়া সে গুনাখার আনন্দ বিশেষ।

নারীগণ সংগে করি রাজা গুনাখার

পুত্রেরে বাহাঁর নিল ঘরে আপনার।
এই মতে হরিষ হইল রাজা গুনাখার
পুত্র বধু দেখি রাজা আনন্দ অপার।

পুথিতে এইখানেই কাহিনীর শেষ। আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি যে পুথির স্থানে স্থানে কাহিনী ছিন্ন হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় মূল পুথিও স্থানে স্থানে খণ্ডিত ছিল। সে কারণে মূল কাহিনী আরও অগ্রসর হইয়াছে কিনা বলা যাইতেছে না। অত্যন্ত দুর্ভাগ্য—এইখানে আসিয়া পুথির শেষ পৃষ্ঠাটি যেমন সাংঘাতিক কীটদষ্ট তেমন গুরুতর পাঠদুষ্ট। সুবোধ্য শেষ দুইটি ছত্রের পাঠ নিম্নরূপ—

রইয়া সে চন্দ্রগ্রাম মনের হরিষে
সপ্পুন্ন হইল গ্রনত বিংসত্তি দিবসে।

চন্দ্রগ্রাম বা ঐ জাতীয় নামের কোন চট্টগ্রাম অঞ্চলে ছিল কি? ইহা কি বর্তমানে চাঁদগাঁও? পুথির অন্যত্র আছে—'রইয়া সুরের গ্রাম গায়ে কবি নিধিরাম'। এই স্থানটিরও কোন হদিশ পাওয়া যাইতেছে না। "চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত পটিয়া থানার চক্রশালা নামক গ্রামে কবির জন্ম বলে সাহিত্য বিশারদ অনুমান করেছেন।" সাহিত্য বিশারদের (আবদুল করিম) এই অনুমানের ভিত্তি কি ছিল, তৎসংগৃহীত পুথিতে ইহার কোন ইংগিত ছিল কিনা, নিবন্ধকারের তাহা জানা নাই।

একশত এক পৃষ্ঠাব্যাপী পুথির দ্বিসহস্রাধিক পদ হইতে সামান্য কয়েকটি উদ্ধৃত করিয়া কবির রচনারীতির পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু পুথির বিপুল অংশের বিকৃত পাঠ হইতে ইহার কাব্যমূল্যের উৎকর্ষ অপকর্ষতার সঠিক বিচার করা কঠিন। তবে যতখানি বোঝা যায় তাহাতে নিধিরামের কবিত্বশক্তিকে মোটেই অবজ্ঞা করার কারণ নাই। বিশেষতঃ পুথিতে প্রাপ্ত শেষ ছত্রের তথ্য যদি অবিশ্বাস করা না হয় তবে "বিংশতি দিবসের" মধ্যে এই কাব্যগ্রন্থ সম্পূর্ণ করা কাহারও পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়। কবিকে সংগীত শাস্ত্রেও পারদর্শী মনে হয়। কারণ পুথির স্থানে স্থানে গুঞ্জরী, করুণা, বসন্ত ইত্যাদি বিবিধ রাগের উল্লেখ দেখা যায়।

ভারতচন্দ্রের দীপ্তোজ্জ্বল কাব্য প্রতিভার তুলনায় নিধিরামের প্রতিভাকে নিঃসংশয়ে নিতান্ত ক্ষীণ, নিতান্ত নিষ্প্রভ বলা যাইতে পারে। কিন্তু যে প্রেক্ষিতে একই মানদণ্ডে কাব্যমনীষার বিচারে দৈত্যাকার ভারতচন্দ্রের সংগে বামনাকৃতির নিধিরামকে তোল করিয়া তাহাকে অত্যন্ত লঘুভার মনে হইতেছে সেই প্রেক্ষিত কি যথাযোগ্য? স্বীকার করি নিধিরামের কাব্যটি একটি উৎকৃষ্ট সাহিত্যকর্ম নয়। তাঁহার পুথিটির গুরুত্ব বর্তমানে যদি থাকে, তবে তাহা ইহার কাব্যমূল্যে নয়, অন্যত্রানে নিহিত—তাহা হইল ইহার রচনাকাল। এতদিন পর্যন্ত সাহিত্য গবেষকদের নিকট এই পুথি ১৭৫৬ ইংরাজীতে রচিত বলিয়া বদ্ধমূল ধারণা রহিয়াছে। কিন্তু আলোচ্য পুথিতে 'গজ বেদ কাল চন্দ্র' ভণিতাযুক্ত পদগুলি এই বিশ্বাসকে ঐতিহাসিক বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়াছে। অতএব ইতিহাস সংক্রান্ত নিষ্ঠুর রায় সংশোধন করিয়া নিধিরাম আচার্যকে অবিচারের হাত হইতে রক্ষা করার কর্তব্য, সেই সংগে অজ্ঞতাপ্রসূত মিথ্যাভাষণের দায় হইতেও নিজেদের উদ্ধার পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা বিচারকগণের সম্মুখে দেখা দিয়াছে। কারণ ভারতচন্দ্রের পরবর্তী পদকার হিসাবে বিবেচনা

কারতঃ একই তুলাদণ্ডে তাঁহার কাব্য কর্মকে ওজন করিয়া নিধিরামের মৌলিকত্বকে অস্বীকার করা এবং উপেক্ষার দৃষ্টিতে তাঁহাকে বিস্মৃতির গর্ভে নিক্ষেপ করা লঘুপাপে গুরুদণ্ড দেওয়ার মতই অন্যায়।

নিধিরাম যতখানি শক্তিমান তদপেক্ষাও অধিক ভাগ্যবান। বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর উপর আরও তো বহু কবির কাব্য রচিত হইয়াছে। কিন্তু এ যাবৎ কাল পর্যন্ত সকলকে টেক্কা দিয়া তিনিই কেবল টিকিয়া রহিলেন। এই পার্বত্যভূমির প্রস্তরময় দুর্গ প্রাকারের অন্তরালে তাঁহার ক্ষুদ্র কিন্তু সুগঠিত সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র আধিপত্য হইতে এই পর্যন্ত কেহই তাঁহাকে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। ভারতচন্দ্রাদি বিদ্যাসুন্দর বৃত্তের অনেক দিগ্বিজয়ী কবি-সম্রাটের বহু ফলক বিশিষ্ট শাণিত অস্ত্রও এই কঠিন দুর্গ প্রাকারে প্রতিহত হইয়া ভোঁতা হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। বাংলাদেশের অন্যত্র যেখানে মহা মহা রাজন্যবৃন্দের রত্নখচিত সিংহাসন ধূলোয় লুটাইয়া পড়িয়াছে সেখানে, আগের ন্যায় জৌলুস না থাকিলেও, এখনও পর্যন্ত এখানে তিনি দিব্য স্বচ্ছন্দে, সদর্পে এবং সগৌরবে রাজত্ব করিয়া চলিয়াছেন। কৃতিত্ব না বলিলেও ইহাকে কম সৌভাগ্যের বিষয় বলা যায় না।

প্রায় বিভাষী হইয়াও যাহাদের সস্নেহ প্রচেষ্টা নিধিরামের কাব্যটি সহ আরও কতিপয় কাব্যকে কালের নির্মম কবল হইতে, অত্যন্ত পর্যুদস্ত অবস্থায় হইলেও বাঁচাইয়া রাখিয়াছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাহাদের অকৃত্রিম অনুরাগের বিষয়টি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের এক কোণায় স্থাপন করিলে তাহাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি পাইবে ভিন্ন ক্ষুণ্ণ হইবে না।

পরিশেষে, রুক্ষ, নিষ্করুণ প্রকৃতি হইলে জীবিকা আহরণের তাগিদে সংগ্রাম কৃচ্ছ জীবন হইতে ছিনাইয়া আনা তাঁহাদের বিরল অবসরে যে সমস্ত অখ্যাত গ্রাম্য চাকমা কবিগণ তাঁহাদের সহজাত রসতৃষ্ণার আবেগে, নিজেদের ভাষায় হউক বা অবিশুদ্ধ বাংলায় হউক, কাব্যচর্চার এই ধারাটিকে সঞ্জীবিত রাখিয়া আরণ্যভূমির সাহিত্য অংগনকে সরস করিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

১০ পৃষ্ঠা (শেষ ৮ পংক্তি)

(পুথির পাঠ)	(আনুমানিক বিশুদ্ধ পাঠ)
সুবাদিনে জুবরাজ করিল সুনন্দর।	শুভদিনে যুবরাজ করিল সুন্দরে
পুরিল নিরমল কিরতি দিগে দিগানতর।	পুরিল নির্মলকীর্তি দিকে দিগন্তরে।
এহিগানে হেই কতা অককৈ অবসান।	এই খানে এই কথা হউক অবসান
বিতদ্যার প্রশংসা কিসু কর অবদান।	বিদ্যার প্রসংগ কিছু কর অবধান।
গজবেদ কালসনদর সুকের সময়।	গজবেদ কাল চন্দ্র শকের সময়
শ্রি কবি রততনে কয়ে লকষির তনয়	শ্রী কবি রত্নে কয়ে লক্ষ্মীর তনয়।
বিসক্রমে রাজা সরিরাজা উজানি নগর	বিক্রম কেশরী রাজা উজানী নগর
মহারাসজ্যোসু স্বরাজা বিসুশ্রমে……।	মহা রাজ্যেশ্বর রাজা বিক্রমে……।

২১পৃষ্ঠা (প্রথম ৮ পংক্তি)

পুরিমত্ত্যা উঁদিলেক্ক ক্রন্দনের রুল ।
পুত্ত্র পুত্ত্র বলি রাআ অইল ব্যাকুল ।
খেনে উতে কেনে বৈসে পাগলেরা প্রায়
ভূমিতে পরিয়া রাজা কান্দের উসারায় ।
তবে এতায় পুরিমত্ত্যে রাজারা ময়াসি ।
করন্দন সুনিল এত্তায় পুরি মত্ত্যে বসি
গজবেদ কালসন্দ্র সকলি সুজিত ।
দেবভিতু নিদিরাম সিসুবিরসিত্ ।

পুরী মধ্যে উঠিলেক ক্রন্দনের রোল
পুত্র পুত্র বলি রাজা হইল ব্যাকুল ।
খেনে উঠে খেনে বসে পাগলের প্রায়
ভূমিতে পড়িয়া রাজা কান্দে উচ্ছরাই ।
তবে হোথা পুরী মধ্যে রাজার মহিষী
ক্রন্দন শুনিল তথা পুরী মধ্যে বসি ।
গজ বেদ কালচন্দ্র শক নিয়োজিত
দৈববিদ নিধিরাম শিশু বিরচিত ।

৫২ পৃষ্ঠা　প্রথম ৬ পংক্তি)

কুপিলার নাদ সুনি কুমার সুন্দর্ ।
সুরুংগ বাহিয়া উদে মালেনি ঘর্ ।
তমসিনি অত্ত্যাং পিক্ত উঁদিলে মিইত্
বিরয়ে মরজিয়া বিত্দ্যা অহিল অস্তির্ ।
গজবেদ কাল সন্দর সকলিসুরত্ ।
কবিরতনে গায়ে জেন জ্যাদির্ বিদুনাত ।

কোকিলার নাদ শুনি কুমার সুন্দর
সুড়ংগ বাহিয়া উঠে মালিনীর ঘর ।
তমস্বিনী অস্ত গেল উদিল মিহির ।
বিরহে মজিয়া বিদ্যা হইল অস্থির ।
গজ বেদ কাল চন্দ্র শক নিয়োজিত
কবিরত্নে গায়ে যেন জ্যোতির্বিদনাথ ।

বাংলায় দ্বিতীয় শোককাব্য ও কবি কেদারনাথ দত্ত

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মধুসূদনের উত্তর-সাধক হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্য থেকে একটি অভিনব কাব্যরূপ বাংলা সাহিত্যে আমদানী করেন, যাকে বলা হয় শোক কাব্য। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'চিন্তাতরঙ্গিনী' নামক শোককাব্যটি কেবল বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের 'প্রথম' শোককাব্য মাত্রেই নয়, এটি কবি হেমচন্দ্রেরও প্রথম প্রকাশিত কাব্য। সুতরাং দুদিক দিয়েই 'চিন্তাতরঙ্গিনী'র মূল্য ও মর্যাদা বিবেচনার যোগ্য।

ভারতীয় কাব্যসাহিত্যে শোক-প্রকাশক কবিতা যে একেবারে নেই, তা নয়। মহাকবি কালিদাসের 'রঘুবংশ' কাব্যের অষ্টম সর্গে ইন্দুমতীর মৃত্যুতে অজ-এর বিলাপ অংশটি এ প্রসঙ্গে সহজেই মনে আসে। কিন্তু 'ত্রিতাপ' এর অন্তর্গত সম্পূর্ণ আধিভৌতিক কারণে জাত শোককে অবলম্বন করে লেখা পুরো একটি কাব্য বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যে কোথাও নেই।

পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্যের মধ্যে সম্ভবতঃ ইংরাজিতেই সর্বাধিক শোককাব্য লেখা হয়েছে। পাশ্চাত্যে শোককাব্য 'Elegy' নামে পরিচিত। ইংরাজি সাহিত্যের প্রথম শোককাব্য হিসাবে 'এলিজাবেথীয় যুগে'র সর্বশ্রেষ্ঠ কবি এডমন্ড স্পেন্সার (১৫৫২-১৫৯৯) রচিত 'The Shepard's calendar' নামক কাব্যটির কথাই উল্লিখিত হয়। কাব্যটির প্রকাশ কাল ১৫৭৯ খ্রীস্টাব্দ। হেমচন্দ্রের 'চিন্তাতরঙ্গিনী'র মতো স্পেন্সারের এই কাব্যটিও ইংরাজি সাহিত্যের যেমন প্রথম শোককাব্য, তেমন স্পেন্সারেরও এটি প্রথম প্রকাশিত কাব্য।

স্পেন্সারোত্তর ইংরাজী সাহিত্যের শোককাব্য আলোচনায় সমালোচকরা সকলেই প্রায় এক বাক্যে বলেছেন যে ইংরাজি সাহিত্যের প্রধান শোককাব্য চারটি—মিলটনের 'Lycidus' (১৬৩৭ খ্রীঃ) শেলীর 'Adonais' (১৮২১ খ্রীঃ), টেনিসনের 'In Memorium' (১৮৫০ খ্রীঃ) ও ম্যাথু আরনল্ডের 'Thyrsis' (১৮৬৭ খ্রীঃ)। এদের মধ্যে আবার টেনিসনের কাব্যটিকেই ইংরাজি সাহিত্যের 'সর্বশ্রেষ্ঠ' শোককাব্য রূপে উল্লেখ করেছেন তাঁরা। এই চারটি কাব্যেরই একদিক থেকে যে গভীর সাদৃশ্য আছে তা হল এই যে, চারজন কবিরই স্ব স্ব বন্ধুর মৃত্যু তাঁদের কাব্যের প্রেরণা বা উৎসমূলে কাজ করেছে। মিল্টনের কলেজজীবনের বন্ধু এডওয়ার্ড কিং আইরিশ সমুদ্রে ডুবে মারা যান, শেলীর বন্ধু বিখ্যাত কবি কীটস্ এরও অকালে সমুদ্রে ডুবে মৃত্যু হয়, টেনিসনের বন্ধু হ্যালামেরও অকালে মৃত্যু হয় এবং আরনল্ডের বন্ধু কবি আর্থার হিউক্লাফও অকালে পরলোক গমন করেন।

হেমচন্দ্রের 'চিন্তাতরঙ্গিনী' কাব্যটির পিছনেও একটি করুণ ইতিহাস আছে। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে শ্রীশচন্দ্র ঘোষ নামে হেমচন্দ্রের এক বাল্য সুহৃদ আত্মহত্যা করেন। শ্রীশচন্দ্রের মৃত্যুর বেদনা হেমচন্দ্রের কবি চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ইংরাজি কাব্য সাহিত্যের সঙ্গে হেমচন্দ্রের ইতিমধ্যেই বিশেষ পরিচয় হয়েছিল, এবং ইংরাজী কাব্যসাহিত্যের অন্তর্গত শোক কাব্যগুলি, অন্ততঃ প্রধান প্রধান শোককাব্য (অবশ্যই আরনল্ডের 'Thyrsis' বাদে), যে গুলির মূল উৎসে কবিদের প্রেরণারূপে তাঁদের বন্ধুদের বিয়োগবেদনা ক্রিয়াশীল ছিল, সে সংবাদ হেমচন্দ্র রাখতেন। সুতরাং বন্ধু বিয়োগ বেদনায় বিচলিত হেমচন্দ্র তাঁর মনোভাবকে

ব্যক্ত করতে পাশ্চাত্য আদর্শে যে কাব্যটি রচনা করলেন, সেটাই হল তাঁর প্রকাশিত প্রথম কাব্য 'চিন্তাতরঙ্গিনী'—বাংলার প্রথম শোককাব্য।

১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দের ১১শে মে তারিখে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় কাব্য 'মিত্রবিলাপ' প্রকাশিত হল। জনৈক বন্ধুর বিয়োগে এই কাব্যের সূত্রপাত হয়।[১] কিন্তু কাব্যটিতে 'মিত্রবিলাপ' একটি খণ্ড কবিতা মাত্র, এবং এতে বিবিধ বিষয়ক আরো পনেরটি খণ্ড কবিতা আছে। তন্মধ্যে 'বন্ধুহীন কবি'ও একটি শোকপ্রকাশক খণ্ড কবিতা। সুতরাং 'মিত্রবিলাপকে একটি রীতিমত 'সম্পূর্ণ' শোককাব্য বলা যায় না। এবং এই কারণেই প্রথমা স্ত্রীও চারিজন বন্ধুর মৃত্যু উপলক্ষে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই জুন তারিখে প্রকাশিত 'বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'বন্ধুবিয়োগ' কাব্যটিকেই বাংলার 'দ্বিতীয়' শোককাব্য বলে পরিগণিত করা হয়ে থাকে। অবশ্য প্রথমাস্ত্রীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বঙ্কিমসুহৃৎ রামদাস সেন (১৮৪৪-১৮৮৫) 'বিলাপতরঙ্গ' নামে একটি কাব্য প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু সেটি এতাবৎকাল সাধারণ্যে আদৌ পরিচিত হতে পারে নি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'র অন্তর্গত 'বিহারীলাল চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বলদেব পালিত' গ্রন্থে কাব্যটি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে এটি ১২৬৬ সালে রচিত' এবং কাব্যটির 'চারিটি সর্গই' প্রথমে 'অবোধ বন্ধু পত্রে অগ্রহায়ণ-মাঘ, ১২৭৫, প্রকাশিত হইয়াছিল' (পৃঃ ১৮)। ১২৬৬ সালে অর্থাৎ ইংরাজি ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে রচিত হলেও এটিকে 'প্রথম' শোক কাব্যরূপে ধরা হয় না। স্বতন্ত্র কাব্যরূপে প্রকাশকালকে ধরেই 'বন্ধুবিয়োগ' কাব্যটিকে বাংলার 'দ্বিতীয়' শোককাব্য রূপে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

সুতরাং ১৮৬১ থেকে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই প্রায় দশ বৎসর সময়কালের মধ্যে বাংলায় আর কোন শোককাব্য রচিত হয়েছিল কিনা এই বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে সম্প্রতি আমি একটি কাব্যগ্রন্থ আবিষ্কার করেছি, যেটি ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। কাব্যটির নাম 'বিজনগ্রাম' এবং কাব্য রচয়িতার নাম কেদারনাথ দত্ত। এই কাব্যটিকেই অতঃপর বাংলার 'দ্বিতীয় শোককাব্য' হিসাবে গ্রহণ করতে হবে, যদিচ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখকদের দৃষ্টিতে একাব্যটি এখনও ধরা পড়েনি এবং কাব্য রচয়িতাও সম্পূর্ণ অনুল্লিখিত হয়ে আছেন। কাব্যটি সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে কাব্য রচয়িতা কেদারনাথ দত্তের জীবনকথা সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে কেদারনাথ দত্ত তাঁর পুত্র ললিতাপ্রসাদকে পত্রাকারে যে আত্মজীবনী লেখেন, তা ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে স্বলিখিত জীবনী' নামক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে কেদারনাথ তাঁর জন্মাবধি সরকারী কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ (১৮৯৪ খ্রীঃ) পর্যন্ত জীবনকথা বিবৃত করেছেন। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে জুন তাঁর মৃত্যু সময় পর্যন্ত জীবনকথা সুন্দারানন্দ বিদ্যাবিনোদ রচিত 'ঠাকুরভক্তি বিনোদ' (ঢাকা, ১৩৪৪) গ্রন্থ থেকে জানা যায়। কেদারনাথের জীবনীর যতটুকু অংশ আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয় তা একটু বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করে বাকি অংশটা সংক্ষেপে বলবো।

দত্ত বংশের আদি পুরুষ পুরুষোত্তম দত্ত আদিশূরের নিমন্ত্রণে গৌড়দেশে সমাগত পাঁচজন কায়স্থের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। পুরুষোত্তম দত্ত থেকে ১৭ পর্যায়ে গোবিন্দশরণ দত্ত দিল্লীশ্বরের আনুকূল্যে গঙ্গাতীরে যে বিস্তীর্ণ জমিদারী লাভ করেন, তা কালে গোবিন্দপুর

১. 'মনীষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়' (১৩৪০)—মন্মথনাথ ঘোষ। পৃঃ ৩৪।

নামে পরিচিত হয়। কলিকাতায় ইংরাজদের দুর্গ নির্মাণের জন্য গোবিন্দপুর গ্রাম পরিত্যাগ করে দত্তবংশের পরবর্তী বংশধর গঙ্গাতীরে হাটখোলায় জমিজায়গা লাভ করেন। হাটখোলার এই দত্তবংশের বিখ্যাত ব্যক্তি হলেন মদনমোহন দত্ত। মদনমোহন গয়া, চন্দ্রনাথ ইত্যাদি তীর্থস্থানে প্রভূত অর্থদান করেন—কলিকাতার হেদুয়া পুষ্করিণী (বর্তমান আজাদ হিন্দ বাগ) তাঁরই দান। মদনমোহনের পৌত্র রাজবল্লভ ছিলেন যোগী পুরুষ। ঘটনাচক্রে রাজবল্লভ সর্বস্বান্ত হন। রাজবল্লভের পুত্র আনন্দচন্দ্র দত্ত হলেন কেদারনাথের জনক। আনন্দচন্দ্র নদীয়া জেলায় উলাগ্রামের সুপ্রচুর বিত্তশালী জমিদার ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তোফীর কন্যা জগন্মোহিনী দেবীকে বিবাহ করেন। আনন্দচন্দ্রের প্রথম পুত্র অভয়কালী অল্পায়ু ছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র কালীপ্রসন্নও অকালে মৃত্যুকবলিত হন। তৃতীয় পুত্র কেদারনাথ ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর উলার মাতামহ গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। কেদারনাথের পরে আনন্দচন্দ্রের হরিদাস ও গৌরীদাস নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করলেও তাদের অল্পবয়সেই মৃত্যু হয়। আনন্দচন্দ্রের সর্বশেষ সন্তান কন্যা হেমলতা, কিন্তু হেমলতাও দীর্ঘজীবী ছিলেন না, বালিকা বয়সে বিবাহের অল্পকাল পরেই তিনি মারা যান।

মাতামহ গৃহে স্থাপিত পাঠশালাতেই কেদারনাথের বিদ্যাশিক্ষার সূত্রপাত। রামায়ণ-মহাভারতের গল্প তিনি শৈশব থেকেই শুনতে ভালবাসতেন এবং বাল্যকাল থেকেই কবিতাদি রচনার চেষ্টা করতেন। নয়-দশ বৎসর বয়সে 'উলাচণ্ডী মাহাত্ম্য' নামে তিনি যে কাব্যটি রচনা করেন, তা পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই হারিয়ে যায়। এগার বৎসর বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। ঐ বয়সেই তিনি 'একটু চিন্তাশীল' হয়ে উঠেছিলেন। পুত্রের আয়ুবৃদ্ধি কামনায় বারো বৎসর বয়সেই কেদারনাথের বিবাহ দেওয়া হয় রাণাঘাটের মধুসূদন মিত্রের পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যা সয়ামনীর সঙ্গে। এই বৎসরে তাঁর পয়ারে রচিত 'হরিকথা' নামক একটি কাব্য এবং পর বৎসর 'শুম্ভনিশুম্ভ যুদ্ধ' নামক আর একটি কাব্য প্রকাশিত হয়। এই সময়ে নানা কারণে তাঁর মাতামহ ঈশ্বরচন্দ্রের সুবিশাল সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যায়। সেকালের বিখ্যাত ইংরাজি কাব্যলেখক কাশীপ্রসাদ ঘোষ (১৮০৯-৭৩) ছিলেন সম্পর্কে কেদারনাথের মেসো। বারো বছর বয়সে লেখাপড়ার জন্য কেদারনাথ কাশীপ্রসাদের সঙ্গে কলিকাতায় আসেন এবং হেদুয়া পুষ্করিণীর ধারে কাশীপ্রসাদের বাড়ীতে থেকে তিনি 'Hindu Charitable Institution'-এ ভর্তি হন। এই স্কুলে তিনি চার বৎসর পড়াশোনা করেন। এই বয়সেই কেদারনাথ ইংরেজিতে যা লিখতেন, সেগুলি কাশীপ্রসাদ সংশোধন করে দিয়ে তাঁর 'Hindu Intelligencer' পত্রিকায় প্রকাশ করতেন। বিখ্যাত কৃষ্ণদাস পাল ও শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও তখন ঐ পত্রিকায় লিখতেন। এই সময়ে কেদারনাথ প্রভৃতি পড়াশোনা করেন, কাশীপ্রসাদের মূল্যবান পাঠাগার ছাড়াও মেটকাফ্ হলে বেঙ্গল লাইব্রেরীতে তিনি নিয়মিত যেতেন। বিখ্যাত প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪—৮৩) ছিলেন তখন সেখানের লাইব্রেরীয়ান। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি জনৈক বন্ধুর সঙ্গে নৌকাযোগে উলাগ্রামে গমন করেন। তখন মহামারীরূপে আবির্ভূত জ্বররোগে সমগ্র বর্ধিষ্ণু উলাগ্রাম সম্পূর্ণ উৎসন্নে গিয়েছে। নৌকা থেকে ডাঙ্গায় নেমে কেদারনাথ কতকগুলি নেশাগ্রস্ত লোককে দেখতে পান যারা গ্রামের ভয়ঙ্কর অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্বিকার। এই জ্বরে তাঁর ভগ্নী হেমলতার মৃত্যু হয়। গ্রামে তিনি তিন দিন ছিলেন এবং সমস্ত গ্রাম ঘুরে দেখেন—কোন বাড়িতে পীড়িতের আর্তনাদ শুনলেন, কোন বাড়িতে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখলেন। যে উলায় একদা লোক গিজ্‌গিজ করতো,

তার পথে ঘাটে আর লোক দেখা যায় না। এই নিদারুণ অভিজ্ঞতা তাঁর কবিচেতনাকে বিশেষভাবে আন্দোলিত করেছিল এবং এই বেদনার স্মৃতিই কয়েক বছর পরে কেদারনাথের 'বিজন গ্রাম' কাব্যটিতে পরিব্যক্ত হয়েছে। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি যখন হিন্দু স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হন, তখন তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবগোপাল মিত্র, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি। কেশবচন্দ্র সেন তাঁর এক শ্রেণী উপরে পড়তেন, তবে কেশবের সঙ্গ তাঁর বিশেষ প্রীতি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে প্রথম প্রবেশিকা (Entrance) পরীক্ষা গৃহীত হয়। কলিকাতা টাউন হল ছিল পরীক্ষা কেন্দ্র। প্রথম দিন পরীক্ষা দিতে দিতেই কেদারনাথ এরূপ জ্বরগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে বাকি পরীক্ষা আর দিতে পারেন নি। নানা সভায় বক্তৃতা দেওয়ার ফলে কেদারনাথ এই সময়ে পাদরি ডল ও বিখ্যাত বক্তা জর্জ টমসনের নিকট সান্নিধ্য লাভ করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'ভারতবর্ষের এক বিস্তীর্ণ ইতিহাস রচনা' করতে শুরু করেন এবং আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ ও তক্ষশিলার রাজা পুরুর বীরত্ব নিয়ে ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে ইংরাজীতে 'Poriade or Adventures of Porus' নামক একটি কাব্য রচনা করেন। কাব্যটির প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ যথাক্রমে ১৮৫৭ ও ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পিতা গঙ্গাচরণ সরকার ও বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ আলেকজাণ্ডার ডাফ্ কাব্যটির প্রশংসা করেন। এই সময়ে কেদারনাথের খুব দুঃসময় চলছিল। তাঁর কথায় 'গৃহ শূন্য, অর্থ শূন্য, বল শূন্য, পরিবারের মধ্যে কেহ কোথায়, নিজে পীড়িত, বিদ্যাভ্যাসের শৃঙ্খলা হইল না, সকল দিকেই অন্ধকার।' এদিকে বন্ধুরা সকলেই কেদারকে 'বড়লোকের ছেলে' বলে জানে, আর 'আমি মনের দুঃখেই মরি। কাহাকেও কিছু বলি না, সভায় উপস্থিত হইলে স্বচ্ছন্দে অন্তঃকরণে বক্তৃতাদি করি ও শুনি। কেহই আমার মনের ভাব জানেন না।' (স্বলিখিত জীবনী, পৃঃ ৭৭-৭৮)। এই সময়ে তিনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট-সান্নিধ্য লাভ করেন এবং উভয়ে বহু গ্রন্থপাঠ ও আলোচনাদি করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথকে তিনিও 'বড়দাদা' বলতেন এবং উত্তর কালেও তাঁকেই 'একমাত্র হৃদয়বন্ধু' বলে স্বলিখিত জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। এই সময় কেদারনাথ কাণ্ট, হেগেল, সুইডেনবার্গ, সোপেনহাওয়ার, হিউম, ভলটেয়ার, ক্যুজো, থিওডোর পার্কার, নিউম্যান, চ্যানিং রামমোহন প্রভৃতির রচনাবলী এবং বাইবেল ও কোরাণ পাঠ করেন, দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে বহু বিষয় নিয়ে আলোচনা ও তর্কবিতর্ক করেন। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহের গোলমাল শুরু হলেও দেশভ্রমণের নেশায় তিনি বর্ধমানে গিয়ে মহারাজ মহাতাপচন্দ্রের আতিথ্যে কয়েকদিন অতিবাহিত করেন এবং 'Poriade' কাব্যের প্রথম ভাগ মহারাজকে উপহার দেন। এর কিছু পরেই তাঁর পিতামহীর মৃত্যু হয় এবং কেদারনাথের প্রকৃত জীবনসংগ্রাম শুরু হয়। তবে দুঃখের মধ্যেও বাগ্দেবীর সেবায় তিনি কখনও অবহেলা করেন নি, কাশীপ্রসাদের সাহচর্যে তিনি সমান নিষ্ঠার সঙ্গে ইংরেজি কবিতাদি রচনায় মগ্ন ছিলেন। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে Poriade কাব্যের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। এই বছর মাতামহের আহ্বানে উড়িষ্যার কটক জেলাস্থ 'ছুটি গ্রামে' তিনি সপরিবারে গমন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পত্রানুযায়ী এরপর কেদারনাথ ওড়িষ্যার কেন্দ্রপাড়ায় সদ্য-প্রতিষ্ঠিত ইংরাজি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাকর্ম লাভ করেন। কিছুদিন পরে Teachership পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কটক স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে হেডমাস্টার রূপে তিনি

ভদ্রক স্কুলে যোগদান করেন। এই সময়ে তিনি উড়িষ্যার মঠ (Maths of Orissa) নামক ইংরাজি গ্রন্থটি রচনা করেন। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে তাঁর প্রথম পুত্র অন্নদাপ্রসাদের জন্ম হয়। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি মেদিনীপুর স্কুলে যোগদান করেন। ঐ স্কুলের তখন প্রধান-শিক্ষক ছিলেন বিখ্যাত রাজনারায়ণ বসু। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে দশমাসের পুত্রকে রেখে তাঁর পত্নী পরলোকগমন করেন। ঘটনাটি তাঁর গভীরতর সত্তায় যে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় দুবছর পরে রচিত 'বিজন গ্রাম' কাব্যের দ্বিতীয় অংশ 'প্রসূতি বিয়োগে তস্যাঃ সুতঃ" রচনাটি থেকে। কিছুদিন পরে তিনি যকপুরের মিত্র পরিবারের কন্যা ভগবতী দেবীকে বিবাহ করেন। অতঃপর তিনি প্রথমে বর্ধমানের নাজির রূপে কিছুকাল কাজ করার পর সেখানের কালেক্টরীর 'সেকেণ্ড ক্লার্কে'র পদ লাভ করেন। বর্ধমানে অবস্থিতি কালেই ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে তিনি প্রথমে 'বিজনগ্রাম' ও কিছুদিন পরে 'সন্ন্যাসী' নামক কাব্যদুটি রচনা করেন। তাছাড়া 'our wants' নামক ইংরাজিতে একটি গদ্যগ্রন্থও এই সময়ে রচিত হয়। এখানে হিন্দু ও ব্রাহ্মদের পারস্পরিক রেষারেষিতে তাঁকে মধ্যস্থতা করতে হয়েছিল। বর্ধমান থেকে তিনি চুয়াডাঙ্গা গিয়ে সেখানের কোর্টে হেডক্লার্কের পদে যোগদান করেন। সেখান থেকে ছাপরার 'Deputy Registrar' হয়ে তিনি ছাপরা চলে যান এবং সেখানে জনৈক মুনশীর কাছে উর্দু ও ফার্সীভাষা শেখেন। এই সময়ে তিনি উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর ছাপরা থেকে তাঁকে প্রথমে পূর্ণিয়ায় পাঠান হয় এবং কিছুদিন পরে তাঁকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রূপে দিনাজপুরে বদলি করা হয়। দিনাজপুরে থাকাকালেই কৃষ্ণতত্ত্বে তাঁর প্রকৃত অনুপ্রবেশ ঘটে—এখানে তিনি কমললোচন রায় নামক একজন প্রকৃত বৈষ্ণবের সংস্পর্শে আসেন এবং অন্তরের তাগিদে বৈষ্ণবধর্ম জানবার জন্যে তিনি চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত, ভক্তমাল প্রভৃতি গ্রন্থ নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করেন এবং 'Bhagabat speech' নামক একটি বক্তৃতা করেন (এটিও পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়)। এই সময়ে তাঁর মধ্যে বৈষ্ণবীয় ধর্মভাব প্রবলভাবে প্রকাশ পায় এবং (অন্তরের তাগিদে) তিন মাসের ছুটি নিয়ে তিনি শ্রীচৈতন্য ও রূপ সনাতন পদাঙ্কিত তীর্থ গৌড় (মালদহ), রাজমহল প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন।

এরপর চাকুরীসূত্রে তাঁকে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন স্থানে বদলি হয়ে যেতে হয়—দিনাজপুর থেকে চম্পকারণ্য হয়ে পুরীতে এলে তাঁর ভক্তিভাব পুরীর অনুকূল আবহাওয়ায় সম্যক্‌রূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এখানে একদিকে বৈষ্ণব মহাজনদের সঙ্গে আলোচনা ও অন্যদিকে বিবিধ বৈষ্ণব গ্রন্থপাঠের ফলে তাঁর 'ভক্তিবৃত্তি অনেক উন্নতিলাভ' করে। পুরী থেকে আরারিয়া সেখান থেকে মহিষরেখা হয়ে ভদ্রক, ভদ্রক থেকে নড়াইল, নড়াইলে তিনি 'সপরিবারে দীক্ষিত' হন এবং 'কল্যাণ কল্পতরু' ও 'কৃষ্ণসংহিতা' গ্রন্থ দুটি প্রকাশ করেন। পুরীতে অবস্থিতি কালে ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে তাঁর কমলাপ্রসাদ ও ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে বিমলাপ্রসাদ নামক পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। এই বিমলাপ্রসাদই পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সমাজে প্রভুপাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী নামে বিখ্যাত হন। ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে কেদারনাথ মানিকতলা অঞ্চলে একটি বাড়ি ক্রয় করেন এবং তিনমাসের ছুটিতে প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা, কাশী ইত্যাদি স্থান ভ্রমণ করেন। অতঃপর তিনি যশোহর থেকে বারাসত ও পরে শ্রীরামপুরে বদলি হন। নড়াইলে থাকার সময়, ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে 'সজ্জন তোষণী নামে যে পত্রিকাটি তিনি প্রকাশ করেছিলেন,

তা বেশিদিন চলে নি। এখন সেটি পুনরায় কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করে। এই সময়ে তাঁর 'চৈতন্য শিক্ষামৃত' 'শিক্ষাষ্টক' প্রভৃতি' গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁর 'ভক্তিগ্রন্থাদি ও কার্য দেখিয়া শ্রীপাদআচার্যকুল আমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে 'ভক্তিবিনোদ' উপাধি ছিলেন। এই সময়ে নির্জন সাধন ভজনের জন্য কেদারনাথ বিশেষ উৎসুক হয়ে পড়েন এবং সংস্কৃতে 'আম্নায় সূত্র' গ্রন্থটি রচনা করেন। এরপর তিনি চেষ্টা করে শ্রীরামপুর থেকে কৃষ্ণনগরে বদলি হন (১৮৮৭ খ্রীঃ)। কৃষ্ণনগর থেকে প্রতি শনিবার তিনি নবদ্বীপধামে যেতেন এবং মহাপ্রভুর সঠিক জন্মস্থান আবিষ্কারের প্রতি সচেষ্ট হন। নরহরি ঠাকুরের পরিক্রমা পদ্ধতি ভক্তি রত্নাকর ও চৈতন্যভাগবতে যে সমস্ত গ্রাম পল্লীর উল্লেখ আছে তার সঙ্গে লক্ষণ মিলিয়ে গঙ্গার উত্তর দিকে বল্লালদীঘির কাছের একটি স্থানকে তিনি মহাপ্রভুর জন্মভিটা বলে প্রমাণ করলেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত 'শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য' নামে একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হল, এই স্থানটিকেই 'মায়াপুর' বলা হয়। এরপর তিনি প্রথমে নেত্রকোণায় ও পরে টাঙ্গাইলে বদলি হন। তারপর বর্ধমান, রাণীগঞ্জ, দিনাজপুর, প্রভৃতি স্থানে ক্রমান্বয়ে বদলি হন। অতঃপর কিছুদিন ছুটি ভোগ করে সাসারামে বদলি হন ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে। এই সময়ে বঙ্গেশ্বর ইলিয়টের গোহত্যা নিবারণ বিষয়ক সার্কুলারকে উপলক্ষ করে হিন্দুমুসলমানদের মধ্যে প্রবল দাঙ্গা চলছিল সাসারামে। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্বের সংপ্রীতি ফিরিয়ে আনার জন্য কেদারনাথ বিশেষ চেষ্টা করেন। সেখান থেকে তিনি কিছুদিন বাদে নদীয়ায় বদলি হয়ে এলেন। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের ২১শে মার্চ মহাসমারোহে মায়াপুরে 'গৌড় বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীমূর্তি' স্থাপিত হয়। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর কেদারনাথ দত্ত সরকারী কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মানিক্য বাহাদুরের আমন্ত্রণে পুত্র বিমলাপ্রসাদ (ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী)-কে নিয়ে আগরতলায় গমন করেন এবং পণ্ডিতদের সহায়তায় ত্রিপুরার রাজগণের ইতিহাস 'রাজরত্নাকর' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে নবদ্বীপে তাঁর স্বানন্দ সুখদকুঞ্জের গৃহটি নির্মিত হয়। জীবনের শেষদিকে তিনি উৎসাহের সঙ্গে গৌরবাণী প্রচার ও বিভিন্ন ব্যক্তিকে দীক্ষা দান করেন। ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে জুন তিনি কলিকাতায় পরলোকগমন করেন।

কেদারনাথ বাংলা ছাড়া সংস্কৃত, ইংরাজি, উর্দু, ফার্সী, ওড়িয়া, হিন্দী প্রভৃতি ভাষা জানতেন এবং বিভিন্ন ভাষায় রচিত তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা আশির অধিক।[১] কিন্তু তাঁর নিছক সৃষ্টিমূলক-সাহিত্যের সংখ্যা চারটি—ইংরেজি কাব্য, 'পোরিয়েড্'ও বাংলাকাব্য 'নলিনীকান্ত' 'বিজনগ্রাম' ও 'সন্ন্যাসী'।

এখন 'বিজনগ্রাম' কাব্যটি সম্পর্কে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। কেদারনাথের জীবনেতিহাস থেকে দেখা যায় যে ছয় সাত বৎসর বয়স থেকেই তিনি কবিতাদি রচনার চেষ্টা শুরু করেন এবং দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে 'উলাচণ্ডী মাহাত্ম্য' নামে যে কাব্যটি তিনি রচনা করেছিলেন, তা পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই হারিয়ে গেছে বলে তিনি স্বয়ং

১. শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ রচিত 'ছাত্রদের শ্রীভক্তি বিনোদ' (ভক্তিবিনোদ শতবর্ষপূর্ত্যাবিভাবোৎসব গ্রন্থমালা—৪') গ্রন্থের শেষে কেদারনাথের রচিত গ্রন্থাদির যে তালিকা আছে, তা অসম্পূর্ণ।

তাঁর আত্মজীবনীতেই উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ৪৯)। বার তের বছর বয়সে বাঙ্গলা পয়ারে রচিত 'হরিকথা' এবং 'শুম্ভনিশুম্ভ যুদ্ধ' কাব্যদুটি আমি দেখতে পাই নি। সম্ভবত পৌরাণিক কাহিনী আশ্রিত বালক কবির এই অপরিণত রচনাদুটির মধ্যে কেদারনাথের কবি প্রতিভার উন্মেষ লক্ষ্য করা যেতে পারতো। তবে কাব্যদুটির নামকরণ যে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিতবহ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ যে প্রবল বৈষ্ণব ভক্তি তাঁর পরবর্তীজীবনে, তাঁর চিন্তা, রচনা ও কার্যকলাপে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তার বীজ সম্ভবতঃ এখানেই পাওয়া যাবে। বিশেষতঃ প্রথম যৌবনে খ্রীস্টধর্ম ও ব্রাহ্মধর্মান্দোলনের প্রবল আকর্ষণের মধ্যে থেকেও তিনি যে সনাতন হিন্দুধর্মের বিশ্বাসভূমিতে বলিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছিলেন, সেই শক্তির উৎস খুঁজতে গেলেও সম্ভবতঃ প্রাথমিক রচনাগুলিকে একেবারে অগ্রাহ্য করা যাবে না। যাই হোক, দ্বিতীয় পর্বের কেদারনাথ দত্ত, যিনি 'শ্রীল শ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ' নামে আবির্ভূত, আমার বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রে সেই রূপান্তরিত কেদারনাথ একান্ত প্রয়োজনীয় নন বলে সে প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপিত করছি না। প্রথম পর্বের কবি কেদারনাথের তৃতীয় প্রকাশিত ইংরেজীতে লিখিত কাব্য Poriade'-কে অবলম্বন করেই আমি অতঃপর অগ্রসর হচ্ছি।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশীয় উচ্চাঙ্গের সাহিত্যাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে কেদারনাথ অত্যল্প বয়সেই সাহিত্যবুদ্ধি ও প্রগাঢ় রসবোধের অধিকারী হয়েছিলেন। পাণ্ডিত্য, কল্পনাশক্তি ও রসবোধের এক দুর্লভ সম্মিলন তাঁর মধ্যে ঘটেছিল।

১২৬৬ বঙ্গাব্দে 'নলিনীকান্ত' নামে কেদারনাথের যে কাব্যটি প্রকাশিত হয়, তার ভূমিকা স্বরূপ আভাষ অংশে কেদারনাথ জানিয়েছেন, '১২৬৩ সালে আমি ভারতবর্ষের এক বিস্তীর্ণ ইতিহাস রচনারম্ভ করি।' ১২৬৩ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে কেদারনাথের বয়স সতের আঠার বৎসর। ভারতবর্ষের পক্ষে গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ একটি স্মরণীয় ঘটনা। বালক কেদারনাথের ঐতিহাসিক বোধবুদ্ধি বা বিবেক ঐ বয়সেই যে কত পরিপক্ক হয়ে গিয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত ইংরেজি কাব্য 'Poriade or Adventures of Porus' কাব্যটির প্রথমাংশের প্রকাশ থেকে। ভারতবর্ষের বিস্তৃত ইতিহাস রচনা সূত্রে ঐতিহাসিক যুগারম্ভের একটি প্রধান 'মাইলস্টোন' হিসাবে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ ঘটনাটির গুরুত্ব তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর কল্পনাপ্রবণ কবিচিত্ত নীরস ঐতিহাসিক তথ্যের মধ্যেই কেবলমাত্র আবদ্ধ থাকতে পারে নি। তক্ষশিলার রাজা পুরুর শৌর্যবীর্য তুলনামূলকভাবে তাঁর সৃজন-প্রতিভাকে অধিকতর মাত্রায় আকৃষ্ট করেছিল। তবে বয়সের অল্পতা হেতুও বটে, আবার রোমান্টিক কবিকল্পনার কারণেও বটে, একপ্রকার বীর পূজার মনোভাব নিয়ে কাব্যটিতে তিনি পুরুর অসীম বীরত্ব কথাকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। এর পিছনে অবশ্য তাঁর দেশপ্রেমও কাজ করছে।

১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে 'ভারতবর্ষের এক বিস্তীর্ণ ইতিহাস রচনা' সূত্রে 'Poriade' কাব্যটি ছাড়া আরো যে একটি কাব্যের কল্পনা কেদারনাথের কবি চেতনায় প্রতিফলিত হয়েছিল, সে কথাও 'নলিনীকান্ত' নামক কাব্যটির 'আভাষ' অংশ থেকে জানা যায়। কিছুকাল ওই ইতিহাস রচনার দুষ্কর ব্যাপারে' জড়িত থাকার সময়ে ফরাসী সাহিত্য হইতে ইংরেজীতে অনুবাদিত ফিলাজাফার ও আকট্রেশেশ (Philosopher and Actresses) নামক বিবিধ উপাখ্যানে সংঘোটিত গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগস্থ প্রসিদ্ধ চিত্রকর করিলিনিয়স স্কটের

(Cornelineus Scott) মনোরমা উপাখ্যান পড়িতেছিলাম, পড়িতে পড়িতে আমার মন এরূপ অলৌকিক রূপে উৎসাহিত হইল, যে আমি তৎক্ষণাৎ এই উপাখ্যান (অর্থাৎ 'নলিনীকান্ত') রচনারম্ভ করিলাম'। 'আভাষ' অংশটি থেকে আরো যে একটি সংবাদ পাওয়া যায়, তা হল এই যে, 'নলিনীকান্ত' কাব্যটি ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হলেও তা অনেক আগেই রচিত হয়েছিল, 'সাংসারিক নানা দুর্ঘটনায় পতিত হইয়া, তথা অসীম কায়িক ও মানসিক শ্রমে পরতন্ত্র হইয়া, আমি গ্রন্থখানি ত্বরায় প্রকাশ করিতে পারি নাই।' পনেরটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এই কাব্যটি সম্বন্ধে কেদারনাথ 'আভাষ' অংশে দাবী করেছেন যে এরূপ 'উপাখ্যান অস্মদ্দেশে বিরল'। কাব্যটির প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি জানিয়েছেন 'ইহা নাটকভাবে রচিত, কাব্যভাবে বর্ণিত এবং উপাখ্যানাশ্রিত।' বস্তুতঃ এই কাব্যটিতে কেদারনাথ যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন—গল্পটির মধ্যে প্রয়োজনানুরূপ হাস্য, অদ্ভূত ও শৃঙ্গার রসের ব্যবহার থাকলেও করুণ রসই প্রধান হয়ে উঠেছে। এখানে কেদারনাথ নাট্যকারোচিত প্রক্রিয়ায় 'চরিত্রের অগ্রিম পরিচয়' না দিয়ে চরিত্রগুলি যেভাবে 'অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার নিষ্পন্ন করিতেছে,' অথচ তদ্বারা চরিত্রগুলি গড়ে উঠছে, তা দেখবার চেষ্টা করেছেন। তবে তিনি দাবী করেছেন যে কাব্যটির 'শব্দবিন্যাস, বিশেষতঃ ছন্দবিন্যাস অধিকাংশ অভিনব'। এবং একথাও বলেছেন, 'পাঠকেরা উত্তরোত্তর সন্দিহান হইয়া গ্রন্থ সমাপ্ত না করিয়া স্পৃহা শান্ত করিতে পারিবেন না'। এই জন্য পাঠকবর্গের কাছে অনুরোধ করেছেন, 'দেশীয় ভাষায় প্রথম ও প্রকৃত উপাখ্যানটি পাঠ করিয়া বাধিত করুন'।

কাব্যটি পাঠ করলে ঐ বয়সেই কেদারনাথের মৌলিক কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে আমরা অবহিত হই। বাংলা কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে রঙ্গলাল বা মধুসূদন যখন আবির্ভূতই হন নি, সেই সময়ে ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে আঠার বৎসর বয়সেই বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব সাধনের জন্য কেদারনাথ যে পরিমাণ সচেতন ও সচেষ্ট হয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে একটি সংবাদ। এমন কি কাব্যটির রচনার সাল (১৮৫৬ খ্রীঃ) যদি ছেড়েও দেয়া যায়, তাহলেও রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রকাশের পরের বৎসরেই এবং মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে, ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে 'নলিনীকান্তে'র প্রকাশও কম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়।

১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমান থেকে প্রকাশিত কেদারনাথ দত্তের 'বিজন গ্রাম' কাব্যটি দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশের নাম 'বিজন গ্রাম' ও দ্বিতীয় অংশের নাম 'প্রসূতি বিয়োগে তস্যাঃ সুতঃ'। প্রথম অংশের নামেই কাব্যটির নামকরণ করা হয়েছে। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে কাব্যটির যে 'দ্বিতীয় সংশোধিত সংস্করণ' প্রকাশিত হয়, তাতেও 'বিজনগ্রাম নামটি-ই বহাল আছে। কাব্যটির এরূপ নামকরণের পিছনে একটি কারণ আছে। কেদারনাথ যে খুব অল্প বয়স থেকেই ইংরেজি সাহিত্যে বিশেষরূপে নিষ্ণাত হয়েছিলেন, এবং এই বিষয়ে তিনি যে কাশীপ্রসাদ ঘোষ দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তা পূর্বেই দেখেছি। আলোচ্য কাব্যটি রচনাকালে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর মনে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ইংরেজ কবি Oliver Goldsmith (১৭২৮-১৭৭৪)-এর 'The Deserted Village' কাব্যটি প্রভাব বিস্তার করেছিল। কেদারনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন যে বর্ধমানে 'কালেকটরী কেরানী থাকার সময়ে আমি প্রথমে বিজনগ্রাম পদ্য লিখি, পর সন্ন্যাসী পদ্য রচনা করি (পৃঃ ১০৯)। কেদারনাথ বর্ধমানে ১৮৬১ থেকে ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ছিলেন। এই সময়কালের মধ্যে ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে কালেকটর হগ্ সাহেবের

অধীনে তিনি 'সেকেণ্ড ক্লার্ক' রূপে কার্যভার গ্রহণ করেন (স্বলিখিত জীবনী, পৃঃ ১০৮)। এ থেকে মনে হয় কাব্য দুটি ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের প্রথম ভাগেই রচিত হয়েছিল। অর্থাৎ, 'সন্ন্যাসী' স্বতন্ত্র কাব্য হিসাবে ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হলেও দুটি কাব্য যে প্রায় একই সময়ে জন্মলাভ করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 'সন্ন্যাসী' কাব্যটিরও নামকরণ করা হয়েছে Goldsmith-এর অপর বিখ্যাত কাব্য 'The Traveller'-এর অনুকরণে। আসলে গোল্ডস্মিথের সঙ্গে কেদারনাথের কিছু কিছু আপাত সাদৃশ্য আছে। গোল্ডস্মিথ যেমন যাযাবর ছিলেন কেদারনাথও কিছু পরিমাণে ভবঘুরে ছিলেন, সরকারী কর্মসূত্রে তাঁকে বহুস্থানে বদলি হতে হয়েছে। এছাড়া তিনি নিজেও ভারতের বহুস্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। গোল্ডস্মিথ যেমন তাঁর কাব্যে ছেড়ে আসা গ্রামের জন্য ব্যাকুলতা প্রদর্শন করেছেন, 'বিজনগ্রাম' কাব্যের প্রথমাংশে জন্মগ্রাম উলার জন্য অনুরূপ ব্যাকুলতা কেদারনাথের মধ্যেও দেখা যায়। তাছাড়া পরিত্যক্ত গ্রামটির উপর শিল্পবিপ্লবের দানব তার নোংরা হাত বাড়িয়ে গ্রামটির শ্রী-সৌন্দর্য বিনষ্ট করায় গোল্ডস্মিথ তাঁর কাব্যে যে মনোবেদনা প্রকাশ করেছেন, মহামারী রূপ জ্বরের প্রকোপে বর্ধিষ্ণু উলার রিক্ত হতশ্রী রূপও কেদারনাথের নিদারুণ মর্মবেদনার কারণ হয়েছে। শোকই কাব্যটির স্থায়ী রস বলে কাব্যটির নামের তলায় Sub title হিসাবে উৎকীর্ণ করে দেওয়া হয়েছে 'শোক সূচক পদ্য'।

কাব্যটির দ্বিতীয় অংশ 'প্রসূতি বিয়োগে তস্যাঃ স্বতঃ সম্পূর্ণ মৌলিক সৃষ্টি, এখানে স্বদেশ বা বিদেশের কোন কবিরই কোন প্রভাব বা অনুপ্রেরণা অনুভব করা তো যায়ই না, বরং বলা যায় বাংলা শোককাব্য ধারায় এটি একটি নূতন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছে। আমরা দেখেছি যে ইংরেজি প্রধান শোককাব্য চারটির উৎসমূলে কবিদের বন্ধু বিয়োগ-বেদনাই ক্রিয়াশীল ছিল। সেই আদর্শে বাংলার প্রথম শোককাব্য 'চিন্তাতরঙ্গিনী' এবং দ্বিতীয় শোককাব্যরূপে এতাবতকাল পরিচিত 'বন্ধুবিয়োগ' (অবশ্য চারিজন বন্ধু ছাড়া পত্নীবিয়োগ বেদনা এ কাব্যটির পশ্চাতে ছিল, সেদিক থেকে নামকরণটি যেন পাশ্চাত্য কাব্য-সাহিত্য প্রিয়তার আত্যন্তিক ব্যগ্রতাই প্রমাণ করে), এই দুয়ের মধ্যে কেদারনাথের কাব্যটি সম্পূর্ণ অভিনব শোককাব্যরূপে অবস্থান করছে। মাতার মৃত্যুতে পুত্রের মর্মবেদনা হল এই অংশের মূলে প্রতিপাদ্য। অংশ দুইটির মধ্যে আপাতভাবে কোন সংযোগ সূত্র আছে বলে মনে হয় না। তবে কেদারনাথ বিসদৃশ দুটি অংশকে একটি সাধারণ নাম 'বিজনগ্রাম' দিয়ে কাব্যটিকে প্রকাশ করলেন কেন? এমন কি ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে কাব্যটির যখন 'দ্বিতীয় সংশোধিত সংস্করণ' প্রকাশিত হয়, এখনও দুটি অংশ নিয়ে কাব্যটি 'বিজনগ্রাম' নামেই প্রকাশিত হয়। বিষয়টি নিয়ে পরে আলোচনা করছি।

'টাইটেল পেজ' সমেত দুই অংশের সমগ্র কাব্যটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা হোল ৫৮, এবং তার টাইটেল পেজটি হোল এই :

"বিজন গ্রাম।
শোক সূচক পদ্য।
শ্রীকেদারনাথ দত্ত প্রণীত।
কলিকাতা, ডি'রোজারিও কোম্পানীর যন্ত্রালয়ে মুদ্রিতঃ।
খৃষ্টাব্দ সন ১৮৬৩।
ছয় পয়সা মাত্র। বর্ধমান মোকামে গ্রন্থকর্তার নিকট পত্র লিখিলে পাইবেন।"

তৃতীয় পৃষ্ঠায় 'উপহার' নামক ষোল পংক্তির কবিতাটির ক্ষেত্রে 'কে. না. দ.' কবির

নামের এই আদ্য অক্ষর তিনটি মুদ্রিত আছে। কাব্যটি তিনি 'উপহার' দিয়েছেন তাঁর 'প্রিয়সুত প্রাণের সমান'কে। চতুর্থ পৃষ্ঠাটি সাদা (blank)। পঞ্চম ও ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় 'কে. না, দ.' এই সাক্ষরে ভূমিকা অংশটি মুদ্রিত হয়েছে। ভূমিকাটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে এখানে তা সম্পূর্ণই উৎকলিত হোল।

"এক নূতন প্রণালীতে এই ক্ষুদ্র কবিতাটি রচিত হইল। ইহা পাঠ করিয়া সহসা অনেকেই আশ্চর্য্য হইতে পারেন ও কেহ ২ কুৎসিত পদ্য বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারেন। তজ্জন্য এই প্রণালী সম্বন্ধে দুই একটি কথা লিখিত হইল। বঙ্গভাষায় কবিকঙ্কণ প্রথমে পদ্য রচনা করেন। পাঠকগণ তাঁহার চণ্ডী পুস্তক পাঠ করিলেই ইংলণ্ডীয় চশর নামক কবির অসম্পূর্ণ কবিতা অবশ্যই স্মরণ করিবেন। কবি কঙ্কণের পয়ারে দ্বিতীয় চরণে কবিতার ভাব শেষ হয়। যাঁহারা তাঁহার পর কবিতা লিখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ঐ প্রণালী অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ ভারতচন্দ্রও ঐ শ্রেণীর কবি ছিলেন। ভারতকে আমরা নির্ভয়ে ইংলণ্ডীয় পোপ নামক কবির সহিত তুলনা করিতে পারি। ভারত ও পোপ উভয়েই পয়ার কবি ও উভয়েই আপন ২ ভাষায় পদ্য লিখিবার নিয়মাধীনে উত্তম ২ কবিতা রচনা করিয়াছেন। পৃথিবীস্থ সমস্ত বিষয়ই ক্রমে ২ উন্নতি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। দুই চরণের মধ্যে কবিতার ভাব প্রকাশ করার প্রথা অসম্পূর্ণ বোধ হওয়ায় ইংলণ্ড দেশে বাইরণ নামক মহাকবি উক্ত প্রণালী একেবারে ভঙ্গ করেন। ঐ দেশস্থ সমস্ত লোকেই তখন পূর্ব প্রথা অনুপযুক্ত বিশ্বাস করিলেন। বঙ্গভাষায় ঐ প্রথাটি এই পুস্তকে ভঙ্গ করা গিয়াছে। প্রথমেই এই নূতন প্রণালীটি সকলকে ভাল লাগিবেক না, কিন্তু যখন প্রচলিত সংস্কার হইতে পাঠকগণের কর্ণ বিমুক্ত হইবেক তখন ইহার লালিত্য একেবারে বোধ হইবে, সন্দেহ নাই। পাঠকগণ ইহা মনে না করুন যে এই পুস্তকখানি কবিতা রসে অতিশয় উৎকৃষ্ট বলিয়া আমার বিশ্বাস আছে। তাহা নহে। এই নূতন ছন্দে যদি উত্তম ২ কবিগণ বঙ্গ ভাষায় পদ লিখিতে চেষ্টা করেন তবে আমাদিগের মাতৃভাষায় একপ্রকার নূতন কবিতার সৃষ্টি হইবেক। মহাকবি মধুসূদন দত্ত যে সকল পদ্য লিখিয়াছেন সে সমস্তই অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত হইয়াছে। ঐ ছন্দের লালিত্যের সহিত কবিতা রচনা করা সাধারণ শক্তির কার্য্য নহে। অতএব এই নূতন পয়ার ছন্দে কবি সকলের পদ্য লিখিতে চেষ্টা করা আবশ্যক।

এই গ্রন্থপাঠকালীন অষ্টম অক্ষরে ও চরণের শেষে বিশ্রাম না করিয়া পাঠক মহাশয়েরা স্থানে স্থানে ছেদসকল বিবেচনা করিলেই কবিতার ভাব ও পদ্যের রসবোধ করিতে পারিবেন। কে, না, দ।"

ভূমিকার একটি তথ্যগত ভুল ('বঙ্গভাষায় কবিকঙ্কণ প্রথমে পদ্য রচনা করেন') আছে, তবে এটি যে ভুল তা ১৮৬২-৬৩ খ্রীস্টাব্দে কেদারনাথের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। এমন কি দশ বৎসর পরেও রামগতি ন্যায়রত্ন যখন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব'টি লিখছেন, তখন তিনি মুকুন্দরাম থেকে আর একটু পিছিয়ে গিয়ে বিদ্যাপতি থেকেই বাংলা কাব্য সাহিত্যের সূত্রপাত ধরেছেন। সুতরাং কেদারনাথের ভূমিকাংশের এই ত্রুটিটুকু বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যের তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে তিনি যে কতদূর চিন্তা করেছেন এবং তদ্বিষয়ে যে গুরুতর মন্তব্য করেছেন তা আমাদের চমকিত করে। পূর্ববর্তী 'নলিনীকান্ত' কাব্যরচনার কাল থেকে বাংলা কাব্য সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতির জন্য কেদারনাথ যে চিন্তা করেছেন তা আমি পূর্বেই দেখিয়েছি। তখনও বাংলা কাব্যসাহিত্যে গুপ্তকবির আদর্শ প্রবলভাবে আধিপত্য

করেছিল এবং মধুসূদন বা রঙ্গলালের অস্পষ্ট পদধ্বনি পর্যন্ত তখনও শোনা যায় নি। 'নলিনীকান্ত' কাব্যটিতে তিনি যে কেবলমাত্র সমসাময়িক যুগ তথা যুগের যন্ত্রণাকে স্বীকার করে নিয়েছেন তাই নয়, বাংলা কাব্যসাহিত্যে নূতন প্রাণবন্যা আনতে হলে তার ভাষা ও ছন্দের সংস্কারসাধন যে একান্ত প্রয়োজন এটা অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন। এরপর যুগন্ধর মধুসূদন যখন পয়ারের যান্ত্রিকতা থেকে বাংলা কাব্যকে মুক্ত করে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রচলন করেছেন, তখন মধুসূদনের সেই কৃতিত্বকে সাদরে স্বীকৃতি জানিয়ে কেদারনাথ মধুসূদনকে 'মহাকবি'রূপে 'বিজনগ্রামে'র ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি সময়োচিত সাবধানবাণীও উচ্চারণ করেছেন, 'ঐ ছন্দে লালিত্যের সহিত কবিতা রচনা করা সাধারণ শক্তির কার্য্য নহে'। কেদারনাথের রসবোধ যে ঐ বয়সেই কত পরিণত ও অভ্রান্ত তার প্রমাণ আমরা কয়েক বৎসরের মধ্যেই পাই, যখন হেমচন্দ্র 'বৃত্রসংহার' কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করতে গিয়ে মিলহীন পয়ার ব্যবহার করলেন। সেদিক থেকে 'বিজনগ্রাম' কাব্যে কেদারনাথ যে 'নূতন ছন্দ' ব্যবহার করলেন, যাকে 'ভূমিকা'য় তিনি 'নূতন পয়ার ছন্দ' বলে উল্লেখ করেছেন, তার সম্ভাবনা যে অনেক এটি তিনি ভূমিকাতেই ইঙ্গিত করে গেছেন। বস্তুতঃ তাঁর এই 'প্রবহমান পয়ার' পরবর্তী শক্তিমান্ কবিদের হাতে অনেক স্বর্ণফসল ফলিয়ে তুলতে সহায়তা করেছে।

'বিজনগ্রাম' কাব্যটির প্রথম অংশের ছত্রসংখ্যা হোল ৪৫০। 'প্রসূতি বিয়োগে তস্যাঃ সুতঃ' নামক দ্বিতীয় অংশটি তিনটি 'সর্গে' বিন্যস্ত এবং সর্গ তিনটির ছত্রসংখ্যা হোল যথাক্রমে ৩৫৪, ৩৭৮ ও ৩৩২, অর্থাৎ মোট ছত্রসংখ্যা হোল ১০৬৪। সুতরাং দুই অংশের মোট ছত্রসংখ্যা হোল ১৫১৪।

কাব্যটির সূত্রপাত হয়েছে এইভাবে ঃ

'সুমধুর ধ্বনি কিবা পশিলা শ্রবণে !
শুনিয়া সে গ্রাম নাম আজি, আহা !—মনে,
আনন্দলহরী প্রবাহিলা মন্দগতি,
উত্তপ্ত বালুকোপরি যেন স্রোতস্বতী
মলয়া পবনে বহে। সুখ পুরি, হায় !
শুনিয়া তোমার নাম অন্তর জুড়ায় !
কতদিন পরে শুনি সে স্থানের নাম,
যথায় জীবন মম আসি নরধাম
প্রবেশিয়া কলেবরে—মম আঁখিদ্বয়
জগতের চক্ষুসহ করিলা প্রণয়
অগ্রে। হায় ! অকস্মাৎ শুনিয়া সে স্বর
মধুমাখা, শিহরিলা আমার অন্তর !'

অতঃপর দেশের দুর্দশার কারণ কি তা জানবার জন্য কবি বাগ্দেবীকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

"কহ, ওগো, বাক্যদেবী, কিরূপে এদেশ
হারাইলা সুখ সব ? অসুখ অশেষ
এবে বিস্তারিয়া পক্ষ, অতি ভয়ঙ্কর,

কি কারণে আচ্ছাদিলা সুখ দিনকর ?
দুঃখের কাহিনী সব করহ বর্ণন,"

অংশটিতে মধুসূদনের প্রভাব স্পষ্টভাবেই অনুভূত হয়—বৎসর দুই পূর্বে প্রকাশিত 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের প্রারম্ভে মধুসূদন যেভাবে কল্পনা-দেবীকে আবাহন করেছেন, এখানে তার অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়।

কাব্যের প্রারম্ভে কেদারনাথ পাদটীকায় তাঁর জন্মগ্রামের নাম উল্লেখ করেছেন, 'নবদ্বীপ জেলার অন্তর্গত উলা নামক গ্রাম' কেদারনাথের 'স্বলিখিত জীবনী' থেকে আমরা দেখছি যে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজু বসু নামক বন্ধুর সঙ্গে কেদারনাথ নৌকাযোগে কলিকাতা থেকে উলা গ্রামে গিয়েছিলেন—বর্ধিষ্ণু গ্রামটি তখন মহামারী আকারে আবির্ভূত জ্বরের প্রকোপে সম্পূর্ণ উৎসন্নে গিয়েছে, গ্রামের সেই রিক্ত হতশ্রী কেদারনাথের কল্পনাপ্রবণ কবি-চিত্তকে যে কত প্রবলভাবে আহত করেছিল, তা উক্ত ঘটনার প্রায় আট বৎসর পরে রচিত এই কাব্যটি থেকেই আমরা জানতে পারি। গ্রামের দুর্দশা দেখে কবি অতঃপর লিখেছেন,

"কতদিন পরে আজ দেখিলাম মুখ
তব, শোকের তিমিরে ঢাকা,—দেখে, দুখ
নদী উছলি বহিলা, যুগল নয়ন
দ্বারে, বক্ষ ভাসি ভূমে, হইলা পতন।"

তখন কবির 'অন্তরে পুনঃ বাল্যভাব যত' 'সমুদয় উদিলা এখন'। "শৈশব সময়ে, যে সুখসকল করিয়াছি ভোগ আমি'-তা স্মরণ করলেন। সেই সময়ে 'সহোদরগণ'-এর সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে 'খেলিতে উদ্যান ধামে' যেতেন। দ্বিপ্রহরে যখন 'দিনমণি প্রখর মস্তকোপরে' উঠত, তখন 'ভোজন' করবার জন্য 'জননী কত ডাকিতেন সবে' সে কথা মনে পড়লো। পাঠশালায় গুরুর কাছে 'শিখিতে যাইয়া পড়িয়া সঙ্কটে

ভাবিতাম সেই কালে, কতদিন পর
উদ্ধার হইব আমি বিপদ সাগর'

সে কথাও তাঁর মনে পড়ল। সেই সঙ্গে গ্রামের সেই অতীতকালের দিনগুলির কথা কবি স্মরণ করেছেন, যখন গ্রামে 'অভাবের জ্বালা' ছিল না, সকলেই 'সদা আনন্দে উতলা' থাকত—পাছে অতিথি অভুক্ত অবস্থায় ফিরে যায়, এজন্য গৃহস্থরা নানাবিধ সামগ্রী 'প্রতি ঘরে ঘরে' আয়োজন করে রাখতেন। ফলতঃ তখন 'আনন্দের কোলাহল অতি মনোহর।' শুনিতাম প্রতিদিন গ্রামের ভিতর।' সূর্য অস্ত গেলে 'প্রতি গৃহে বাদ্যরব' ধ্বনিত হোত, 'কোথাও বৈষ্ণবগণ মৃদঙ্গ সহিত গাইত হরির নাম- গীত সুললিত'। তারপর আকাশে চন্দ্র উদিত হলে গ্রামবাসী সকলে মিলে 'বাজায়ে মৃদঙ্গ, ভ্রমিত নগরী পথে, করে নানারঙ্গ', কোথাও বা চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতগণ 'নস্যের শামুক' হাতে নিয়ে 'ন্যায়' সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত' বিষয়ে 'শতর্ক' কলরবে, রাস্তায় চলতেন এবং যাঁর গলায় যত জোর, তিনি 'ব্যাকরণে' তত জয়ী হতেন। সন্ধ্যাবেলা 'সরোবর ঘাটে' বসে তিনি দেখতেন, বৃক্ষতলে 'সংসার চিন্তায়', 'কত কত মহাজন' বসে বসে নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা আলোচনা করছেন, কেউ বা অপরের কথায় 'ঘাড় নাড়ি সায়' দিচ্ছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে পারস্পরিক হিংসার ভাব ছিল না 'কাটাইত সুখ ভোগে কাল সবে, হিংসায় বিরত'। অদূরে দেখা যেত 'গজেন্দ্র গামিনী' 'পল্লীর কামিনী'রা 'কক্ষেতে কলসী' নিয়ে সংসারের নানা কথা বলতে বলতে জল নেবার জন্যে সরোবরে আসছে,

—কেউ বা পরপুরুষের মুখ দেখে লজ্জায় গাছের আড়ালে লুকোচ্ছে, তা দেখে কবির মনে হোত, 'মেঘেতে তড়িৎ যেন লুকায় আকাশে'। পাঠশালার ছুটি হলে বালকেরা কলরব করতে করতে বাড়ি ফিরছে, কখনো সকলে 'গঙ্গার গীত' গাইছে সমস্বরে—এদের সঙ্গে কবিও শৈশবে কত খেলা খেলেছেন, সেকথা তাঁর মনে পড়ে। বর্ষাকালে নদীর জলের সঙ্গে 'মৎস্য অগনন' গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করতো, ফলে সে সব মাছ 'খাইত মনের সাধে পুরবাসীগণ', সেকথাও যেমন তাঁর মনে পড়লো, তেমনি রাত্রিকালে 'নরমাংস' ভোজনের লোভে 'তস্করের প্রায়' 'কুমীর' কেমন 'ধীরে ধীরে জনপদে' আসতো, সে কথাও তাঁর মনে পড়লো। বর্ষাকালে বিদ্যুতের ঝলক ও বজ্রের গম্ভীর শব্দ কিভাবে 'ভুলাইত একেবারে সকলের মন'—সে স্মৃতিও তাঁর মনে জেগে উঠলো। আবার 'হিমন্ত, শিশির কাল'-এ গ্রামের খালে 'সদাগরিদ্রব্য' নিয়ে অগণিত তরী এসে উপস্থিত হোত—'সে সব সুন্দর দৃশ্য ? সে ব্যস্ত সংসার ?

সেরূপ আনন্দময় বাণিজ্য ব্যাপার ?' এখন কোথায় চলে গেল' বলে কবি আক্ষেপ করছেন। প্রভাতে নবোদিত সূর্যের আলোয় সমস্ত প্রকৃতি যখন 'অপার আনন্দে' উথলে উঠতো, তখন 'আনন্দ অন্তরে' 'গ্রামের প্রান্তরে' বেড়াতে যাবার মধুর প্রকৃতি তাঁর মনে পড়লো। মুকুলিত আম গাছের 'পাতার আড়ালে' বসে কোকিলের সুমিষ্ট স্বরে ডাকের সঙ্গে কাঠুরিয়া নারীদের 'উল্লাস অন্তরে···অসভ্য গীত', হরিণদের নির্ভয়ে বিচরণ দৃশ্য তাঁর স্মৃতিপথে আরূঢ় হোল। 'গ্রামের মধ্যেতে' অপূর্ব-দর্শন গৃহ ও অট্টালিকা শোভা পেত, চণ্ডীর মন্দিরটি ছিল সুন্দর এবং সেখানে শত শত ধনবান ব্যক্তি পূজো দেবার জন্য আসতেন। কাছেই 'দুর্গসম' যে বিরাট অট্টালিকা ছিল, তার সম্মুখবর্তী সরোবরের জল ছিল স্নিগ্ধ, সরোবরের ধারে ছিল প্রস্ফুটিত চাঁপা ফুলের গাছ—সব মিলিয়ে সেই অপূর্ব দর্শন অট্টালিকা দেখবার জন্য বহুলোক আসতো—এখন সেই অট্টালিকা নেই, 'অদ্বিতীয়কাল' স্বরূপ 'দ্বারপাল' নেই, সেই অগণিত দাসদাসী কর্মচারী নেই, সকলই ধ্বংস হয়েছে।

বৈশাখী পূর্ণিমায় এই গ্রামে প্রচুর সমারোহ হোত, বহু দূর থেকে লোক আসতো 'চণ্ডীপূজা দেখতে, 'প্রতি ঘরে ঘরে কুটুম্ব বান্ধবগণ' আসতো—গ্রামবাসীরা সেই 'দিনত্রয়' আহ্লাদে আনন্দে কাটাতো। ক্রমে অন্ধকার ঘনিয়ে আসতো, আকাশে একে একে ফুটে উঠতো তারা। তারপর যখন চাঁদ উঠতো, তখন 'কিবা শোভা হইত গগনে।' তিনদিন সমস্ত গ্রাম কোলাহল মুখর থাকতো, বাদ্যধ্বনিতে আকাশ বাতাস হোত মুখরিত—'গায়কগণ সুমধুর স্বরে গান গাইত, তার সঙ্গে 'নাচিত নর্তকীগণ', জ্ঞাতিবন্ধু দাসদাসী নিয়ে কদিন মানুষ পরম পরিতৃপ্তিতে কালযাপন করতো 'গ্রাম আলোময় হইত,—অপূর্ব দৃশ্য—যেন 'ইন্দ্রালয়' হয়ে উঠতো।

যে 'গ্রামে এত শোভা ছিল,' যেখানের বাসিন্দারা কত সুখে দিন কাটাতো, এখন সেখানে সকল কিছুই নিরানন্দ, মলিন। গ্রামের সেই 'মহাত্মাগণ', যাঁরা নানাভাবে গ্রামবাসীদের হিতকর কার্য করতেন, তাঁরা পরলোক গমন করেছেন—তাঁদের নাম এখন 'ভ্রমিতেছে স্মৃতিরাজ্যে'। সেই আনন্দময় গ্রাম এখন অরণ্য সদৃশ এমন নির্জন স্থানে পরিণত হয়েছে যে পথ হাঁটিতে পথিকের মন 'ভয়ে কম্পমান হয় সদা'। বন্ধুর সঙ্গে নৌকায় করে এসে গ্রামের অবস্থা দেখে কবি 'কাঁদিলাম হয়ে অচেতন'। অথচ এই গ্রামে এসে মা ও ভগ্নীকে দেখবার জন্য জাহ্নবীর 'প্রবল তরঙ্গ' উপেক্ষা করে নৌকাযাত্রা করেছিলেন তিনি! বাল্যকালের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে বলে মনে তাঁর কত আশাই না ছিল! তীরে নেমে বন্ধুর সঙ্গে

বামফ্রণ্ট সরকার ব্যাপকভাবে শিক্ষা সম্প্রসারণে সংকল্পবদ্ধ

শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে জনগণের মধ্যে প্রসারিত করা এবং শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণের নীতিতে বামফ্রন্ট সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে শিক্ষাখাতে সর্বকালীন রেকর্ড পরিমাণ টাকা ব্যয় হবে এই বৎসর, প্রায় চার শ আঠার কোটি টাকা।

বামফ্রন্ট সরকার গত ৬ বৎসরে ৪৬০০ প্রাথমিক ও ১৫০০ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। বাহাত্তর লক্ষ শিশু অর্থাৎ ছয় থেকে দশ বছর বয়সী শিশুদের তিরানব্বই শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে। এছাড়া যেসব শিশুকে এখনও পর্যন্ত প্রথানুগ শিক্ষাব্যবস্থায় আনা যায়নি তাদের আংশিক সময়ের জন্য প্রথামুক্ত শিক্ষা প্রকল্পের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ১৯৮২।৮৩ সালে এক লক্ষ ষাট হাজার শিশুকে এই ব্যবস্থার মধ্যে আনা হয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাব্বিশ লক্ষাধিক শিশুকে 'পুষ্টি কর্মসূচী'র আওতায় আনা হয়েছে। বয়স্ক শিক্ষার সুফল পাচ্ছেন চার লক্ষ মানুষ।

আদিবাসী শিশুদের জন্য চারশ পঁচাশটি প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের তিন লক্ষ আশি হাজার ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন বৃত্তিদান প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছে।

নারী শিক্ষা এবং তফসিলী ও আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কলেজীয় শিক্ষা প্রসারের মূল ঝোঁকও অব্যাহত রয়েছে।

রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলিকে অর্থ ও প্রচুর পরিমাণে গ্রন্থ সরবরাহ করে গণশিক্ষার প্রসারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বামফ্রন্ট সরকার ব্যাপকভাবে শিক্ষা সম্প্রসারণে সংকল্পবদ্ধ।

—পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

—তথ্য ও সংস্কৃতি ৭১১৬।৮৩—

তাড়াতাড়ি গ্রামের ভিতর প্রবেশ করলেন, কিন্তু সমস্ত গ্রাম নির্জন 'জনহীন পুরী যেন', 'কোথায় বাজার ? কোথায় বা কোতোয়ালী ?' কিছুরই চিহ্ন নেই। বন্ধুর বাড়িতে সে রাত্রে তিনি গ্রামের দুর্দশার বিবরণ শুনে 'হইলাম জ্ঞান হত।' অনেকক্ষণ কাঁদবার পরে তাঁর শোক ভোলাবার জন্যে' আকর্ষিলা নিদ্রাদেবী'। সকালে গ্রামের ভেতর প্রবেশ করে দেখলেন 'যমপুরি যেন গ্রাম'। প্রবল জ্বরের তাড়নায় গ্রামবাসী মুমূর্ষু, কোন বাড়ীতে জ্বরগ্রস্ত মা 'পুত্রের শোকেতে' কাঁদছে, কোন বাড়িতে 'দুটি শিশুর আকার' পড়ে আছে, সেখানে আর কেউ নেই, কোন বাড়িতে মৃত শিশু কোলে মাতা জ্বরে অচেতন হয়ে পড়ে আছে। 'কএক বরষে গ্রামের সহস্র সহস্র লোক' 'যমের আলয়ে' গেছে, তাই অট্টালিকাসমূহ জনশূন্য, পথের উপর মৃতদেহ পড়ে আছে, সৎকারের লোক নেই— 'সুখের আলয়' স্বরূপ গ্রামটি এখন 'নিরানন্দময়' হয়েছে। সব দেখে অজানা ভয়ে কবির হৃদয় কেঁপে উঠলো, তাঁর বাক্‌রোধ হলো, পা কাঁপতে লাগলো, চোখ জলে ভরে উঠলো। 'কেনরে এমন দশা ঘটিল এখন ?' কবি ভাবতে লাগলেন। ভারতে অনেক সুন্দর সুন্দর স্থান রয়েছে, সে সব ছেড়ে দেশ জননীর এত দুর্দশা দেখবার জন্যেই কি তিনি গ্রামে এসেছেন—কবি মনে মনে প্রশ্ন করেছেন—

'সে সব ত্যজিয়া এবে কাঁদিবার তরে,
কেনরে আইলি তুই ফিরে নিজ ঘরে ?'

এই হোল 'বিজনগ্রাম' কাব্যটির 'বিজনগ্রাম' নামক প্রথমাংশের কথাবস্তু।

অতঃপর 'প্রসূতি বিয়োগে তস্যাঃ সুতঃ' নামক দ্বিতীয়াংশের সারসংক্ষেপ করছি। এই অংশটি তিনটি সর্গে বিভক্ত। প্রথম সর্গ আরম্ভ হয়েছে এইভাবে—

'কেন শূন্যময় আজি হেরি এ সদন,
শূন্যময় মন কেন ক্ষুণ্ণ সর্বক্ষণ ?
না দেখিয়া নীড় মধ্যে যথা পক্ষিনীরে,
চীৎকার শাবকবৃন্দ করে উর্ধ্ব শিরে,
তেমনি ক্রন্দন পূর্ণ কেন এ আবাস
বিলাপিছে পুরজন ছাড়ি ঘনশ্বাস…।'

কবি দেখছেন যে তাঁর 'পিতা বসি একাকী নির্জনে' গুমরে গুমরে কাঁদছেন 'বিপ্রবেশধারী… ভ্রাতৃগণ' ক্রন্দনরত, 'বিষন্নবেদনা দাসী', 'পান ভোজনের পাত্র' 'রাখি ভূমিতলে' আঁখিজলে ভাসছে। কারুর 'নাহি অন্নপানে রুচি'। কোথাও বিলাসের চিহ্নমাত্র নেই, কারুর মুখে হাসি নেই—সর্বত্রই 'সত্তভাব' বিরাজিত। কবির মাতা 'গিয়াছেন লোকান্তর' এবং সেইজন্য 'নাহি গৃহলক্ষ্মী, ঘর তাই তমোময়।' 'নিদয় কৃতান্ত' ঘরের 'দীপ'টিকে নিভিয়ে দিয়েছে, মাতারূপ গৃহ 'রবি' অস্তগত হওয়ায় এখন 'সকলি আঁধার', সূর্য পুনরায় উদিত হয়, কিন্তু মাতা তো আর ফিরে এসে কবির 'মানস আঁধার' দূর করবেন না। পন্দর পাখী সুবিধা পেয়ে 'পিঞ্জর' থেকে পলায়ন করলে সে কি আর পিঞ্জরে ফিরে আসে ?

মেঘ হতে পতিত বৃষ্টি পর্বত কন্দরে জমা হয় এবং তা নদীরূপে দেশে দেশে প্রবাহিত হয়ে 'জীবনে, জীবন দান করি, সযতনে। পালে কত শত তরু, লতা, গুল্মগণে,' তেমনি 'ঈশ্বর দয়া' স্বর্গ হোতে 'জননীর—হৃৎকূপ'—এ পতিত হয়ে স্তন্য দুগ্ধাকারে প্রবাহিত হয়ে সন্তানদের পালন করে। জননী এখন সেই স্নেহ নিয়ে চলে গেছেন, জগতে সে অভাব কে

পূর্ণ করবে ? সন্তানকে 'কোলেতে' নিয়ে ঘুম পাড়াবার জন্য তিনি কত যত্ন করতেন এবং সন্তান নিদ্রিত হলে তার পাশে 'অঞ্চল' পেতে শুতেন, সন্তানের কান্না শুনলে চঞ্চল হতেন, তার রোগ হলে 'অন্ন, বিরাম, শয়ন' ত্যাগ করতেন, সন্তানের জন্য কত খাদ্য 'লুকায়ে' রাখতেন। এখন কে আর তা করবে ? এখন ক্ষুধা পেলে কাকে আর মা বলে ডাকবেন ? সন্তান খেয়েছে কিনা কেই বা তা জানতে চাইবে ? সন্তানের শুভ দেখে কেই বা উল্লসিত ও গর্বিত হবে ? সন্তান পড়তে যাবে বলে প্রাতঃকালে উঠে নিজের শরীরের পানে না তাকিয়ে গঙ্গা স্নান করে অন্ন প্রস্তুত করতেন, গ্রীষ্মকালেও সন্তানের আহারের জন্য জ্বলন্ত উনানের ধারে না খেয়ে বসে থাকতেন। এসব পরিত্যাগ করে তিনি এখন দূর দেশে চলে গেছেন।

স্বয়ং জগজ্জননী মাতৃরূপে ধরাতে আবির্ভূত হন—তিনি এখন যেখানে চলে গেছেন সন্তানের দুঃখের কথা সেখানে কি তাঁর মনে পড়ে না ? যে স্বর্গপুরে মাতা আছেন, সেখানে দুঃখের লেশমাত্র নেই, সেখানে সর্বদাই 'আনন্দের স্রোতঃ অবিরাম' প্রবাহিত। গৃহের সর্বত্র মাতার স্নেহের নিদর্শনগুলি দেখে, লোকের মুখে মাতার প্রশংসা শুনে বুকে বেদনা অনুভূত হয়, কারো কণ্ঠে 'মা' ডাক শুনলে প্রাণ আনচান করে। এ সংসার 'মোহময়'। এবং সময় হলে সকল কিছুই 'কালরূপ জলে' লয়প্রাপ্ত হবে এটা জানা সত্ত্বেও 'তবু কাঁদে এ পরাণি'। কলসী কাঁকে নিয়ে পল্লী নারীরা দলবদ্ধভাবে জল আনতে গিয়ে মাতার গুণগান করে, বাড়িতে এসে রমণীরা মাতার জন্য চোখের জল ফেলে। কাঠুরিয়া বৃক্ষচ্ছেদন করলে আশ্রয়চ্যুত পাখীরা যেমন হাহাকার করে, তেমনি মাতার বিচ্ছেদে তার সন্তানরা হাহাকার করছে। মাতার আপন পর নির্বিশেষ আতিথেয়তা, পাড়া-প্রতিবেশীর প্রতি দয়া, তাদের দুঃখে সহানুভূতি জ্ঞাপন ও সাহায্য দান এখন কবির মনে পড়ছে। নিদ্রাকালে তিনি স্বপ্নে মাতাকে সংসারের নানা কাজে ব্যস্ত দেখেন, কিন্তু নিদ্রান্তে দুঃখে 'বুক করে বিদারণ'। তাঁর মনে হয় মাতার বিদেহী আত্মা এখনও 'বাৎসল্য বশে আসেন ভূতল'।

'দ্বিতীয় সর্গের' কথাবস্তু ঃ একদিন রাত্রে কবি স্বপ্নে একটি সুন্দর তোরণ দেখলেন, তোরণের উপর 'পুণ্যদেশ' এই শব্দটি সোনার অক্ষরে খোদাই করা আছে। তোরণের দ্বারীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি যে মাতৃহারা একথা তিনি জানালেন। দ্বারী জানালো যে নরলীলা সমাপ্ত করে মানুষ এখানে এসে অনন্ত সুখে থাকে এবং অল্পদিন পূর্বে সম্ভবতঃ কবির জননী এখানে এসেছেন। মাতা-বিচ্ছেদে কবির কাতরোক্তি শুনে দ্বারী দয়াপরবশ হয়ে মাতার সঙ্গে কবিকে দেখা করিয়ে দেবে বলে সঙ্গে নিয়ে চলতে লাগলো—কবি বহু অদৃষ্টপূর্ব আশ্চর্য রমণীয় দৃশ্য দেখতে দেখতে পথ অতিবাহিত করতে লাগলেন, তিনি প্রথমে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দেখে কাঁদতে কাঁদতে তার পা ধরতে গেলেন, কিন্তু 'কে ধরিতে পারে, বায়ু-দেহে'। কবি জ্যেষ্ঠভ্রাতার সঙ্গে জননীকে দেখবার জন্য অগ্রসর হলেন—পথে রামচন্দ্রের পদ সেবারতা সীতাদেবীকে দেখতে পেলেন। তাছাড়া শিব, পার্বতী, গণেশ কার্তিক, বিষ্ণু, রুক্মিণী, কুন্তী, পাণ্ডু, সাবিত্রী, সত্যবান সকলকে দেখতে দেখতে শেষ পর্যন্ত তিনি মাতাকে দেখলেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে মাতার পদ স্পর্শ করতে গেলেন, কিন্তু 'কে পারে ধরিতে, হায় কিরণ মিহির ? আত্মময়ী মাতা নাহি পূর্বের শরীর !' মাতা বললেন যে শোক যে কি পদার্থ এখন তা না জানলেও সন্তানের মুখে শোকের চিহ্ন ও চোখে অশ্রু দেখে তাঁর প্রাণ কেমন করে। তিনি পুত্রকে সান্ত্বনা দান করলেন। 'পুরদ্বারী' তাঁকে সযত্নে ধর্ম পালনের উপদেশ দিলেন এবং বললেন মৃত্যুদ্বারে উপস্থিত মানুষকে পার্থিব সকল

কিছুই পরিত্যাগ করতে হয়, শুধু ধর্মই তার সঙ্গে থাকে। আত্মা অবিনাশী, তা লোক-লোকান্তরে ভ্রমণ করতে থাকে, সেই সময়ে পাথেয় স্বরূপ ধর্মই শুধু তার সঙ্গে থাকে। নিদ্রাভঙ্গ হলে কবি-মাতাও ভ্রাতার জন্য শোকাকুল হয়ে উঠলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাবলেন, 'নিরর্থ কভু নহে এ স্বপনে, ঈশ্বর তাঁকে 'অমৃতদমান' 'ধর্মফল' দেখালেন স্বপ্নের মধ্যে।

প্রভাতে শয্যাত্যাগ করে তিনি যখন গঙ্গার তীরে গেলেন, তখন সমস্ত প্রকৃতি আনন্দমগ্ন। তিনি গঙ্গাকে উদ্দেশ্য করে জানালেন যে গত সন্ধ্যায় যে সূর্য 'পশ্চিমসাগরে' ডুবেছিল, আজ তা আবার পূর্বদিকের গঙ্গাবক্ষ থেকে উদিত হচ্ছে। কিন্তু তাঁর মাতাকে তিনি যে গঙ্গাবক্ষে বিসর্জন দিয়াছেন, সেই মাতাকে কি গঙ্গা আর ফেরত দিতে পারেন না। গঙ্গা যিনি স্বয়ং কন্যা হয়ে তাঁর মাতাকে হিমালয়ে বিসর্জন দিয়ে এসেছেন, তিনি কিরূপেই বা মাতা যে কি রত্ন তা জানবেন ? তারপর সূর্যতেজ প্রখর হয়ে উঠলে কবি 'ক্ষুণ্ণ মনে' গৃহের পানে চললেন।

'তৃতীয় সর্গের' বিষয়বস্তু ঃ দুরন্ত 'শূল'রোগে মাতার মৃত্যু হয়েছে অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্যে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি উত্তম চিকিৎসককে নিয়ে আসেন। ঔষধ পানের পর তিনি মাতাকে সযত্নে একটু দুগ্ধপান করান। কিন্তু তিনি আর ঔষধ খেতে চাইলেন না, ধীরে ধীরে তাঁর বাক্‌রোধ হোল। তখন তিনি পুনরায় চিকিৎসককে নিয়ে এলেন—সেই চিকিৎসক নিজে বিশেষ অসুস্থ হলেও বন্ধুত্বের সম্মান রক্ষার জন্যেই বন্ধুর মাতাকে সুস্থ করবার জন্য অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হোল। চিকিৎসকের পরামর্শে মাতাকে অন্তর্জলী যাত্রা করে গঙ্গাতীরে নিয়ে আসা হোল। সেখানে সমবেত নারীগণ জানালো যে পতিপুত্র রেখে ইনি প্রকৃত সতীর মতো চলে যাচ্ছেন। পুত্রবধূগণ এসে মাতার সিঁথিতে সিঁদুর ও পায়ে আলতা দিয়ে প্রণামান্তে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে গেল—ক্রমে অন্ধকার হয়ে রাত্রি ঘনিয়ে এল—কবি মাতাকে তীরস্থ একটি কুটিরে নিয়ে গেলেন, এবং একটি প্রদীপ জ্বাললেন। তখনও তাঁর আশা, মাতা হয়ত সুস্থ হয়ে উঠবেন। আশার কি আশ্চর্য শক্তি—জীবকুল আশাতেই তো বেঁচে থাকে। তেলহীন নিবন্ত প্রদীপে হঠাৎ তেল দিলে যেমন দীপশিখা নিভে যায়, তেমনি মরনোদ্যত মাতার মুখে ঔষধ দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু হোল। শোকাকুল চিত্তে মাতার মৃতদেহ নিয়ে তিনি গঙ্গাতীরে উপস্থিত হলেন। অতঃপর দাহকার্যের জন্য মৃতদেহকে শ্মশানে আনা হোল। যথাবিধি মৃতদেহে ঘৃত লেপন ও গঙ্গাজলে স্নান করাবার পর চিতায় শয়ান করান হোল এবং অগ্রজ মুখাগ্নি করলে চিতায় অগ্নি সংযোগ করা হোল। আগুনে শবদেহ ভস্মীভূত হলে সকল ভ্রাতারা শরীরের অস্থিআদি অবশিষ্ট অংশ সংগ্রহ করে গঙ্গায় নিক্ষেপ করলেন এবং সকলে কলসী ভরে গঙ্গাজল দিয়ে চিতাগ্নি নির্বাপিত করে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে গেলেন।

'বিজনগ্রাম' কাব্যটি ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে রচিত হয়েছিল। দুটি অংশই একসঙ্গে ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে 'বিজনগ্রাম' এই সাধারণ নাম নিয়ে প্রকাশিত [১৯০২ খ্রীস্টাব্দে কাব্যটির 'দ্বিতীয় সংশোধিত সংস্করণ'ও এই নামে প্রকাশিত হয়।] হওয়ায় এবং 'প্রসূতি বিয়োগে তস্যাঃ সুতঃ' অংশটি সম্পর্কে কেদারনাথ তাঁর স্বলিখিত জীবনী গ্রন্থে পৃথকভাবে কোনরূপ উল্লেখমাত্র না করায়, এরূপ মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে দুটি অংশ শুধু যে এক সঙ্গেই রচিত হয়েছিল, তাই নয়, দ্বিতীয় অংশটিকে প্রথমাংশের পরিপূরক হিসাবে একটি সামগ্রিক কাব্যের কল্পনাই তিনি করেছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে (১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে)

জন্মপল্লী উলার দুর্দশা দেখে কবির মনে যে নিদারুণ আঘাত লেগেছিল, ১২৬৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে (১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের মে-জুন মাসে) তাঁর প্রথমা পত্নী সয়ামনীর আকস্মিক মৃত্যু সেই বেদনাকে তীব্রভাবে উদ্রিক্ত করে দিয়েছিল। তবে 'বিজনগ্রাম' শীর্ষক প্রথমাংশে কেদারনাথের বাস্তব অভিজ্ঞতা যতটা অংশ অধিকার করেছে, 'প্রসূতি বিয়োগে তস্যাঃ সুতঃ' অংশে ঠিক সেই পরিমাণ বাস্তব-অনসৃতি লক্ষ্য করা যায় না। কেননা কেদারনাথের মাতৃবিয়োগ হয় কাব্যটি রচনার অনেক পরে, ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে। অবশ্য এজন্য কাব্যটিকে সম্পূর্ণ কাল্পনিকও বলা যায় না। প্রথমা পত্নীর বিয়োগ-বেদনাকে কবি যেন পরোক্ষভাবে কাব্যটিতে রূপ দিতে চেয়েছেন বলে মনে হয়। অর্থাৎ, কেদারনাথ কল্পনা দ্বারা তাঁর মাতৃহারা শিশুপুত্রের স্থান দখল করে প্রকারান্তরে অন্তরের সুগুপ্তশোকের উৎসমুখটিকেই নির্গলিত করতে চেয়েছেন। পূর্বেই বলেছি যে কাব্যের এই অংশটি কেদারনাথের সম্পূর্ণ মৌলিক সৃষ্টি। সুতরাং কাব্যাংশটিতে তিনি যে আদ্যন্ত মাতৃহারা শিশুপুত্রের ভূমিকা পালন করতে পেরেছেন তা নয়, আবার তাঁর পারিবারিক জীবনের সঙ্গেও কাব্যাংশটিকে মেলাতে গেলে কিছু কিছু অসঙ্গতি বা তথ্যগত বিচ্যুতিও চোখে পড়বে। যেমন দ্বিতীয় সর্গে সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর যে কথা উল্লিখিত হয়েছে, তা বাস্তব সত্য, কিন্তু তৃতীয় স্বর্গে মাতার মুখাগ্নি করবার কাজে 'আসিয়া অগ্রজ, অগ্নি করিল অর্পণ' বলে যে উল্লেখ পাওয়া যায়, তা তথ্যসহ নয়। কেননা কেদারনাথ পিতামাতার তৃতীয় সন্তান ছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর দুইজন অগ্রজই মাতার মৃত্যুর আগেই পরলোক গমন করেন। তাছাড়া আলোচ্য অংশে কবি তাঁর মাতার 'সতী, রাখি পুত্র, পতি' অর্থাৎ সধবা অবস্থায় পরলোকগমনের যে চিত্র দিয়েছেন, তাও প্রকৃত নয়, কেননা কেদারনাথের একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালেই তাঁর পিতা আনন্দচন্দ্র পরলোক গমন করেন। বস্তুতঃ কেদারনাথের ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে কাব্যটির হুবহু মিল নেই, কবির জীবনের সঙ্গে তাঁর সৃষ্ট কাব্যের সর্বাংশে মিল আশা করাও উচিত নয়, কেন না কাব্যমাত্রই কবিকল্পনার সৃষ্টি, কবির জীবনের ফটোগ্রাফ মাত্র নয়। এখানে মাতৃহারা শিশুপুত্রের বেদনাকে কবি অসীম কল্পনা বলেও সহানুভূতির দ্বারা নিজের মধ্যে সত্য করে তুলতে চেয়েছিলেন, সেকারণ তথাকথিত বাস্তবের সঙ্গে কবির স্বেচ্ছাবিহারিণী কল্পনার এমন ওতপ্রোত সংমিশ্রণ হয়ে উভয় অংশের শোককে একটা কাব্যের মধ্যে একীভূত করে দিয়েছে। তাছাড়া মাতার পটভূমিকারূপে একটি গ্রামীণ পরিবেশকে বেছে নিয়ে কাব্যটিতে তিনি যেন প্রথম অংশটিরই সম্পূর্ণতা বা বিস্তৃতি সাধন করতে চেয়েছেন। পাঠকের কল্পনার দুটি অংশের মধ্যে যে আপাত-ফাঁক, তা একটি প্রবল ও বৃহৎ শোকভাবের দ্বারা পূর্ণ হয়ে যাবে, সম্ভবতঃ কেদারনাথ এরূপ কল্পনা করেছিলেন। এবং আমার মনে হয় সেদিক দিয়ে দেখলে কেদারনাথের প্রত্যাশা যে খুব অযৌক্তিক তা নয়। একদিকে জননী, অন্যদিকে জন্মভূমি—দুয়ের বিচ্ছেদ বেদনার তীব্রতা নিয়ে মানুষের চিত্তে কিভাবে ঈশ্বর নির্ভরতা, ধর্মভাবভাবুকতা জাগে, সব হারিয়ে মানুষ কিভাবে সর্বস্ব ফিরে পায়, এমন একটা সত্যের দিকেই তিনি হয়ত বা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। এ দৃষ্টিতে দেখলে আপাতবিচ্ছিন্ন দুটি অংশকে বৃহত্তর জীবন গ্রন্থের এপিঠ ওপিঠ বলেই মনে হবে।

'বিজনগ্রামের'র প্রথম অংশটিতে ইংরেজ কবি গোল্ডস্মিথের কিছু অনুপ্রেরণা ছিল সন্দেহ নেই, তবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কবিদের সঙ্গে কেদারনাথের তখনই যে বিশেষ পরিচয় হয়েছিল,

কাব্যটির ইতস্ততঃ সে প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। দ্বিতীয় অংশটি কবির মৌলিক কল্পনা প্রসূত হলেও কাব্যদেহটি গড়ে তুলতে তিনি যে মধুসূদনের দ্বারা বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, তার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। সে বিষয়ে এখানে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করছি। উনিশ শতকের বাংলা কাব্যে মধুসূদনই প্রথম 'সর্গ'-এর পরিকল্পনাটি আনেন। মধুসূদনের অনুসরণেই কেদারনাথ 'বিজনগ্রাম' কাব্যের দ্বিতীয় অংশকে তিনটি সর্গে বিন্যস্ত করেছেন। দ্বিতীয় সর্গে স্বর্গপুরীর পরিকল্পনায় মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের 'প্রেতপুরী' নামক অষ্টম সর্গের অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়, তৃতীয় সর্গে মাতার মৃত্যু ও জাহ্নবীতীরে সেই মৃতদেহ সংকারের দৃশ্য বর্ণনায় কেদারনাথ 'মেঘনাদবধ' কাব্যের 'সংস্ক্রিয়া' নামক নবম সর্গের কথা বিশেষভাবেই স্মরণ করেছেন। মধুসূদনকে তিনি 'মহাকবি' রূপে কাব্যের ভূমিকাতে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং মধুসূদনের দ্বারা তিনি আরো কতভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন, তা কাব্যটিতে ব্যবহৃত শব্দগুলির দিকে তাকালে বোঝা যায়। শুধু শব্দমাত্র নয়, ভাবের দিক দিয়েও তিনি মধুসূদনের কাছ থেকে কি পরিমাণ ঋণ নিয়েছেন, কতকগুলি স্থান উদ্ধার করে তা দেখানো যেতে পারে।

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রথম সর্গে পুত্র বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদে শোকাকুল রাবণকে মন্ত্রী সারণ উপদেশ দান করলে রাবণ তার উত্তরে বলেন—

জানি হে আমি, এ ভবমন্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ সুখ যত।
কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ
অবোধ…'ইত্যাদি।

এর সদৃশ অংশটি হোল প্রথম সর্গের এই অংশ—

কিন্তু মোহময় জানি এ ভব সংসার,
অনিত্য সকলই যে অসার আধার।
কিন্তু জানি শুধু, তবু কাঁদে এ পরাণি।'

'মেঘনাদ বধে'র অষ্টম সর্গে' রামচন্দ্র যখন দশরথের পাদবন্দনা করতে গেলেন, তখন,

'নারিলা স্পর্শিতে পদ। কহিলা সুস্বরে
রঘুজ-অজ-অঙ্গজ দশরথাঙ্গজে ;—
'নহে-ভূতপূর্ব' দেহ এবে যা দেখিছ,
প্রাণাধিক! ছায়ামাত্র! কেমনে ছুঁইবে
এ ছায়া, শরীরী তুমি ?…'ইত্যাদি।

এর সঙ্গে দ্বিতীয় সর্গে মৃতা মাতাকে দেখে কবি যখন

'অগ্রসরি চাহিলাম স্পর্শিতে চরণ,
কিন্তু নারিলাম তাহা করিতে ধারণ।
কে পারে ধরিতে, হায়! কিরণ মিহির ?
আত্মময়ী মাতা, নাহি পূর্বের শরীর'।

এই অংশটির পরিকল্পনার মিল অত্যন্ত স্পষ্ট। আবার মেঘনাদ বধে'র প্রথম সর্গে প্রাসাদ প্রাকার থেকে বীরবাহুর মৃতদেহ দেখে 'মহাশোকে শোকাকুল' রাবণ যেমন বলেছেন,

'যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ কুমার

প্রিয়তম, বীরকুল সাধ এ শয়নে···ইত্যাদি।'

এর সঙ্গে গঙ্গাতীরে সৎকারার্থে নীত মাতার মৃতদেহ দেখে কবির আক্ষেপোক্তি—

'যে শয্যায় আজি মাতঃ! কোরেছ শয়ান,
দেখি বুক ফাটে, প্রাণ করে গো কেমন' ইত্যাদি

অংশটির আক্ষরিক সাদৃশ্য দেখা যায়। 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের সমাপ্তিজ্ঞাপক অবিস্মরণীয় চারিটি ছত্র 'করি স্নান সিন্ধু নীরে, রক্ষোদল এবে

ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে—
বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে।
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে'।

কেদারনাথ এই অংশটির কারুণ্য স্মরণ করে তাঁর 'বিজনগ্রাম' কাব্যটিও সমাপ্ত করেছেন এইভাবে—

'করি স্নান গৃহপানে ফিরিনু সকলে,
প্রতিমা দশমী দিনে, ফেলি যেন জলে।
উঠিল কাঁদিয়া পুর, যেমতি কানন,
বিহগ আবাস, করি ফিরাতে দর্শন'।

এই প্রকার সুস্পষ্ট অনুপ্রেরণার কথা বাদ দিলেও কাব্যটিতে কেদারনাথের কৃতিত্বের পরিচয়ও নেহাৎ উপেক্ষণীয় নয়। কাব্যটিতে ইতস্ততঃ তাঁর অভ্রান্ত কবিপ্রাণতার যে প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, সে সম্পর্কেও আমাদের অবহিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। এমন দুএকটি স্থানের উল্লেখ এ প্রসঙ্গে করা প্রয়োজন মনে করি। জন্মগ্রামে পুনঃ প্রত্যাবর্তনান্তে শৈশব স্মৃতির অনুধ্যান করতে গিয়ে জীবনপ্রত্যূষে বিদ্যাশিক্ষার সূত্রপাতের কথা কবির মনে পড়েছে। শৈশবোচিত চাপল্যে তিনি তখন পাঠশালা থেকে নিষ্কৃতিলাভের কামনায় যে কিরূপ ব্যাকুল হতেন, এতকাল পরে সে কথা তাঁর মনে পড়ায় যে বিমিশ্র মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে, সে কথা তিনি এইভাবে প্রকাশ করেছেন,

'গুরুর নিকটে
শিখিতে যাইয়া পাঠ, পড়িয়া শঙ্কটে,
ভাবিতাম সেই কালে, কতদিন পরে
উদ্ধার হইব আমি বিপদ সাগরে।
এবে সে বিপদজাল কত মিষ্ট, হায়;
সংসারে পড়িয়া ভাবি, অনাথের প্রায়'।

অনুভূতির অভ্রান্ততায় এ সত্য যেন দেশকাল-নিরপেক্ষ হয়ে উঠেছে। কবির সঙ্গে সঙ্গে পাঠকচিত্তও যেন শৈশবে উত্তীর্ণ হয় এবং সেকালের দুঃখের কাঁটাগুলিতে একটা অনাস্বাদিত পূর্ব মাধুর্য অনুভব করে মনে মনে বলে, হায়, কি দিনই না চলে গেছে!

শৈশবে দৃষ্ট সকল কিছুকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করতে অক্ষম বলে কেদারনাথ অবশ্য আক্ষেপ করে লিখেছেন,

'আরো কত দেখিতাম বসিয়া তথায়
বলিতে না পারি সব, বাক্যভাবে হায়'।

কিন্তু তিনি যেটুকু করতে পেরেছেন, তার মধ্যে কোথাও কোথাও সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে।

এমন একটি স্থান হোল—সরোবর ঘাটে বসে চতুর্দিকস্থ নানা দৃশ্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে পল্লীর কুলবধূদের জল আনতে যাওয়ার বর্ণনা। 'সারি সারি' 'গজেন্দ্র গামিনী' 'পল্লির কামিনী'রা কলসী কাঁখে সংসারের নানা কথা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে করতে সতর্কভাবে সরোবরের দিকে আসছে, কিন্তু হঠাৎ পরপুরুষের আবির্ভাব ঘটায় তাদের অবস্থা বর্ণনা করতে কবি একটা ভাষা চিত্র আঁকলেন এইভাবে—

'দেখিত যখন,
পরপুরুষের মুখ, লাজে অচেতন
হয়ে, লুকাইত ভবে, তরুগণপাশে
মেঘেতে তড়িত যেন লুকায় আকাশে'।

বর্ণনাটির মধ্যে বাংলার পল্লীনারীর সারল্য ব্রীড়া ও সৌন্দর্যই যে কেবলমাত্র প্রকাশ পেয়েছে, তাই নয়, বৃক্ষান্তরালবর্তিনী নারীগুলির মেঘাবৃত আকাশে তড়িতের অবস্থার সঙ্গে তুলনার মধ্যে কবির অভ্রান্ত সৌন্দর্য সৃষ্টি ও রসবোধের প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে।

এইরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টির পরিচয় কাব্যের অন্যত্রও অনেক আছে—গ্রামের নদীটির গতি বর্ণনা করতে তিনি এখন লেখেন 'ভুজঙ্গ গমনে বহিত সে নিরবাধ', অথবা সমৃদ্ধশালী গ্রামটির মধ্যবর্তী অপূর্ব দর্শন গৃহটির রিক্ত হতশ্রী বর্ণনা প্রসঙ্গে যখন জানান যে বাড়িটি জন, প্রাণ, ও ধনশূন্য এবং সেখানে 'পশুপক্ষী মাত্র করিছে রোদন', তখন সেই অট্টালিকার ভয়াবহ অবস্থা যেন আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে—অব্যর্থ কটি শব্দ সন্ধানে কবি পাঠকমনকে একটা 'uncanny feeling' দ্বারা আবিষ্ট করে তোলেন। আবার জ্বর মহামারীতে উৎসন্নপ্রায় গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে যে অবস্থা তিনি স্বচক্ষে দেখলেন, তার চিত্রাঙ্কনেও তাঁর অপরিসীম দক্ষতারই পরিচয় প্রকাশ পায়। ইংরেজিতে যে একটি কথা আছে "Echoing landscape sound echoes the same'—কেদারনাথের বর্ণনার গুণে গ্রামের হৃদয়-বিদারক দৃশ্যগুলি পাঠকের চোখের সামনে যেন প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

আবার 'প্রসূত বিয়োগে তস্যাঃ সুতঃ' অংশের সূত্রপাতেই পাঠকের মনকে বিষাদাচ্ছন্ন করে ফেলে কবির বর্ণনা গুণে—কবির ব্যক্তিগত শোক যেন সর্বব্যাপক হয়ে পাঠক মনকে অধিকার করে। শোকের উদ্দীপন বিভাব হিসাবে কবি ক্রমান্বয়ে গৃহের চতুর্দিকস্থ নরনারীর বিচিত্র ব্যবহারের যে পৃথক পৃথক বর্ণনা দিয়েছেন, তার দ্বারাও পাঠকচিত্তে বিষাদ ভাবটি ঘনীভূত ও সর্বব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়সর্গের মাতৃবিচ্ছেদাতুর কবির একটি মৌলিক কল্পনা বর্ণনাগুণে বিশেষ হার্দ্য হয়ে উঠেছে। মাতৃহারা সন্তানের মাতৃনাম শ্রবণে চিত্তের অবস্থা বর্ণনা করতে কবি নৈসর্গিক জগতের একটা প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। 'শৈলবক্ষে' সঞ্চিত জলরাশি যেমন অন্তর্নিহিত শক্তির বলে পাষাণকে বিদীর্ণ করে নদীরূপে প্রবাহিত হয়, তেমনি মাতৃবিয়োগ বেদনা হেতু হৃদয়ে সঞ্চিত অশ্রুজল মাতার উল্লেখমাত্র সেই 'চিত্তকূপ' পরিত্যাগ করে প্রবল বেগে 'অক্ষি দিয়া' বিনির্গত হয়।

কেদারনাথের জীবন ও রচনাবলী পর্যালোচনাকালে আমি দুটি বিষয়ের কথা বলেছি—প্রথমতঃ হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি তাঁর সমগ্র অস্তিত্বের মূলে একান্ত সঞ্জীবভাবে অবস্থিত ছিল বলেই তৎকালীন বিভিন্ন ধর্মের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও তিনি তটস্থভাবে সে আন্দোলনের গতি-পরিণতি লক্ষ্য করতে পেরেছিলেন, এবং দ্বিতীয়তঃ অন্তরের সুগুপ্ত অথচ প্রবল ধর্মবোধই পরবর্তীকালে তাঁকে 'শ্রীলশ্রী সচ্চিদানন্দ ভক্তি বিনোদঠাকুর'-এ রূপান্তরিত

॥ দাও ফিরে সে অরণ্য ॥

প্রাকৃতিক ভারসাম্য এবং সুস্থ জীবনের প্রয়োজনীয় পরিবেশ রক্ষার জন্য যেখানে অরণ্যের অনুপাত হওয়া উচিত শতকরা ৩৩ ভাগ সেখানে পশ্চিমবঙ্গে বনভূমির পরিমাণ ১৩ শতাংশ। বনভূমির পরিমাণের সঙ্গে বৃষ্টিপাত, ভূমিক্ষয়, আবহাওয়ার আর্দ্রতা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ নিবিড়ভাবে যুক্ত। নির্বিচারে বন ধ্বংস করার ফলে আমাদের দেশে যেসব প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তার মধ্যে আছে খরা, বন্যা এবং সর্বোপরি পরিবেশ দূষণ। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য আজ প্রয়োজন ব্যাপকভাবে বনসৃজন।

এদিকে লক্ষ্য রেখেই সরকারী প্রচেষ্টায় বনভূমি সৃজনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক জীবনের দৈনন্দিন কাঠের চাহিদা মেটাবার জন্য সমাজভিত্তিক নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্প রূপায়ণে স্থানীয় জনসাধারণেরই ভূমিকা প্রধান। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রামের সাধারণ মানুষ, স্থানীয় ক্লাব বা সংগঠন, বিদ্যালয়, গ্রাম পঞ্চায়েত নিজ নিজ পতিত জমি, খাল ও নদী-নালার ধারে, গ্রামের রাস্তার পাশে কিংবা পল্লীর প্রান্তরে বৃক্ষ রোপণ করে একদিকে যেমন দেশের বনজ সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারেন তেমনি বাড়তি আর্থিক উপার্জন করতে পারেন। এভাবে সৃষ্ট বনজ সম্পদ হবে জমির মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি যা নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করা ছাড়াও বিক্রয় করা যাবে। এই কাজে জনসাধারণের উদ্যোগকে সার্থক করে তোলার জন্য সরকারের বন বিভাগ গাছের চারা, সার ও পরামর্শ দিয়ে নানাভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত। এজন্য স্থানীয় বনবিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বিশ্ব অর্থ ভাণ্ডারের সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গে সমাজভিত্তিক বনসৃজনের এক ব্যাপক প্রকল্প রূপায়ণের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের খরাপ্রবণ এলাকায় চাষের অনুপযুক্ত পতিত জমিতে এই প্রকল্পের সাহায্যে বনজ সম্পদ সৃষ্টির ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে।

বনবিভাগের বিভিন্ন স্তরের কর্মী এবং জনসাধারণের যৌথ প্রয়াসে সার্থক হোক সমাজভিত্তিক বনসৃজন প্রকল্প। অরণ্য সম্পদে ভরে উঠুক পশ্চিমবঙ্গের রুক্ষ প্রান্তর, বৃক্ষের আবরণে আচ্ছাদিত হোক নগ্ন ভূমি, আর বন্ধ্যা মৃত্তিকা শস্য-শ্যামলা হয়ে উঠুক।

—পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

—তথ্য ও সংস্কৃতি ৭১১৫/৮৩—

করেছিল। আলোচ্য কাব্যটির মধ্যেই ইতস্ততঃ অনেক স্থানে হিন্দু সংস্কৃতির কথা ছড়িয়ে আছে—আত্মার অবিনাশত্ব, জন্মান্তরবাদ, পুণ্যকর্মে স্বর্গসুখলাভের বিষয় নানাভাবে উল্লিখিত হয়েছে, ভারতীয় জীবন চর্যায় 'ধর্ম' শব্দটি যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে, তাকে যে প্রাণ দিয়েও রক্ষা করতে হয়, এবং তা যে তীর্থভ্রমণরত পথিকের সংগে একমাত্র পাথেয় স্বরূপ জন্ম থেকে জন্মান্তরে অনুসরণ করে, একথা কাব্যটিতে চমৎকার ভাবে বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে কেদারনাথের অত্যুগ্র ভক্তি ও প্রচার প্রবণতা তাঁর সৃষ্টিধর্মী রসরচনার ক্ষেত্রে প্রবল অন্তরায় হয়ে উঠেছে, কিন্তু আলোচ্য পর্বে তিনি তাঁর হৃদয়ের গভীর ও একান্ত বিশ্বাসকে যেভাবে শিল্পগুণান্বিত করে প্রকাশ করতে পেরেছেন, তা যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির জয়গানই কাব্যটির message বটে, কিন্তু তা কুত্রাপি প্রকটভাবে প্রচার বাসনায় আবিল হয়ে কাব্যটির রসাস্বাদনে বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় নি। 'বিজনগ্রাম' কাব্যটির এটাই সব চেয়ে বড় আকর্ষণ।

পরিষৎ-সংবাদ

পত্রিকা প্রসংগ

গত বৎসর চরম আর্থিক সঙ্কটের জন্য সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার চারিটি সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। যুগ্ম সংখ্যা করিয়া দুইটি সংখ্যা প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্তমান বৎসরে সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞাপন প্রাপকদের তালিকাভুক্ত হইয়াছে এবং বর্তমান সংখ্যায় পঃ বংগ সরকারের দুটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিজ্ঞাপন পাওয়ায় পত্রিকা প্রকাশে অনেক সাহায্য হইয়াছে। এই বিজ্ঞাপনের জন্য বংগীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে পশ্চিমবংগ সরকারকে বিশেষ করিয়া সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগকে আমরা অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

আমরা আরও আনন্দিত যে বহু চেষ্টার পর বাংগালা ভাষা ও সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা ঐতিহ্য সমৃদ্ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা কেন্দ্রীয় সরকারের পত্রিকা বিভাগে রেজিষ্ট্রিভুক্ত হইয়াছে।

এই সব প্রচেষ্টার ফলে পত্রিকা প্রকাশে অনেকখানি সহায়তা হইয়াছে এবং আশা করা যায় এই পত্রিকা প্রকাশ নিয়মিত করা সহজ হইবে।

শোক-সংবাদ

১৩৯০ বংগাব্দের বৈশাখ হইতে আষাঢ় মাসের মধ্যে সাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যাল, নিখিল ভারত বংগ সাহিত্য সম্মেলনের বিশিষ্ট সদস্য প্রভাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন পৌর প্রতিনিধি সুধীর রায় চৌধুরী, সাহিত্যিক আশালতা সিংহ, ঐতিহাসিক শশিভূষণ চৌধুরী শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের স্মরণে কার্যনির্বাহক সমিতি বিভিন্ন অধিবেশনে যথোচিত শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

সাহিত্যিক হরনাথ ঘোষ পদক দান

সাহিত্যিক হরনাথ ঘোষ পদক প্রদানের শর্ত অনুযায়ী বর্তমান বৎসরে একজন অবাঙালী সাহিত্যিককে এই পদক প্রদান করিতে হইবে। এই পদক প্রদানের শর্ত হইল এক বৎসর বাঙালী সাহিত্যিক ও পরের বৎসর অবাঙালী সাহিত্যিককে এই পদক প্রদান করিতে হইবে। গত বৎসর বাঙালী সাহিত্যিক জ্যোতির্ময়ী দেবীকে এই পদক প্রদান করা হইয়াছিল। বর্তমান বর্ষে উড়িয়া সাহিত্যের বিখ্যাত লেখক শ্রীকালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহীকে সাহিত্যিক হরনাথ ঘোষ পদক প্রদান করা হইবে বলিয়া কার্যনির্বাহক সমিতি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

পরিষৎ-গ্রন্থাগারে গ্রন্থ সম্পর্কে সতর্কতা

পরিষদ গ্রন্থাগারের কিছু গ্রন্থের 'পাতা কাটা' এবং কয়েকখানি গ্রন্থ পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া গ্রন্থাগার বিভাগ হইতে কার্যনির্বাহক সমিতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। ইহা

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে কিছু পাঠক বা ব্যবহারকারী অনুরূপ কার্য করিতেছে। ইহার দ্বারা কেবল গ্রন্থাগারেরই ক্ষতিসাধন করা হইতেছে না, ভবিষ্যৎ পাঠককেও এই সকল অমূল্য গ্রন্থপাঠ হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে। এই সম্পর্কে পাঠক ও পরিষদ-সভ্যগণ যত্নবান না হইলে এই দুষ্কৃতি রোধ করা সম্ভব নয়। এই ব্যাপারে যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

গ্রন্থাগার উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের দান

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার গ্রন্থাগারের উন্নয়নকল্পে পঞ্চাশ হাজার টাকার একটি অনুদান মঞ্জুর করিয়াছেন। এই অর্থ হইতে পনের হাজার টাকা ব্যয়ে একটি ডুপ্লিকেটিং মেসিন ক্রয় করিতে হইবে এবং বাকী প'য়ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়ে গ্রন্থাগারের আসবাবপত্র ক্রয় করিতে হইবে।

কার্যনির্বাহক সমিতি এই অনুদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বিভাগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

পুস্তক প্রকাশন

বিগত এক বৎসরে মোট ১১ খানি সাহিত্য সাধক চরিত প্রকাশিত হইয়াছে—চরিত সংখ্যা ১১৩। শশাঙ্কমোহন সেন ও জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, ১১৪। যতীন্দ্রমোহন বাগচী, ১১৫। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ১১৬। বিপিনচন্দ্র পাল, ১১৭। প্রমথ চৌধুরী, ১১৮। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১১৯। প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, ১২০। যদুনাথ সরকার, ১২১। ইন্দিরা দেবী, ১২২। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ১২৩। সুকান্ত ভট্টাচার্য।

ইহা ছাড়া শ্রীজগদীশ নারায়ণ সরকার রচিত, 'মধ্যযুগের বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক' নামেও একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

বর্তমানে 'বঙ্গে নব্যন্যায় চর্চা', 'আনন্দমঠ', বটকৃষ্ণ ঘোষ ও অতুলপ্রসাদ সেনের সাহিত্য সাধক চরিত গ্রন্থের মুদ্রণকার্য চলিতেছে। প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পর্কে সাহিত্য সাধক চরিত লিখিবারও দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে।

পরিষদের আর্থিক সংকট ও ন্যাসরক্ষকদের সুপারিশ

সুদীর্ঘ নব্বই বৎসরের বাঙালীর সর্বাপেক্ষা প্রিয় সারস্বত প্রতিষ্ঠান বর্তমানে চরম আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে। গত ১৩৮৮ বঙ্গাব্দে পরিষদের ১,৩০, ৪৭১.৮১ (এক লক্ষ ত্রিশ হাজার চারিশত একাত্তর টাকা একাশি পয়সা) ঘাটতি হইয়াছে। ১৩৮৯ বঙ্গাব্দে ঝাড়গ্রাম লালগোলার তহবিল হইতে ১২,৭৫০.৭৮, রামকমল সিংহ স্মৃতি তহবিল হইতে ১৭,০০০.০০ ও সুধাংশু বালা স্মৃতি তহবিল হইতে ২০০০.০০ মোট ৩১,৭৫০.৭৮। (একত্রিশ হাজার সাতশত পঞ্চাশ টাকা আটাত্তর পয়সা) ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে।

গত ৩রা আষাঢ় ন্যাসরক্ষক সমিতি এক অধিবেশনে এই আর্থিক সঙ্কটের জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। পরিষদের ব্যয় সংকুলানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিশেষ করিয়া প্রধানমন্ত্রীর নিকটে প'চিশ লক্ষ টাকার একটি এককালীন অনুদানের জন্য আবেদনের সুপারিশ করিয়াছেন। যাহাতে এই টাকা স্থায়ী আমানতে জমা রাখিয়া তাহার প্রাপ্ত সুদ হইতে পরিষদের ব্যয় সংকুলান করা যায়।

R. N. 41097/81

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস কর্তৃক প্রকাশিত ও
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স ৫৭-এ, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন কলি-৬ হইতে শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত
মূল্য : চারি টাকা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

৯০তম বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা ॥
আশ্বিন
১৩৯০

পত্রিকাধ্যক্ষ
শ্রীসরোজমোহন মিত্র

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৭০০০০৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

৯০তম বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা
আশ্বিন
১৩৯০

পত্রিকাধ্যক্ষ
শ্রীসরোজমোহন মিত্র

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচীপত্র

বাংলায় প্রকাশিত বৈষ্ণব সাময়িক পত্রিকা

একটি তথ্য নির্দেশিকা সূচী

টোনি কে. ষ্টুয়ার্ট / হেনা বসু

বৈষ্ণব ধর্ম সম্পর্কিত বিভিন্ন বাংলা সাময়িক পত্রিকা বিগত এক শতাব্দীরও বেশী ধরে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। এ বিষয়ে তথ্য অনুসন্ধান করার এক প্রচেষ্টায় মোট ১২২টি পত্রিকা সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করা সম্ভব হয়েছে। সর্বমোট সংখ্যা হিসেবে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজে এবং ধর্মপ্রাণ জনগণের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম যে কী গভীরভাবে প্রসার লাভ করেছিল এটি তারই সাক্ষ্য বহন করে। ত্রিশের দশকে কোন কোন বৈষ্ণব গবেষক বৈষ্ণবধর্ম সম্পর্কিত এই ধরনের সাময়িক পত্রিকার তালিকা প্রস্তুত করার প্রথম প্রয়াস করেন। অসম্পূর্ণতা এবং নির্ভরশীল তথ্যের ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও ওই তালিকাগুলির কাঠামোতেই বর্তমান প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত তালিকার তথ্য সাজানো হয়েছে। গত বেশ কয়েক দশকের মধ্যে বৈষ্ণব সাময়িক পত্রিকা সম্বন্ধে সুষ্ঠুভাবে তথ্য অনুসন্ধানের এবং প্রকাশের কোনও প্রচেষ্টা এ পর্যন্ত আমাদের নজরে পড়ে নি।

সাময়িক পত্রিকা সংক্রান্ত তথ্য আহরণ এবং আহৃত তথ্য যতদূর সম্ভব নির্ভুল করার প্রয়াসে আমরা প্রভূত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে এবং বিভিন্ন ব্যক্তিগত সংগ্রহে অল্পসংখ্যক যে কয়টি পত্রিকা পাওয়া গেছে সেগুলি হয় একটি ধারাবাহিক প্রকাশনার কতকগুলি বিচ্ছিন্ন সংখ্যা নতুবা কতকগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সংখ্যা মাত্র। কলকাতার প্রধান প্রধান সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে এবং বিভিন্ন ব্যক্তিগত সংগ্রহে ১৯৮২ সালে সুনির্দিষ্টভাবে অনুসন্ধান করে বর্তমান প্রবন্ধে সংগৃহীত তথ্য-নির্ঘণ্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে। বেশ কয়েকজন ব্যক্তি চিঠিপত্রে অথবা ব্যক্তিগতভাবে মূল্যবান তথ্য এবং উপদেশ সরবরাহ করে আমাদের প্রয়াসে উৎসাহ জানিয়েছেন। তাঁদের প্রতি আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রায় অর্ধেক সংখ্যক পত্রিকার কোনও সংখ্যাই আমরা হাতে পাইনি, তবে যেখানে সম্ভব হয়েছে আমরা পত্রিকার সংখ্যায় প্রাপ্ত তথ্যের সাথে আমাদের সংগৃহীত তথ্য পরীক্ষা করে নিয়েছি। যে প্রতীক চিহ্নগুলির সাহায্যে প্রতিটি পত্রিকার মুদ্রিত তথ্য-সূত্র এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য নির্দেশ করা হয়েছে সেগুলি নীচে ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়েছে। সাধারণভাবে প্রথম সম্পাদকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। দুইয়ের অধিক সম্পাদকের নাম থাকলে অথবা পরে সম্পাদকের নাম পরিবর্তিত হলেও প্রধানতঃ প্রথম সম্পাদক / দ্বয়ের নামই রাখা হয়েছে। পত্রিকার প্রকাশের বর্ষও সর্বক্ষেত্রেই প্রথম প্রকাশের বর্ষ ধরা হয়েছে। অধিকাংশ পত্রিকার প্রকাশের সূচনা ও সমাপ্তিকাল সম্পর্কে কোনও তথ্যই পাওয়া যায়নি। বাংলা ছাড়া অসমীয়া, ইংরাজী, ওড়িয়া ও হিন্দীভাষাতে বহু সাময়িক-পত্রিকা প্রকাশিত হলেও সেগুলিকে আমাদের তালিকাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

---

* (টোনি কে. ষ্টুয়ার্ট এম. এ· (১৯৮১) বি· এ. (১৯৭৬) শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশীয় ভাষা ও সভ্যতা বিভাগের রিসার্চ ফেলো।)

এই জাতীয় তথ্য আহরণের কাজ কখনই যথেষ্টভাবে সম্পূর্ণ হয় না। আমাদের প্রদত্ত তালিকাটি অন্যান্যদের এই কাজে অগ্রণী হবার জন্য একটি নির্দেশিকার ভূমিকা পালন করবে মাত্র। আমরা আশা রাখি ভবিষ্যতে অন্যান্য গবেষক প্রচেষ্টা করবেন যাতে এই তথ্য সংগ্রহের কাজ আরও সময়োপযোগী এবং বিস্তৃত হয়। সাময়িক-পত্রিকাগুলিকে তথ্যানুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করা সংক্রান্ত যে কোনও ত্রুটির জন্য লেখক-লেখিকা দায়ী থাকবেন।

প্রতীকচিহ্নগুলির ব্যাখ্যা : মুদ্রিত তথ্য-সূত্র (বর্ণানুক্রমিক)

(ক) গোস্বামী, হরিদাস। শ্রীবৈষ্ণব পত্রিকার দুরবস্থা। **শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ**। ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৩৩০, ২০৩-২০৫ পৃঃ

(খ) গোস্বামী, হরিদাস। অকালে কালকবলিত শ্রীবৈষ্ণব পত্রিকার তালিকা। **শ্রীশ্রী-বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ**। ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৩৩০, ২১ পৃঃ।

(গ) দাস, হরিদাস। প্রকাশিত বৈষ্ণব পত্রিকার নাম, সম্পাদক ও আবির্ভাবকালাদি। পরিশিষ্ট গ। **শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য**। নবদ্বীপ, হরিবোল কুটীর ৪৬২ গৌরাব্দ। ৫-৭ পৃ.

(ঘ) বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, **বাংলা সাময়িক পত্র** : ১২২৫-১২৭৪ (১৮১৮-১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দ)। ১ম খণ্ড। কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ।

(ঙ) বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ। **বাংলা সাময়িক পত্র** : ১২৭৫-১৩০৭ (১৮৬৮-১৯০০ খ্রীস্টাব্দ)। ২য় খণ্ড। কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ।

(চ) মজুমদার, বিমান বিহারী। বৈষ্ণব সাময়িক পত্রিকার ইতিহাস ও সংগ্রহ। পরিশিষ্ট চ। **শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান**। কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়, ১৯৩৯, ১১৩-১১৯ পৃ.।

(ছ) রায়, যতীন্দ্রনাথ। শ্রীবৈষ্ণব পত্রিকা সম্বন্ধে আলোচনা ও নিবেদন। **শ্রীশ্রী-শ্যামসুন্দর**। ১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৩৯, ৪২৫-৪২৭ পৃ.।

(জ) অধিকারী, কানাইলাল। অধ্যাপক বৈষ্ণবদর্শন। গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ, নবদ্বীপ। ব্যক্তিগত পত্রবিনিময়ে যোগাযোগ।

পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য শ্রেণী-বিভাগের সংকেত চিহ্নের ব্যাখ্যা।

১। ভক্তি ভাব সূচক—প্রধানতঃ সাধারণ পাঠকের বোধগম্য করে লেখা এবং লেখার মধ্যে ভক্তি ভাব প্রকাশের বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

২। শিক্ষামূলক-গৃহস্থ ভক্তের উপযোগী শিক্ষামূলক রচনা এবং ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় বিষয়ে প্রযোজ্য সাধারণ উপদেশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩। গবেষণামূলক—শিক্ষিত সমাজের বিশিষ্ট অংশের উপযোগী গবেষণামূলক প্রবন্ধ, সম্পাদকীয় সমালোচনা ইত্যাদি।

৪। মূল গ্রন্থ মুদ্রণ—বৈষ্ণব ধর্ম আন্দোলন সংশ্লিষ্ট মূল গ্রন্থ বাংলা সংস্কৃত অথবা অনূদিত আকারে মুদ্রণ করা।

৫। সম্পূর্ণভাবে বৈষ্ণব পত্রিকা নয়—যে সমস্ত পত্রিকার অধিকাংশ রচনাই বৈষ্ণবধর্ম বিষয়ে অথচ কিছু কিছু অন্যান্য রচনা আছে যেগুলি বৈষ্ণব ধর্ম সংশ্লিষ্ট নয়।

কতদিন অন্তর প্রকাশিত হয় : দৈ. দৈনিক। সা. সাপ্তাহিক। পা. পাক্ষিক দ্বি. দ্বিমাসিক। ত্রৈ. ত্রৈমাসিক। ষা. ষান্মাসিক। বা. বার্ষিক। মা. মাসিক।

অন্যান্য সংকেত চিহ্ন : * বর্তমানে প্রকাশিত হচ্ছে। + যে পত্রিকাগুলি আমরা নিজেরা পরীক্ষা করেছি। ? সন্দেহজনক তথ্য অথবা আমাদের অনুমান।

পত্রিকার তথ্য-নির্ঘণ্টটি বর্ণানুক্রমে নিম্নলিখিতভাবে সাজানো হয়েছে। পত্রিকার নাম, তথ্য, সূত্র।

সম্পাদক। প্রকাশের স্থান। প্রকাশের বর্ষ। কতদিন অন্তর প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত তথ্যের শ্রেণীবিভাগ। মন্তব্য।

অঙ্গন (শ্রী)। ছ: ফরিদপুর। ত্রৈ।

অদ্বয়তত্ব প্রদর্শিকা পত্রিকা। ঘ: দ্বারকানাথ হোড় ও মধুসূদন সরকার। কলিকাতা। ১২৬৩। মা। অনিয়মিত প্রকাশিত।

+ **আঙ্গিনা**। চ: মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। ফরিদপুর। ১৩৩৭। ত্রৈ। ১, ২। প্রধানতঃ প্রভু জগদ্বন্ধু সম্পর্কিত রচনা।

আচার্য্য। খ, গ, চ: মদনগোপাল গোস্বামী ও শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪।

আচার্য্য পাক্ষিক। ক, গ, চ: বালকৃষ্ণ গোস্বামী। বৃন্দাবন। ৪২৮ গৌরাব্দ। পা। ক: এক বৎসর মাত্র প্রকাশিত হয়। গঃ হিন্দী প্রকাশনা (?)

+ **আনন্দ**। ক, গ, চ: মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। সাথুয়াই, ময়মনসিংহ। ১৩২১। মা। ১, ৩। কঃ এক বৎসর মাত্র প্রকাশিত হয়।

* + **উজ্জীবন :** যতীন্দ্র রামানুজ দাস। খড়দহ। ১৩৬১। মা। ১, ২, ৩। শ্রীবৈষ্ণব প্রকাশনা।

* + **একচক্রা-সুধাকর :** জীবশরণ দাস বাবাজী। বীরচন্দ্রপুর, বীরভূম। ১৩৮০। বা। ১, ২, ৩, ৪। প্রধানতঃ নিত্যানন্দ বিষয়ক রচনা।

* **কল্যাণ**। জ: হনুমান প্রসাদ পোদ্দার। গোরক্ষপুর। ১৯২৬। গীতা প্রেস।

* + **কীর্তনীয় : সদাহরি :** ভক্তিসর্বস্ব গিরি মহারাজ। বোলপুর, বীরভূম। ১৩৮৮। মা। ১, ২,। শ্রী সনাতন ধর্ম সারস্বত গৌড়ীয় আশ্রম।

+ **কৃষ্ণ (শ্রী)**। ক, গ, চ: ক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। কলিকাতা। ১৩২৯। সা। ২, ৫। ক: দেড় বৎসর প্রকাশিত হয়।

কৃষ্ণ চৈতন্য (শ্রী)। গ: নীলমণি গোস্বামী। ১৩১০। গঃ একই নামের হিন্দী সাময়িক পত্রিকা উল্লিখিত কিন্তু অন্যান্য তথ্য পৃথক।

+ **কৃষ্ণ চৈতন্য তত্ব প্রচারক (শ্রী শ্রী)**। গ, চ: প্রিয়নাথ নন্দী। কলিকাতা। ১৩২১। মা। ২, ৩, ৪। শ্রী শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য তত্ব প্রচারিণী সভা।

কৃষ্ণ চৈতন্য প্রচারিণী (শ্রী)। ছ: কলিকাতা।

* + **কৃষ্ণায়ণ :** ধীরেন্দ্রলাল ঘোষ। কলিকাতা। ১৩৮৪। মা। ২, ৪। হিন্দু মিশন প্রকাশনা।

গুরুদর্পণ। ছ

গৌড়ভূমি (শ্রী শ্রী)। ক, গ, চ। রামপ্রসন্ন ঘোষ। গোকর্ণ। ৪২৪ গৌরাব্দ। মা। খঃ দুই বৎসর প্রকাশিত হয়; চঃ কাশিমবাজারের মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হয়।

+**গৌড়ীয়**। গ, চ। হরিপদ বিদ্যারত্ন ও অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতা। ১৩২৯। সা। ১, ২, ৫। গৌড়ীয় মঠ; পাক্ষিক গৌড়ীয় দ্রষ্টব্য।

* +**গৌড়ীয়**। ভক্তি কুসুম ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রমণ মহারাজ। মায়াপুর, নদীয়া, ১৩৫৪। মা। ১, ২। গৌড়ীয় মঠ।

+**গৌড়ীয় দর্শন** (শ্রী)। ভক্তি কমল মধুসূদন মহারাজ ও ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজ। কোলারগঞ্জ, নদীয়া। ১৯৫৪। মা। ১, ২, ৩। শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ।

*+**গৌড়ীয় পত্রিকা**। (শ্রী) মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী। চুঁচুঁড়া ও নবদ্বীপ। ১৯৪৯। মা। ১, ২, ৩, ৪। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ; ১৯৬০ সাল থেকে নবদ্বীপ হতে প্রকাশিত।

*+**গৌড়ীয় বৈষ্ণববাণী**। গোরাচাঁদ ভট্টাচার্য। নদীয়া। ১৩৮৫। মা। ১, ২, ৩, ৪।

গৌড়েশ্বর। ক ১৩৪৪।

গৌড়েশ্বর বৈষ্ণব (শ্রী)। গ, ঙ, চ ললিতমোহন গোস্বামী। বৃন্দাবন। ১৩০৬। মা। গঃ সম্পাদক রাধিকামোহন গোস্বামী।

গৌরবিষ্ণু (শ্রীশ্রী)। ছ কলিকাতা।

গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া। গ, চ। ললিতমোহন গোস্বামী। ১৩০৭। গঃ ১৩০৬।

+**গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা** (শ্রীশ্রী)। গৌরভক্তগণ। কলিকাতা। ৪১৬ গৌরাব্দ। ২, ৩, ৪। 'গৌর বিষ্ণুপ্রিয়া' এবং এই পত্রিকা একই (?)

*+**গৌরাঙ্গ** (শ্রী)। নটরাজ ভাই, শ্রীভূমি, কলিকাতা। ১৩৮০। দ্বি।

গৌরাঙ্গ (শ্রী)। জ। ব্রজভূষণ দাস। কাশী।

+**গৌরাঙ্গ পত্রিকা** (শ্রী)। গ, চ। যতীন্দ্র চন্দ্র মিত্র। কলিকাতা। ১৩০৭। মা। ১, ২, ৩। শাখা শ্রীগৌরাঙ্গ সমাজ।

+**গৌরাঙ্গ পত্রিকা** (শ্রী)। খ, গ, চ যোগেন্দ্রমোহন ঘোষ। সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম। ৪২৩ গৌরাব্দ। মা। ১, ২।

+**গৌরাঙ্গ প্রিয়া পত্রিকা**। গ, চ। কুঞ্জলাল গোস্বামী। নবদ্বীপ। ১৩৩০। মা। ১, ২, ৩। শ্রীশ্রীগুপ্ত বৃন্দাবন পঞ্চতত্ত্বের মন্দির।

+**গৌরাঙ্গ মাধুরী** (শ্রীশ্রী)। ক, গ। রাখালানন্দ ঠাকুর। শ্রীখণ্ড, বর্ধমান। ১৩৩৪। মা। ১, ২, ৩, ৪।

+**গৌরাঙ্গ সেবক** (শ্রী)। গ, চ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ। ১৯১১। মা। ২, ৩, ৪।

চৈতন্য (শ্রী)। গ, নরহরি দাস। ১৩০২।

চৈতন্য পত্রিকা (শ্রী)। ঙ, ছ। সুশীলকৃষ্ণ গোস্বামী। ১৩০৬। মা।

চৈতন্যকীর্তি কৌমুদী পত্রিকা (শ্রী)। গ, ঘ। বৈষ্ণব চরণ দাস। কলিকাতা। ১২৬৮।

চৈতন্য চন্দ্রিকা (শ্রী)। ক, চ। রাধাচরণ গোস্বামী। বৃন্দাবন। ৪২৬ গৌরাব্দ। মা। কঃ তিন বৎসর প্রকাশিত হয়।

* **+চৈতন্যবাণী** (শ্রী)। ত্রিদণ্ডীস্বামী ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ। কলিকাতা। ১৩৬৬। মা। ১, ২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

চৈতন্যমত বোধিনী (শ্রী)। ক, ঙ, চ। রাধিকা প্রসাদ ভাগবত রত্নাকর ও শরৎচন্দ্র তপস্বী। কালনা, বর্ধমান। ১২৯৯। মা। ২, ৩। কঃ সম্পাদক নীলমণি গোস্বামী, প্রকাশ স্থান বৃন্দাবন (?) ; দুই বৎসর প্রকাশিত হয়।

***+চৈতন্য স্মরণিকা** (শ্রীশ্রী)। কানাইলাল পান, জগদীশচন্দ্র রায়, অনিল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও মদনমোহন শাস্ত্রী। কালনা, বর্ধমান। ১৩৮৯। ত্রৈ। ১, ২। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবর্ষ আবির্ভাব উদযাপন সমিতি, কালনাঞ্চল শাখা।

***+জয়গৌর**। আশুতোষ দাশ। বিরাটী, কলিকাতা। ১৩৭৭। মা। ১, ২, ৩, ৪। শ্রীকৃষ্ণগোপাল জীউর মন্দির।

+দাদা ও শ্রীমা (শ্রী)। গ। প্যারীলাল রায়। বরিশাল। ১৩৪৯। মা। ১, ২, ৩।

+নদীয়া প্রকাশ। গ। প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী। মায়াপুর, নদীয়া। ১৩৩১। দৈ। ১, ২। শ্রীচৈতন্য মঠ।

নবদ্বীপ। গ। গোপেন্দু সাংখ্যতীর্থ ১৩৩৬। পা।

* **+নবদ্বীপ প্রদীপ**। জ। ভগবান দাস ও কানাইলাল অধিকারী। নবদ্বীপ। ১৩৬৭। ত্রৈ ৩, ৪। ভাগবতধর্ম পরিষদ।

* **+নিতাই সুন্দর (শ্রীশ্রী)**। গ। গৌরাঙ্গ দাস। বরাহনগর, কলিকাতা। ১৩৪২। মা। শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম। বর্তমান সংখ্যার বর্ষের সাথে গঃ উল্লিখিত বর্ষের ১২ বৎসরের তফাৎ (?)।

নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা। ঘ। নন্দকুমার কবিরত্ন। কলিকাতা। ১৮৪৩। পা, মা। ২, ৩, ৫। শুরুতে পাক্ষিক এবং ১২৬৩ বঙ্গাব্দ থেকে মাসিক।

নিত্যানন্দ দায়িনী পত্রিকা। গ, ঙ, চ রাধাবিনোদ দাস। কলিকাতা। ১২৭৭। ত্রৈ। ৩, ৪। নিত্যানন্দদায়িনী সভা।

+নিত্যানন্দ সেবক (শ্রী)। ক, গ, চ। অবিনাশচন্দ্র কাব্যপুরাণতীর্থ। সন্ন্যাসীডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ। ১৩২০। মা। ১, ২, ৩, ৪। হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা।

নিবেদন। খ, গ, চ। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পুত্রগণ। ১৩১০। পা।

***+পল্লীবাসী**। গ, ঙ, চ। শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কালনা, বর্ধমান। ১৩০৪। সা। ১, ২, ৩।

+পাক্ষিক গৌড়ীয়। সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ। কলিকাতা। ১৩৪৪। পা। ১, ২, ৩। গৌড়ীয় মঠ।

+পার্থ সারথি। প্রীতিকুমার ঘোষ। কলিকাতা। ১৩৬৬। ২, ৩, ৫।

পূর্ণিমা। গ, চ। শশিভূষণ হোম চৌধুরী। আটঘরিয়া, ময়মনসিংহ। ১৩৩৫।

+প্রভু শ্যামানন্দ। জ। গোপাল গোবিন্দানন্দ দেব গোস্বামী। গোপীবল্লভপুর, মেদিনীপুর। ১৩৭৭।

প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ। ঙ। সারদা চরণ মিত্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও বরদাকান্ত মিত্র। চুঁচুঁড়া। ১২৮১। মা। ৩, ৪।

+প্রাণ গৌর। প্রাণকিশোর গোস্বামী। কলিকাতা। ১৯৫৫। ত্রৈ। ২, ৩।

প্রেমপুষ্প। খ, গ, চ। রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ ও গোবর্ধন লাল গোস্বামী। কলিকাতা। ১৩২৫। মা।

প্রেমপ্রচারিণী। গ, ঙ, চ। দীনবন্ধু সেন। বারাকপুর, নবাবগঞ্জ। ১২৮৯। পা।

প্রেমপ্রবাহিনী। ছ। 'প্রেমপ্রচারিনী' এবং এই পত্রিকা কি একই (?)।

বল্লভীয় সুধা। জ। দ্বারিকাদাস পরীখ। মথুরা।

বাসুদেব। জ। অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য। সুখচর, ২৪-পরগণা। ১৩৬৬।

+বিশ্ববন্ধু। ক, গ, চ। বিধুভূষণ সরকার। বাসণ্ডা, বরিশাল। ৪৩৩ গৌরাব্দ। মা। ২, ৩, ৪।

বিশ্বরূপ। গ। রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ। ১৩৪৯।

বিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকা (শ্রীশ্রী)। গ, ছ। শিশিরকুমার ঘোষ। ১৩০৬। মা। ২, ৩।

+বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ (শ্রীশ্রী)। গ, চ। হরিদাস গোস্বামী। নবদ্বীপ। ১৩২৯। মা। ২, ৩, ৪। আরও অনেকে সম্পাদক ছিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা (শ্রীশ্রী)। ক, গ, ঙ, চ, ছ। রাধিকানাথ গোস্বামী ও কেদারনাথ দত্ত। কলিকাতা। ১২৯৮। পা, মা। ৩, ৪। সম্পাদকের নাম বিভিন্ন। প্রথমে পাক্ষিক পরে মাসিক।

বীরভূমি। গ, ঘ নীলরতন মুখোপাধ্যায়। বীরভূম। ১৩০৬। মা।

+বীরভূমি (নূতন সং)। গ, চ। কুলদাপ্রসাদ মল্লিক। কলিকাতা। মা, ৩, ৪।

বৈষ্ণব। ঘ। কালিদাস নাথ। ৪০০ গৌরাব্দ। জহরিলাল দাস সম্পাদিত **বৈষ্ণব** এবং এই পত্রিকা কি একই (?)।

+বৈষ্ণব। গ, চ। জহরিলাল দাস। কলিকাতা। ১২৯৩। মা। ২, ৩, ৪। এই পত্রিকা এবং কালিদাস নাথ সম্পাদিত **বৈষ্ণব** কি একই (?)।

বৈষ্ণব। চ। রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ। ১৩৩৬। দ্বি।

বৈষ্ণব (শ্রী)। গ। শক্তিভূষণ ভট্টাচার্য। ১৩২৮।

বৈষ্ণব ধর্মপ্রচার (শ্রী)। ক, গ, চ। কৃষ্ণহরি গোস্বামী প্রভু। মানকর, বর্ধমান। ১৩১৮। মা।

বৈষ্ণব প্রতিভা। ছ

+বৈষ্ণব সঙ্গিনী (শ্রী)। গ, চ। মধুসূদন দাস অধিকারী। এলাটী, হুগলী। ১৩১০। ত্রৈ। মা। ৩, ৪। পঞ্চম বর্ষ থেকে পত্রিকার নাম হয় '**ভক্তিপ্রভা**'।

বৈষ্ণব সন্দর্ভ। খ, গ, চ। নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী। বৃন্দাবন। ১৩১০। মা। ৩, ৪।

বৈষ্ণব সমাজ। খ, গ, চ। রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ ও বিশ্বম্ভরানন্দদেব গোস্বামী। ১৩২৪। মা।

+**বৈষ্ণব সেবিকা** (শ্রী)। ক, গ, চ। বৈষ্ণব জাতীয় সম্মিলনী। কলিকাতা। ১৯১১। মা। ১, ২।

+**ব্রহ্মবিদ্যা**। কুলদাপ্রসাদ মল্লিক। কলিকাতা। ১৩৪০। মা। ৩, ৫।

*__ভক্ত ভগীরথ__। জ। রামদাস শাস্ত্রী। বৃন্দাবন।

+**ভক্তি**। গ, চ। দীনবন্ধু বেদান্তরত্ন। হাওড়া। ১৩০৯। মা। ১, ২।

*+**ভক্তিপত্র** (শ্রী)। ত্রিদণ্ডীস্বামী ভক্তিভূষণ ভারতী। কলিকাতা। ১৩৬৯। ত্রৈ। ১, ২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার।

+**ভক্তিপ্রভা** (শ্রী)। গ। সত্যানন্দ গোস্বামী। আলাটী, হুগলী। ১৩১১। মা। ২।

+**ভক্তিলতা**। গ, চ। গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ। হাওড়া। ১৩৩৫। মা। ৩, ৪। গিরিধারী মঠ।

ভক্তিসূচক। ঘ। ১৮৩৫। সা।

*+**ভগবৎদর্শন**। ত্রিদণ্ডীভিক্ষু ভক্তিচারু স্বামী। মায়াপুর, কলিকাতা। ১৯৭৭। মা। ১, ২, ৪। ইস্‌কন।

ভাগবতীবিদ্যা। গ। গৌরগোপাল শাস্ত্রী। নবদ্বীপ। ১৩৪৬।

মহাউদ্ধারণ। গ, চ। নবদ্বীপ চন্দ্র ঘোষ। ঢাকা। ১৩৩১।

+**মাধুকরী**। চ। ভূষণচন্দ্র দাস ও হেমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী। বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। ১৩২৯। মা। ২, ৩, ৪।

*+**মুরলীমাধুরী** (শ্রীশ্রী)। বিশ্বনাথ ব্যানার্জী। বরাহনগর। ১৩৮২। ষা।

রসরাজ। গ। হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ১৩৩৫।

শুদ্ধাদ্বৈত ভক্তিমার্তণ্ড। জ। আমেদাবাদ।

*+**শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী**। কিশোরী দাস বাবাজী। হালিশহর, ২৪-পরগণা, ১৩৮২। ষা। ৪। নিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম।

শ্রেয়ঃ। জ। ইন্দ্রব্রহ্মচারী। বৃন্দাবন। ৪৪৯ গৌরাব্দ।

+**শ্যামসুন্দর** (শ্রী শ্রী) গ, চ। শ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরী। কলিকাতা। মা। ৩, ৪।

+**শ্যামসুন্দর পত্রিকা** (শ্রীশ্রী)। অনাদিমোহন গোস্বামী। কাটোয়া, বর্ধমান। ১৩৭২। ১, ২, ৩।

+**সঙ্কর্ষণ**। জ। প্রাণকিশোর গোস্বামী। কলিকাতা। ১৯৫০। ত্রৈ। কাশীনাথ মল্লিক ভাগবত বিদ্যালয় পত্রিকা।

সজ্জিনী। গ, ঙ। ভক্তি বিনোদ ঠাকুর। ১৩০৫। সজ্জনতোষনী পত্রিকার সাথে সংশ্লিষ্ট।

+**সজ্জনতোষনী**। গ, ঙ, চ। কেদারনাথ দত্ত। কলিকাতা। ১৮৮৪। মা। ২, ৩।

*+**সজ্জনসজ্জিনী**। গ। ললিতাপ্রসাদ ঠাকুর। বীরনগর, নদীয়া। ১৩৪১। মা। ১,

২, ৩, ৪। সাউরী প্রপন্নাশ্রমস্থিত শ্রী শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য শিক্ষা প্রচারিণী সভা। বিভিন্ন সম্পাদক।

+**সজ্জন সেবক**। গ, চ। সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রাজাজীবনপুর, মেদিনীপুর। ১৩৩৩। মা। ১, ২, ৩।

সনাতন ধর্মকথা। গ, ঙ। কালীকুমার দত্ত। ১৩০৩।

সনাতনী। গ। কৃষ্ণকিশোর চৌধুরী। ১৩০৩।

+**সমাজ**। রাধাগোবিন্দ নাথ। কলিকাতা। ১৩১৬। মা। ২, ৩।

*+**সরস্বতী**। সত্যদাস মংগল। কলিকাতা। ১৯৮২। ষা। ২, ৩, ৪।

সাত্বত পত্রিকা। গ। দেবেন্দ্রনাথ দাস অধিকারী। ১৩৩৫। ১, ২।

+**সাধনা**। গ, চ। রাধাগোবিন্দ নাথ। কুমিল্লা। ১৩৩৩। মা। ৩।

সাম্বৎসরিক সংবাদ পত্রিকা। ঘ। বেহালা, কলিকাতা। ১২৬৩। বা। হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বেহালা।

+**সারস্বত গৌড়ীয়**। ললিতমাধব দাসাধিকারী। দিল্লী। ১৩৫৭। মা। ১, ২।

*+**সুদর্শন (শ্রী)**। সুরেশ্বর দাস। কলিকাতা। নদীয়া। ১৩৪৩। ত্রৈ। ১, ২।

***সুবর্ণরেখা**। জ। মধুপ দে। গোপীবল্লভপুর। ১৩৮৭। ১, ২, ৩।

+**সেবা**। গ, চ। যোগেন্দ্র মোহন ঘোষ। ঢাকা। ১৩২৫। মা। ১, ২, ৩, ৪।

*+**সোনার গৌরাঙ্গ (শ্রীশ্রী)**। গ, চ। যোগেন্দ্র নাথ দেব। শ্রীহট্ট। আসাম। ১৩৩০। মা। ১, ২, ৩, ৪।

হরিদাস। খ, গ, চ। গোবিন্দ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সৈদাবাদ, মুর্শিদাবাদ। ১৩২১।

***হরিসংকীর্তন**। জ। ফকির মোহন দাস সাহিত্যাচার্য। বারিপদা ও কটক। ১৯৬৪।

***হরিনাম সংকীর্তন (শ্রী)**। জ। শ্যামলাল হাকিম। বৃন্দাবন।

হরিভক্তি। ঙ। শ্যামাচরণ কবিরত্ন। ১৩০৬।

হরিভক্তি তত্ত্ব। ঙ। দাস হরিচরণ বন্ধু। সয়দাবাদ, বহরমপুর। ১২৯৫। মা।

হরিভরসা। ছ।

হিন্দু-সুহৃদ। ঙ। শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্ত বাচস্পতি। কলিকাতা। ১৩০০। মা। হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, বাগবাজার।

'প্রেমতরঙ্গিণী'-বিষয়ক প্রতিষ্ঠিত তথ্যগুলি কি যথেষ্ট প্রামাণিক ?

শ্রীআশিস রায়

ভাগবতাচার্য রঘুনাথের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী' ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি অসাধারণ অনুবাদ-কাব্য। প্রাক্ চৈতন্যযুগ থেকে বাংলাভাষায় ভাগবত-অনুসারী যত কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য লেখা হয়েছিল মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যই তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। চৈতন্যোত্তর পদাবলী সাহিত্যের বিপুল ভাবৈশ্বর্যের যুগে সাহিত্যের অন্যান্য শাখাগুলি যখন কিছুটা নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে তখনও এই কাব্যটি অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত অগণিত বাঙ্গালী ভক্ত পাঠকের চিত্তে আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিল। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের পর ষোড়শ শতাব্দীর অনুবাদ শাখায় বেশ কিছু ভাগবতানুসারী কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে ভাগবতাচার্য রঘুনাথের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর নামই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক এ যাবৎ প্রাপ্ত পুঁথিগুলির বিচারে বলা যায়, প্রেমতরঙ্গিণীই চৈতন্যোত্তর যুগে রচিত ভাগবতের প্রথম সম্পূর্ণ অনুবাদ। এদিক থেকে গ্রন্থটির যথেষ্ট ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। এছাড়া এই কাব্যে ভাগবতের ভাসা-ভাসা অনুবাদমাত্র নয়, গ্রন্থটিতে চৈতন্য-পরিকর রঘুনাথের যথার্থ পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের দুর্লভ সমন্বয় ঘটেছিল। একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রেমতরঙ্গিণী ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের একটি মূল্যবান গ্রন্থ।

প্রাচীন ও অর্বাচীন পুঁথির সাহায্যে প্রেমতরঙ্গিণীর একাধিক সংস্করণ এ পর্যন্ত মুদ্রিত হয়েছে। ১৩১২ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এবং ১৩১৭ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গবাসী' কর্তৃক কাব্যটির মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় পরবর্তীকালে শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও শ্রীচৈতন্যরিসার্চ-ইনস্টিটিউট্ থেকে আরও দুটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছিল।

পুঁথি এবং এই সব মুদ্রিত সংস্করণের সাহায্যে প্রেমতরঙ্গিণীর ঐতিহাসিক গবেষণাও কিছু হয়েছে। এই সব গবেষণার ফলে প্রেমতরঙ্গিণী বিষয়ে এমন সব তথ্য পাওয়া গেছে যেগুলি মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের উপাদান হিসাবে অত্যন্ত মূল্যবান।

তবুও মনে হয় প্রেমতরঙ্গিণীর মতো উচ্চাঙ্গের একটি অনুবাদ কাব্যের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আজও হয়নি। কাব্যটির প্রকৃত মূল্যায়ন এখনও অসম্পূর্ণ আছে। অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে প্রেমতরঙ্গিণী বিষয়ে এ পর্যন্ত বেশ কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে কিন্তু ঐ সঙ্গে এমনও কিছু কিছু তথ্য সাহিত্যের ইতিহাসে পাওয়া গেছে যেগুলির পুনর্বিচার বাঞ্ছনীয়। প্রাপ্ত তথ্যগুলির পুনর্বিচার, নূতন তথ্যানুসন্ধান এবং সর্বোপরি পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ষোড়শ শতাব্দীর এই সুপ্রাচীন মূল্যবান কাব্যটির প্রকৃত রূপ ও স্বরূপ নির্ণীত হওয়া প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে প্রেমতরঙ্গিণী বা ভাগবতানুসারী অন্যান্য কাব্য সম্পর্কে সাহিত্যের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত দু'একটি তথ্যের প্রামাণিকতা বিষয়ে অনুরাগীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত" ২য় খণ্ড (দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ—১৯৭১) গ্রন্থের ৭২৬ পৃষ্ঠায় ভাগবতাচার্যের রচনামাধুর্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

"একটু তথ্যপ্রিয়তা, সংস্কৃত পাণ্ডিত্য এবং মূলকে ঘনিষ্ঠতর অনুসরণের জন্য তাঁহার রচনারীতি কিছু গুরুভার মনে হইতে পারে। কিন্তু দুই এক স্থলে তাঁহার রচনামাধুর্য খুবই চমকপ্রদ হইয়াছে। কৃষ্ণের অদর্শনে গোপীদের বিলাপ উৎকৃষ্ট পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে :

তোমারে পড়িল মনে চাহি বৃন্দাবন পানে
ধ্যান করি ও রাঙ্গা চরণ।
ফুকরে কাঁদিতে নারি অনিমিখে পথ হেরি
যাবৎ না হয় দরশন॥
বুঝিতে না পারি মেনে নিদয় হইল কেনে
ওহে শ্যাম না কর চাতুরি।
ত্যজি সব পরিবার তুয়া পদ কৈল সার
কত দুঃখ দিবে হে মুরারি॥
যে ভজে তোমার পায় তার কি এ দশা হয়
গৃহধর্ম সকল পাসরে।
যেন কাঙালিনী হঞা পথে পথে ভ্রমাইয়া
ভিক্ষা মাগি খায় ঘরে ঘরে॥
কোথা আছ প্রাণকানু বাজাও মোহন বেণু
তবে বাঁচে গোপীর জীবন।
ক্ষণেক বিলম্ব দেখি শরীর বিকল সখি
কোথা কৃষ্ণ দেহ দরশন॥

ইহা তো বৈষ্ণব পদাবলীর মাথুর বেদনার যথার্থ সুর। রঘুনাথ পদাবলী রচনা করিলেও সার্থকতা লাভ করিতে পারিতেন।"

ভাগবতাচার্যের রচনারীতি সম্পর্কে গ্রন্থকারের এই প্রশংসা যথার্থ। মূলের ঘনিষ্ঠতর অনুসরণের জন্য প্রেমতরঙ্গিণীর তত্ত্বব্যাখ্যামূলক অংশগুলি যে কিছুটা গুরুভার—এই সিদ্ধান্তও যথাযথ। কিন্তু এই ত্রুটির দায়িত্ব রঘুনাথের তথ্যপ্রীতি ও সংস্কৃত পাণ্ডিত্যের উপর চাপিয়ে দিলে কবির প্রতি কিছু অবিচার করা হয় বলে মনে করি। মূলের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য নিয়ে বাংলাভাষায় ভাগবতের অনুবাদ রচনা করা এবং সেই অনুবাদকে কাব্যরসে মণ্ডিত করে তোলা-ই ভাগবতাচার্যের নিশ্চিত অভিপ্রায় ছিল। কাব্যের অসংখ্য ভণিতায় এই অভিপ্রায় সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। বলা বাহুল্য যে, বাঞ্ছিত বিষয়ে কবি সিদ্ধিলাভ করেছেন মুখ্যত তাঁর কবিত্বের জন্যই। সম্ভবত এই কারণেই ভাগবতাচার্যের কাব্য তত্ত্বের গুরুভারে কিছুটা শ্লথ হলেও রসমাধুর্যে উজ্জ্বল।

কিন্তু কিছু সংশয় আছে উপরি উদ্ধৃত "তোমারে পড়িল মনে" পদটি নিয়ে। পদটি কি প্রকৃতপক্ষে ভাগবতাচার্যের রচনা? নাকি অন্য কোন কবির সৃষ্টি যা কালক্রমে প্রেমতরঙ্গিণীর পুঁথিতে প্রবেশ করেছে? অর্থাৎ ঐ পদ কি মূলপাঠে আদৌ ছিল?

পদটি নিয়ে এই যে সংশয় তার নিশ্চিত নিরসন বোধকরি সম্ভব নয়; তবুও পদটিকে কাব্যে 'প্রক্ষিপ্ত' বলার পিছনে এমন কিছু কিছু ভাবনা আছে যেগুলি বিচারযোগ্য হতেও পারে।

প্রেমতরঙ্গিণীর প্রাচীনতম কোন পুঁথিতে "তোমারে পড়িল মনে" পদটি ছিল কিনা এখনও পর্যন্ত তা জানার উপায় নেই। তবে প্রাপ্ত পুঁথিগুলিতে পদটি যে সর্বত্র পাওয়া

যায়নি এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া গেছে। শ্রীগৌড়ীয় মঠ সংস্করণেও পদটি অনুপস্থিত। অনুমিত হয়, যে সব পুঁথির সাহায্যে ও মুদ্রিত সংস্করণগুলির সহায়তায় গৌড়ীয় মিশন কর্তৃক ১৯৪৫ সালে প্রেমতরঙ্গিণীর ১ম সংস্করণটি সম্পাদিত হয়, সেই সব পুঁথিতেও পদটি ছিল না।

উদ্ধৃত পদটির ভাব ও ভাষাভঙ্গী বিচারে মনে হয় এটি উত্তরকালের কোন কবির রচনা এবং কালক্রমে সেটি প্রেমতরঙ্গিণীর কোন কোন অর্বাচীন পুঁথিতে সংযুক্ত হয়ে গিয়েছিল। গায়েন বা কথকদের কল্যাণে বহু প্রাচীন রচনা যে পরবর্তীকালে নানাভাবে পরিবর্ধিত বা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল তার অজস্র প্রমাণ হাতে লেখা পুঁথির পাণ্ডুর পৃষ্ঠাগুলিতে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। সুতরাং প্রেমতরঙ্গিণীর মূলপাঠ পুঁথিগুলিতে অপরিবর্তিত অবস্থায় থেকে গেছে—এমন ধারণা যুক্তিসঙ্গত হবে না।

আলোচ্য পদটিকে 'প্রক্ষিপ্ত' বলার পিছনে আরও একটি কারণ আছে। শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে গোপীদের বিলাপ প্রেমতরঙ্গিণীর অন্যান্য পুঁথিগুলিতে পয়ারছন্দে রচিত হয়েছে। এই সব বিলাপোক্তির প্রকাশভঙ্গীতে ষোড়শ শতাব্দীর ভাষাবৈশিষ্ট্যই সুপ্রকাশিত। ১০ স্কন্ধের ৩১ অধ্যায়ে রাসলীলায় কৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর এবং ঐ স্কন্ধের ৪৭ অধ্যায়ে মথুরা-প্রবাসী কৃষ্ণের স্মৃতিমন্থনকালে গোপীদের বিলাপসূচক দুটি পদ বিষয় স্পষ্টতার জন্য এখানে যথাক্রমে উদ্ধৃত হচ্ছে :

১. আমি সব ব্রজনারী নিজ পরিজন।
প্রাণ রাখ প্রাণপতি দিঞা দরশন ॥

দরশন দিঞা যদি না রাখ পরাণ।
তিরিবধ হৈল হের দেখ বিদ্যমান ॥

অমৃত মধুর ভাষা মন্দ মৃদু হাস।
কুটিল কটাক্ষপাত লীলা পরিহাস ॥
ললিত চঞ্চল লীলা চলন চপল।
এ সব তোমার লীলা ধেয়ান মঙ্গল ॥
আমি সব মুগধী দেখিঞা এই লীলা।
দরশন দিঞা প্রাণ রাখ নন্দবালা ॥

২। হেন কৃষ্ণ গোপী পাসরিব কোন মনে।
সেই যমুনার জল সেই বৃন্দাবনে ॥

সেই পদ কমল দেখিঞা ভূমিতলে।
পাসরিলে দশগুণ অনুরাগ বাঢ়ে ॥
হে কৃষ্ণ হে রমানাথ দুঃখ বিনাশন।
হে গোবিন্দ ব্রজনাথ দুরিত খণ্ডন ॥
মজিল গোকুল কৃষ্ণ এ সোক সাগরে।
বারেক উদ্ধার প্রভু নিজ পরি করে ॥

পদ দুটির তুলনায় ত্রিপদীতে রচিত "তোমারে পড়িল মনে" পদটি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের বৈষ্ণব কবিতার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

প্রেমতরঙ্গিণীর অন্যত্র ত্রিপদীতে রচিত যে সব পদ আছে তার সঙ্গেও উক্ত পদটির ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীগত পার্থক্য সুস্পষ্ট। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১০ স্কন্ধের ২১ অধ্যায়ের গোপীগীতের কিছু অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে :

বৃন্দা বিপিনে শুনি	মধুর বাঁশীর ধ্বনি
ব্রজবধূ সব এক মেলে।
আকুল মদন বানে	বাহ্য কিছু নাহি জানে
কহে গুণ বর্ণিতে না পারে ॥
ইথেহধিক নাহি আর	আঁখির সফল তার
জে জে দেখে কৃষ্ণ মুখ জোতি।

চান্দ কোটি পরকাশ মন্দ সুধা মধু হাশ
কি সখি কহিব নারী জাতি ॥

শুন ২ সখি হের বেণু কোন তপ কৈল
সব গোপী করিয়া নৈরাশে।
হরিমুখ সুধানিধি পান করে নিরবধি
ধন্য বেণু জন্ম জেবা বংশে ॥ ইত্যাদি।

অবশ্য অনেক সময় এমনও হয়েছে যে, অত্যধিক জনপ্রিয়তার ফলেই প্রাচীন কবির জনপ্রিয় কোন রচনা যুগগত পরিবর্তনের মাধ্যমে তার মূলপাঠ থেকে বহু দূরবর্তী হয়ে গেছে। "গায়কের পর গায়ক, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় পাঠ বদলাইয়া চলিয়াছেন। সেই অনুসারে পুঁথিও বদলাইতেছে। সে পুঁথি সবই অনেক কবি গায়কের রচনায় স্ফীত।…এমন অবস্থায় বলিতে বাধ্য হইতেছি যে কৃত্তিবাসের কাব্যের যে-সব পুঁথি আমরা পাইয়াছি তাহাতে ভণিতা ছাড়া আর কিছু খাঁটি (অর্থাৎ মূলরচনা) অব্যাপন্ন রহিয়া যায় নাই।"—(বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। প্রথম খণ্ড। পূর্বার্ধ। পৃষ্ঠা ১২৬। ডঃ সুকুমার সেন।)

প্রেমতরঙ্গিণীর কোন গোপীবিলাপ বিষয়ক পদও যদি অত্যধিক জনপ্রিয়তার জন্যই "তোমারে পড়িল মনে" পদে রূপান্তরিত হয়ে গিয়ে থাকে তবে সেই পদের মূল পাঠটির স্বরূপসন্ধান আজ রীতিমতো দুঃসাধ্য।

ভাগবতাচার্যের রচনা আদ্যন্ত ভাগবত অনুগত। কৃষ্ণ অদর্শনে গোপীদের বিলাপেও ঐ আনুগত্য স্পষ্ট হয়ে আছে। কিছু কিছু পাঠান্তর সত্ত্বেও বিভিন্ন পুঁথিতে গোপীদের বিলাপ অংশেও ভাগবতাচার্যের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীরই প্রকাশ দেখা যায়। ভাগবতপুরাণের প্রায় আক্ষরিক অথচ কাব্যগুণসম্পন্ন অনুবাদ রচনা করার এক গূঢ় আকাঙ্ক্ষা নিয়েই ভাগবতাচার্য তাঁর কাব্য রচনা করেন। তাই প্রেমতরঙ্গিণীর সর্বত্রই কবির এক অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। মণীন্দ্রমোহন বসু তাঁর "বাঙ্গালা সাহিত্য" গ্রন্থের ২য় খণ্ডে বলেছেন :

"কবি যে ভাবে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি যথাসাধ্য মূলের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ইহাই মাত্র বলা যাইতে পারে। কৃত্তিবাস ও কাশীদাস এইরূপ আদর্শ অনুসরণ করেন নাই ; এইজন্য তাঁহারা স্বাধীনভাবে গ্রন্থ রচনার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভাগবতাচার্য সর্বদা আদর্শের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়াছেন।"

কালিদাস রায়ের প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য গ্রন্থেও বলা হয়েছে :

"কবি মহাপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ভাগবত পাঠই তাঁহার জীবনের ব্রত ও জীবিকাই ছিল। সেজন্য ভাগবতের শ্লোকার্থকে কোথাও বিকৃত না করিয়া যতদূর সম্ভব শ্লোকের মর্মার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।"

আলোচ্য পদটি এইদিক থেকে শুধু যে ব্যতিক্রম তাই নয়, সপ্তদশ / অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ ভাবসাযুজ্যও বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। [তুলনীয় : পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত ১৬৫১ সংখ্যক পদ]।

সখি হে, কোথা কৃষ্ণ করাহ দরশন।
ক্ষণেকে যাহার মুখ না দেখিলে ফাটে বুক
শীঘ্র দেখাও না রহে জীবন ॥ ধ্রু ॥

এই ব্রজের রমণী কামার্ক তপ্ত কুমুদিনী
নিজ করামৃত দিয়া দান।
প্রফুল্লিত করে যেই কাঁহা মোর চন্দ্র সেই
দেখাও সখি, রাখ মোর প্রাণ। ইত্যাদি॥

জনপ্রিয়তা যদি কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর কোন পদকে এতটা পরিবর্তিত করে দিয়ে থাকে তবে সেই রূপান্তরিত পদটিকে কাব্যে 'প্রক্ষিপ্ত' বলাই যুক্তিযুক্ত—বিশেষত ঐ রূপান্তর যদি কবিতার মূলছন্দ এবং কবির মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীকেও বিপর্যস্ত করে দিয়ে থাকে।

"বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস", ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ (৫ম সংস্করণ ১৯৭০) গ্রন্থের ৪৬৫ পৃষ্ঠায় পাদটীকায় ডঃ সুকুমার সেন প্রেমতরঙ্গিণী প্রসঙ্গে বলেছেন :

"রঘুপণ্ডিতের কাব্যের প্রাচীন পুঁথি দুর্লভ। গ ৪১৩৭ কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর একমাত্র প্রাচীন ও প্রামাণ্য পুঁথি। মাধব আচার্যের কৃষ্ণমঙ্গলের অনেক পুঁথিতে রঘুপণ্ডিতের কাব্যের অংশ প্রবেশ করিয়াছে। গায়কেরা বোধ হয় উভয়ের রচনা মিলাইয়া গান করিত।"

উক্ত গ্রন্থের ৪৬৬ পৃষ্ঠায় দ্বিজমাধবের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

"মূল রচনায় শুধু ব্রজলীলার ও মথুরালীলার বর্ণনা ছিল, অথবা যেমন পাওয়া যাইতেছে, দ্বারকালীলা পর্যন্ত বর্ণিত ছিল কিনা বলা যায় না। তবে প্রাপ্ত কাব্যের শেষার্ধে রঘুপণ্ডিতের ও মালাধর বসুর রচনা প্রচুর মিশিয়া গিয়াছে। সে মিশ্রণ-মিলন কতটা তাহা খুঁটিয়া বিচার করিলে তবে নির্ধারণ করা যাইবে।"

প্রেম তরঙ্গিণীর কোন কোন পদ যে মাধবাচার্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের পুরাতন পুঁথিগুলিতে প্রবেশ করেছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। কিছু কিছু পাঠান্তর থাকলেও প্রেমতরঙ্গিণীর একাধিক পুঁথির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের তুলনা করলে ঐ ধারণা দৃঢ়মূল হয়ে ওঠে। সুতরাং প্রেমতরঙ্গিণীর অংশ বিশেষ ঢুকে আছে—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের এমন সব পুঁথির ভিত্তিতে মুদ্রিত যেসব সংস্করণ দেখা যায়, সেগুলির প্রামাণিকতা সম্পর্কেও সংশয় দেখা দেওয়া স্বাভাবিক।

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত" (২য় খণ্ড, ২য় পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ ১৯৭১) গ্রন্থে মাধবাচার্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল প্রসঙ্গে একাধিক মুদ্রিত সংস্করণের মধ্যে একই কাব্যের ভিন্ন পাঠের প্রতি ইতিহাস পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ঐ গ্রন্থের ৭৩২ পৃষ্ঠায় প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেছেন :

"...এমন কি সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের' সঙ্গে বঙ্গবাসী প্রকাশিত 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের'ও অনেক পাঠবৈষম্য আছে। যেমন—

॥ বঙ্গবাসী সংস্করণ ॥
শরৎ যামিনী চারু চৌদিকে বিমল।
প্রফুল্ল মালতী জাতি যূথিকা সুন্দর॥
বহুগুণ বহুসুখ হৈল বৃন্দাবনে।
অখণ্ড পূর্ণিমা শশী উদিত গগনে॥
চিরদিনে যেন নারী পতি দরশনে।
সর্ব দুঃখ শোক হরে আনন্দিত মনে॥
কমলাবদন তুল্য পূর্ণ শশধর।
তা দেখিয়া আনন্দিত ভাবে গদাধর॥

॥ সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ ॥
শরৎ সহায় আর পূর্ণিমা রজনী!
মনোহর মুরলী বাজাল যাদুমণি॥
একত্র মিলিয়া আইল ষড়ঋতুগণে।
যমুনা লহরী তাহে সুমন্দ পবন॥
প্রফুল্ল কমলদল ভ্রমর গুঞ্জরে।
কুহু কুহু কোকিল করয়ে সুমধুরে॥

এখানে এই তুইখানি গ্রন্থকে সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া মনে হয় না কি? বোধ হয় বঙ্গবাসী সংস্করণ সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ অপেক্ষা অধিকতর প্রামাণিক।"

ড: অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গবাসী সংস্করণকে "অধিকতর প্রামাণিক" বলেছেন এই কারণে যে "পুঁথির পাঠ ও মুদ্রিত পাঠের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নাই।" অতঃপর তিনি বলেছেন—"সাহিত্য পরিষদের মুদ্রিত পাঠে নানা বৈষম্য আছে। সুতরাং সাহিত্য পরিষদ সংস্করণের অবলম্বিত পুঁথিটির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে।"

সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণের তুলনায় বঙ্গবাসী সংস্করণকে অধিকতর প্রামাণিক বলার হেতু হয়ত কিছু আছে; কিন্তু যে পুঁথি বা পুঁথিগুলির সাহায্যে বঙ্গবাসী সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছিল, সেই পুঁথিই যে যথেষ্ট পরিমাণে প্রামাণিক নয় তার কিছু প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। বঙ্গবাসী সংস্করণে পূর্বোদ্ধৃত "শরৎ যামিনী চারু" ইত্যাদি যে পদটি আছে সেই পদটি প্রেমতরঙ্গিণীর একাধিক পুঁথিতে পাওয়া গেছে। অতএব এই সংশয় দৃঢ়মূল হয় যে পদটি আদৌ শ্রীকৃষ্ণবিজয় প্রণেতা মাধবাচার্যের রচনা নয়। উক্ত পদটি প্রেমতরঙ্গিণীর ১০ স্কন্ধের ২৯ অধ্যায়ের সূচনা অংশ। বরাড়ী রাগে গেয়। অংশটি এইরকম:

গোপিকার সহে কৃষ্ণ করিব রমণ।
মনে হেন কৈল যদি প্রভু নারায়ণ॥
শরত জামিনী চারু চৌদিগ বিমল।
প্রফুল্ল মালতী মাল যূথিকা সুন্দর॥
বহু গুণ বহু সুখ হৈল বৃন্দাবনে।
অখণ্ড পূর্ণিমা শশি উদিত গগনে॥
চিরদিনে জেন নারী পতি দরশনে।
সর্ব্বলোক শোক হরে আনন্দিত মনে॥
কমলাবদনতুল পূর্ণ শশধর।
তা দেখিঞা আনন্দিত হৈল গদাধর॥

শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রকাশিত (১৯৬৬) ২য় সংস্করণে এই পদে কিছু কিছু পাঠান্তর আছে। যেমন—'সহে' স্থলে 'সঙ্গে', 'চৌদিগ' স্থলে 'চৌদিগে', 'মালতীমাল' স্থলে 'মালতীমল্লী', 'সর্ব্বলোকশোক' স্থলে 'সর্বদুঃখশোক', 'কমলাবদনতুল,'স্থলে 'কমলাবদনতুল্য' এবং 'দেখিঞা' ও 'হৈল স্থলে যথাক্রমে 'দেখিয়া' ও 'হৈলা'।

পদটি যে মূলত প্রেমতরঙ্গিণীর এবং তার রচয়িতা যে ভাগবতাচার্য রঘুনাথ এবিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়ার কারণ আছে।

ভাগবতাচার্যের অনুবাদ শুধু মূলানুগ নয়—বহুস্থলেই প্রায় আক্ষরিক। বিশেষত প্রেমতরঙ্গিণীর ১০ স্কন্ধ এই জাতীয় অনুবাদের দিক থেকে প্রায় ক্রটিহীন। ভাগবতের ১০ স্কন্ধের ২৯ অধ্যায়ের সূচনা অংশে বলা হয়েছে—"ভগবান হয়েও শ্রীকৃষ্ণ মল্লিকা প্রস্ফুটিত শরৎকালের রাত্রির শোভা দেখে যোগমায়া শক্তিকে আশ্রয় করে ক্রীড়া করতে ইচ্ছা করলেন। অনেকদিন পরে স্বামী প্রবাস থেকে ফিরে এলে প্রিয়ার মুখমণ্ডল যেমন কুঙ্কুমরঞ্জিত হয়ে থাকে, সেরকম নক্ষত্রপতি চাঁদও সে সময় স্নিগ্ধ সুখকর কিরণ দ্বারা পূর্বদিক রঞ্জিত করে দর্শকমাত্রেরই সন্তাপ দূর করতে লাগল। ভগবান দেখলেন, বিকশিত পদ্ম সদৃশ চাঁদ অখণ্ডমণ্ডল হয়ে আকাশে উদিত হয়েছেন, তাঁর প্রভা লক্ষ্মীর বদনের মত প্রকাশ

পাচ্ছে।"—ত্রিপুরাশংকর সেনশাস্ত্রীর ভূমিকা-সম্বলিত শ্রীমদ্‌ভাগবত, হরফ প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ১৯৭৭, ৫৮৮ পৃষ্ঠা।

প্রেমতরঙ্গিণীর পুঁথি বা মুদ্রিত সংস্করণে প্রাপ্ত "শরত যামিনী চারু" ইত্যাদি পদটি মূলের কতটা কাছাকাছি তা' ভাগবতের শ্লোকগুলির সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যায়।

অন্যদিকে মাধবচার্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ভাগবতের ভিত্তিতে রচিত হলেও ভাগবতাচার্যের ঐ অনুবাদ-সচেতনতা মাধবাচার্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁর "বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত" গ্রন্থের ২য় খণ্ডে মাধবাচার্য প্রসঙ্গে ৭৩৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন :

"কবি ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই, ভাবানুবাদও করেন নাই—মূলগ্রন্থের ভাব লইয়া প্রায় নিজের ভাষায় কাব্য রচনা করিয়াছেন— কাজেই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল প্রায় মৌলিক গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করিয়াছে।"

সুতরাং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধা নেই যে, "শরত যামিনী চারু" পদটি ভাগবতাচার্যেরই রচনা— মাধবাচার্যের নয়। গায়েন বা কথকদের দৌলতেই আলোচ্য পদটি কালক্রমে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের পুঁথিতে প্রবেশ করে। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের অনেক পুঁথিতে রঘুপণ্ডিতের কাব্যের অংশ প্রবেশ করেছে বলে ডঃ সুকুমার সেন যে সিদ্ধান্ত করেছেন তা যথার্থ। আলোচ্য পদটিকে তার অন্যতম দৃষ্টান্ত বলে মনে করি।

গুপ্তিপাড়ার বাংলা মন্দির সমূহের নির্মাণকাল

শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য

হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়া গ্রামের মন্দির চতুষ্টয় প্রাচীন বাংলা মন্দির স্থাপত্যের আকর্ষণীয় নিদর্শন। এই চারটি মন্দির হলো—শ্রীচৈতন্যদেবের মন্দির (আদি জোড় বাংলা মন্দির), রাম সীতার মন্দির, কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির এবং বৃন্দাবন চন্দ্রের মন্দির। এই চারটি মন্দির (তাদের চতুর্বেষ্টনী প্রাচীর সমেত) ভারত সরকারের পুরাকীর্তি সংরক্ষণ আইনে (Ancient Monuments Preservation Act, 1904) সংরক্ষিত পুরাকীর্তি।[১] গুপ্তিপাড়া মঠের ম্যানেজার রাজেন্দ্র রায়ের (খ্রীঃ ১৯১২-১৫) সঙ্গে ভারত সরকারের যে চুক্তি সম্পাদিত হয়, তদনুযায়ী এই পুরাকীর্তিগুলির সংরক্ষণের দায়িত্ব গুপ্তিপাড়া মঠের পরিচালকগণের উপর অর্পিত হয়।

শ্রীচৈতন্যদেবের মন্দিরের নির্মাণকাল সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।[২] বর্তমানে অন্য তিনটি মন্দিরের নির্মাণকাল আমাদের আলোচ্য।

রাম সীতার মন্দির :

এই মন্দিরটি আটকোণা শিখরবিশিষ্ট চারবাংলা মন্দির। মন্দিরের বারান্দার পশ্চিম দেওয়ালে বহির্ভাগে, দক্ষিণ দেওয়ালের বহির্ভাগে ও বারান্দার ভিতরের দেওয়ালে পোড়ামাটির মূর্তি ও অলংকরণ সজ্জা আকর্ষণীয়। পোড়ামাটির মূর্তিগুলির মধ্যে আছে গোপিকামূর্তি, রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি (উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান), জগদ্ধাত্রীমূর্তি, গরুড়ারূঢ় বিষ্ণুমূর্তি ইত্যাদি এবং রামায়ণের চিত্রকাহিনী (যেমন দশমুণ্ড রাবণের যুদ্ধযাত্রা, রাম রাবণের যুদ্ধ ইত্যাদি)। মন্দিরের গর্ভগৃহে শ্রীরাম, লক্ষণ, সীতা ও হনুমানের বিগ্রহ।

এই মন্দিরের নির্মাণকাল সম্বন্ধে 'গেজেটিয়রে'র মত—মন্দিরটি ১৮শ শতাব্দীর শেষে শেওড়াফুলীর রাজা হরিশ্চন্দ্র রায় নির্মাণ করেন।[৩] কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। হরিশচন্দ্র রায় শেওড়াফুলীরাজ মনোহর রায়ের পৌত্র। বাংলা ১১৫০ সনে (খ্রীঃ ১৭৪৩) মনোহর রায়ের মৃত্যু হয়।[৪] মনোহরের পুত্র রাজচন্দ্র। তৎপুত্র হরিশ্চন্দ্র। সুতরাং হরিশ্চন্দ্র ১৮শ শতাব্দীর পুরুষ ন'ন। শ্রীসুধীর কুমার মিত্র মহাশয়ের মতে মনোহর রায়ই এই মন্দিরের নির্মাতা।[৫] এবং মন্দিরটি ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয়।[৬] মিত্র মহাশয় এই মতের সমর্থনে কোন প্রমাণ প্রয়োগ করেন নি।

১৮শ শতাব্দীর গুপ্তিপাড়ার প্রখ্যাত পণ্ডিত ও কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দে সংস্কৃত গদ্যে ও পদ্যে মিশ্রিত 'চিত্রচম্পূঃ' নামে চম্পূকাব্য রচনা করেন।[৭] ঐ কাব্যে শ্রীরামচন্দ্রাদি সম্বন্ধে যে দু'টি শ্লোক আছে,[৮] তা থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, 'চিত্রচম্পূঃ' রচনার আগে (অর্থাৎ ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দের আগে) শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির নির্মিত হয়েছিল। রাজা মনোহর রায় মন্দির নির্মাতা হ'লে মন্দির ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দের আগে নির্মিত হয়েছিল, কেননা মনোহর রায় ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগত হ'ন। মিত্র মহাশয় একই সঙ্গে মনোহর রায়কে মন্দির নির্মাতা ও ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে মন্দির নির্মাণ কাল বলে সামঞ্জস্যহীন উক্তি করেছেন। 'গেজেটিয়রে'র মতও স্ববিরোধী।

১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে বিজয়রাম সেন 'তীর্থমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন।[৯] এই কাব্যগ্রন্থে আছে, রামশঙ্কর রায় রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও দশমহাবিদ্যা প্রতিষ্ঠা করেন।[১০] এই রাম-

শঙ্কর রায়কে বলা কঠিন। শেওড়াফুলী রাজগণের মধ্যে রামশঙ্কর রায় বলে কোন রাজার নাম পাওয়া যায় না। ১৮শ শতাব্দীতে সোমড়ায় একজন বৈদ্য রামশঙ্কর রায় ছিলেন। ইনি ঢাকার দেওয়ান ছিলেন এবং ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে সোমড়ায় 'মহাবিদ্যা' নামে জগদ্ধাত্রীমূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ইনিই যে রামসীতার মন্দির নির্মাণ করেন, এ রকম কোন প্রমাণ বা প্রমাণের সূত্র পাওয়া যায় না। 'চাঁদরাণী' প্রণেতা বিপিনমোহন সেন তাঁর গ্রন্থে রামশঙ্কর রায়ের জীবনকথা বিবৃত করেছেন। কিন্তু রামসীতা মন্দির নির্মাণের কথা লেখেননি। গুপ্তিপাড়ার সুধাংশু সেন মহাশয়ের (অধুনা পরলোকগত) অনুমান— এই রামশঙ্কর রায় পাটমহল পরগণার জমিদার ছিলেন। তবে মন্দির যে ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দের আগে (এমন কি ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দের আগে)।[১০] নির্মিত হয়েছিল এ কথা অনুমান করা যায় এবং রামশঙ্কর রায়[১১] যে এই মন্দির নির্মাতা এ কথা ধারণা করা যায়।

কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির :

মন্দিরটি একরত্ন আট বাংলা মন্দির পর পর দু'টি চারচালার মধ্যে খাড়া চতুষ্কোণ দেওয়াল। মন্দিরে কোন অলঙ্করণ নেই, শুধু চুণ বালির পলেস্তারা। মন্দিরের গর্ভগৃহে কৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রীরাধা বিগ্রহ।

গেজেটিয়ারের মতে কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির নবাব আলিবর্দী খাঁর (খ্রী: ১৭৪০-৫৬) শাসনকালে বৃন্দাবন চন্দ্র মঠের দণ্ডী মধুসূদনানন্দ আশ্রম কর্তৃক নির্মিত হয়।[১২] এই মত সমগ্রভাবে গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা দণ্ডী মধুসূদনানন্দ আলিবর্দী খাঁর সমসাময়িক ন'ন, তিনি খ্রী: ১৭১০ থেকে খ্রী: ১৭২৪ পর্যন্ত মঠের মোহান্ত পদে আসীন ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির নির্মাণ করেন মঠের নবম দণ্ডী পীতাম্বরানন্দ আশ্রম (আ: খ্রী: ১৭৪০-আ: খ্রী: ১৭৬০)। কৃষ্ণচন্দ্রের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যে কাহিনী প্রচলিত আছে সে কাহিনীটি সংক্ষেপে নিম্নমত—

দণ্ডী পীতাম্বরানন্দের মঠাধিকারকালে দেশে দস্যুতস্করের অত্যন্ত উপদ্রব ছিল। দস্যুভয় থেকে আত্মরক্ষার জন্য পীতাম্বরানন্দ মঠের চারদিকে খুব উঁচু প্রাচীর নির্মাণ করেন। এতেও তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। ডাকাতির ভয়ে তিনি টাকা জমানো বন্ধ করে দিলেন। তিনি আয়ের সমস্তই মুক্ত হস্তে দেবসেবায় ব্যয় করতে লাগলেন। নবাব বৃন্দাবনচন্দ্রকে জমিদারী[১৩] দিয়েছিলেন। দণ্ডীর অপরিমিত ব্যয়ের ফলে নবাবের রাজস্ব বাকী পড়লো। এদিকে বর্গীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে নবাবের রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে। সেজন্য নবাব আলিবর্দী খাঁ জমিদারদের কাছে থেকে নজরাণা ও বকেয়া রাজস্ব আদায়ের জন্য জমিদারদের মুর্শিদাবাদে তলব করে পরোয়ানা জারী করেন। নবাবী আমলে রাজস্ব বাকী পড়লে জমিদারদের কারাবাস করতে হতো। জমিদারী বৃন্দাবনচন্দ্রের নামে, কাজেই বৃন্দাবনচন্দ্রকেও মুর্শিদাবাদে তলব করা হলো।

পরোয়ানা পেয়ে পীতাম্বরানন্দ বিশেষ সঙ্কটে পড়লেন। বিগ্রহ বৃন্দাবনচন্দ্রকে তিনি কি করে মুসলমান নবাবের দরবারে হাজির করেন? শেষে হিতৈষীদের পরামর্শে তিনি শান্তিপুরের শিল্পীদের দিয়ে বৃন্দাবনচন্দ্র বিগ্রহের অনুরূপ একটি নিম কাঠের কৃষ্ণমূর্তি তৈরী করিয়ে সেই মূর্তি নিয়ে তিনি মুর্শিদাবাদ গেলেন। ঐ সময়ে গুপ্তিপাড়ার প্রখ্যাত পণ্ডিত ও কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার নবাব আলিবর্দী খাঁর সভাসদ ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁরই সহায়তায় তিনি নবাবের দেওয়ান রাজা মাণিকচাঁদের সঙ্গে পরিচিত হ'ন এবং তাঁর বিপদের বিষয় দেওয়ানকে অবগত করান।

যথাসময়ে পীতাম্বরানন্দ নবাবের দরবারে উপস্থিত হ'লে দেওয়ান মাণিকচাঁদ

বৃন্দাবনচন্দ্রের বকেয়া রাজস্বের বিষয় নবাবের কাছে দাখিল করলেন। দেওয়ান নবাবকে জানালেন—বৃন্দাবনচন্দ্র মানুষ জমিদার ন'ন, তিনি হিন্দুর দেবতা। তাঁর সেবায়েতদণ্ডী পরমহংস সাধুপুরুষ; তিনি অতিথি, অভ্যাগতের এবং দেবতার সেবায় ও দীনদরিদ্রদের প্রতিপালনে অর্থব্যয় করে নিঃস্ব হয়েছেন বলে রাজস্ব দিতে পারেন নি। নবাব দেওয়ানের এই রিপোর্টে সন্তুষ্ট হয়ে বৃন্দাবনচন্দ্রের বকেয়া রাজস্ব কিস্তিবন্দী করে পরিশোধ করার আদেশ দিলেন ও দণ্ডীকে অব্যাহতি দিলেন।[১৪] পীতাম্বরানন্দ গুপ্তিপাড়ায় ফিরে এই নূতন কৃষ্ণমূর্তিকে 'কৃষ্ণচন্দ্র' নাম দিয়ে অষ্টধাতুময়ী শ্রীরাধা মূর্তি সহ প্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু 'কৃষ্ণচন্দ্রে'র পৃথক মন্দির নির্মাণ তখনই সম্ভব হলো না। পীতাম্বরানন্দ প্রজাদের ও ধনী ব্যক্তিদের কাছে অর্থ সাহায্যের আবেদন করলেন। মন্দির নির্মাণের উপযোগী অর্থের সংগ্রহে প্রায় ১০ বৎসর সময় লাগে।[১৫] মন্দির নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হলে কৃষ্ণচন্দ্র নূতন মন্দিরে অধিষ্ঠিত হলেন।

এই কাহিনী মঠের দণ্ডীদের মধ্যে সুপ্রচলিত। সোমড়া নিবাসী বিপিনমোহন ১৮১৬ শকাব্দের ৯ই শ্রাবণ (খ্রীঃ ১৮৯৪) 'চাঁদরাণী' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত করেন। তাতে ঐ কাহিনী বিবৃত হয়েছে। ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ সনে (খ্রীঃ ১৯১১) ঐ গ্রন্থের যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তাতেও ঐ কাহিনী সন্নিবিষ্ট আছে। গুপ্তিপাড়ার প্রখ্যাত পণ্ডিত শ্রীপতি কবিরত্ন সাহিত্যাচার্য ১৩২২ সনের ৯ই আশ্বিন (খ্রীঃ ১৯১৫) তারিখের 'সম্মিলনী' পত্রে 'পীতাম্বরানন্দ' শীর্ষক প্রস্তাবে ঐ কাহিনী বিবৃত করেছেন। সুতরাং কাহিনীটিকে সত্য বলে ধরে নিয়ে তারই ভিত্তিতে কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দিরের নির্মাণকাল স্থির করতে হবে।

১৬৬৪ শকাব্দের বৈশাখ মাসে (খ্রীঃ ১৭৪২) বর্গীরা বাংলা আক্রমণ করে। খ্রীঃ ১৭৪২ থেকে খ্রীঃ ১৭৪৪ পর্যন্ত নবাব আলিবর্দী খাঁকে বর্গীদের দমনের জন্য প্রায় শিবিরে শিবিরে কাটাতে হয়। ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দে বর্গী সেনানায়ক ভাস্কর পণ্ডিত নিহত হলে বর্গী রঘু গাই-কোয়াড়ের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রে পালিয়ে যায়। ১৭৪৫ খ্রীস্টাব্দে রঘুজী ভোঁসলে বর্গী সৈন্য নিয়ে আবার বাংলায় হানা দেন ও আলিবর্দীর কাছে পরাভূত হয়ে বেরার ফিরে যান। এই কারণে অনুমান করা যায়, ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দে অথবা ১৭৪৫ খ্রীস্টাব্দে পীতাম্বরানন্দের মুর্শিদাবাদ গমন ঘটেছিল।[১৬] সুতরাং কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা ১৭৪৫ খ্রীস্টাব্দের পরে ঘটেছিল।

আগেই রামসীতার মন্দির প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, বাণেশ্বরের 'চিত্রচম্পূঃ' কাব্যে (খ্রীঃ ১৭৪৪) বৃন্দাবনচন্দ্রের এবং রাম সীতা ও লক্ষ্মণেরও উল্লেখ আছে।[১৭] কিন্তু কৃষ্ণ-চন্দ্রের কোন উল্লেখ নেই। ১৭৪৫ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে বাণেশ্বর 'চন্দ্রাভিষেকম্' নাটক রচনা করেন।[১৮] এই নাটকে বৃন্দাবনচন্দ্রের উল্লেখ আছে,[১৯] কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের উল্লেখ নেই। এই জন্য ধরে নেওয়া যায় যে, ১৭৪৫ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসের পর কৃষ্ণচন্দ্র বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১০ বছর পরে কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির নির্মাণ শেষ হয়। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যায় যে আঃ ১৭৫৫ অথবা ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির নির্মিত হয়।

বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির :

গুপ্তিপাড়া মঠের বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরটি মঠের মন্দির চতুষ্টয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ।[২০] মন্দিরটি ইঁটের তৈরী আট বাংলা মন্দির। মাটি থেকে চূড়া পর্যন্ত মন্দিরের উচ্চতা—আঃ ৭৭'ফু. চূড়ার উচ্চতা আঃ ৬'ফু. মন্দিরের চারদিকে ৬'ফু. ১"ই. প্রশস্ত চত্বর। মাটি থেকে চত্বরের উচ্চতা ৫'ফু. ৩"ই. চত্বর বাদে মন্দিরের দৈর্ঘ্য ৪৩'ফু. ৬"ই. এবং চত্বর বাদে মন্দিরের প্রস্থ ৩৯'ফু. ৬"ই. মন্দিরের শীর্ষে একটি ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ

বেদীর উপর একটি মৃন্ময় পদ্ম, পদ্মের উপর ছোট ছোট তিনটি পিতলের কলস পর পর সাজানো। প্রত্যেক কলস ভেদ করে একটি লৌহশলাকা উর্ধ্বে উঠেছে। মন্দির চত্বরের পশ্চিম দিকের ভিত্তিগাত্রে সংলগ্ন বৃন্দাবনচন্দ্র বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাতা সত্যানন্দ সরস্বতীর সমাধি। গর্ভগৃহের ভিতর থেকে সমাধি পর্যন্ত একটি সরু নালি আছে। ঐ নালি দিয়ে বৃন্দাবনচন্দ্রের স্নানজল সমাধিতে পড়তো। ঐ নালিটি সংস্কারাভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। মন্দিরটি দক্ষিণ মুখ।

দক্ষিণ দিকের চত্বরের পর বারান্দা, মেঝে মার্বেল পাথর দিয়ে বাঁধানো। বারান্দার পূর্ব ও পশ্চিমদিকে একটি করে প্রকোষ্ঠ। বারান্দার পর গর্ভগৃহ। গর্ভগৃহে শ্বেতপাথরের বেদীর উপর রূপার সিংহাসনে ত্রিভঙ্গিমভাবে দণ্ডায়মান বৃন্দাবনচন্দ্র বিগ্রহ। পাশে অষ্টধাতুময়ী শ্রীরাধা বিগ্রহ। বিগ্রহের অপর পাশে বদ্ধাঞ্জলী গরুড়মূর্তি।

গর্ভগৃহের উত্তর দিকের ভিত্তিতে সংলগ্ন বেদীর উপর দ্বিভুজ পদহীন, ও জ্ঞানমুদ্রাপাণি জগন্নাথের এবং বলরামের বিগ্রহ, মধ্যে সুভদ্রা দেবীর বিগ্রহ। মন্দিরের বারান্দার দেওয়ালে ও গর্ভগৃহের ভিতরের ছাদের গায়ে রাধাকৃষ্ণ লীলার চিত্র (fresco)।[২১]

বৃন্দাবনচন্দ্রের এই আট বাংলা মন্দিরটি গুপ্তিপাড়া মঠের দণ্ডী মহান্ত বীরভদ্রানন্দ আশ্রমের (খ্রীঃ ১৮০৬-১৩) মঠাধিকারকালে কলকাতা বাগবাজারের বিখ্যাত ধনী কায়স্থ গঙ্গানারায়ণ সরকারের ব্যয়ে নির্মিত হয়। মন্দির নির্মাণের সঠিক কাল নির্ণয় করা কঠিন।

গুপ্তিপাড়ার পণ্ডিত শ্রীপতি কবিরত্ন ১৩২২ সনে 'সম্মিলনী' পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক ভাবে গুপ্তিপাড়ার মঠের ইতিহাস প্রকাশিত করেন। ঐ ইতিহাসের "বীরভদ্রানন্দ"—শীর্ষক প্রস্তাবে তিনি মন্দির নির্মাণকাল ১৭৩২ শকাব্দ বলে উল্লেখ করেন ও প্রমাণস্বরূপ নীচের শ্লোকটি উদ্ধৃত করেন —

"শাকে ত্রিবহ্নি সিন্ধশ্বির সংখ্যে গুপ্তপুরে হরেঃ।
গঙ্গানারায়ণোঽকার্ষীন্নারায়ণ মঠং শুভম্॥

কবিরত্ন মহাশয় ঐ শ্লোকটি কোথায় পেয়েছিলেন তা লেখেননি, তবে শ্লোকটি দণ্ডীদের মধ্যে সুপ্রচলিত। কিন্তু শ্লোকটিতে কিছু গোলমাল আছে ধারণা হয়। কবিরত্ন মহাশয় শ্লোকার্থে ১৭৩২ শকাব্দ ধরেছেন। কিন্তু 'ত্রিবহ্নি'তে ৩৩ ও সিন্ধুতে ৭ পাওয়া যায়। 'অশ্বির' কি? গুপ্তিপাড়ার কাশীপ্রবাসী অধ্যাপক ৺রামচরণ চক্রবর্তী তাঁর জীবদ্দশায় লেখককে লেখা একখানি চিঠিতে এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, 'অশ্বির' কোষগত অর্থ অশ্বযুক্ত সূর্য। কিন্তু এতে কষ্টকল্পনা হয়। তাঁর মতে শ্লোকটি মুদ্রকের প্রমাদ দুষ্ট, শ্লোকটির প্রথম পংক্তির পাঠ—"শাকেঽদ্রিবহ্নি সিন্ধর্চ্চিঃ সংখ্যে গুপ্তপুরে হরেঃ" ধরলেও 'অদ্রি' (অর্থাৎ পর্বত-উদয়াচল এবং অস্তাচল)=২, 'বহ্নি'=৩ এবং 'অর্চ্চিঃ (অর্থাৎ কিরণ)=১ ধরলে 'অঙ্কস্য বামাগতিঃ' এই নিয়মে ১৭৩২ শকাব্দ পাওয়া যায়। আমাদেরও মনে হয় শ্লোকটি মুদ্রাকর প্রমাদ দুষ্ট, তবে 'ত্রিবহ্নি' শব্দটি ঠিকই আছে (ত্রি=৩, বহ্নি=৩), কেবল 'সিন্ধশ্বির' এর পরিবর্তে 'সিন্ধুস্থিরা' (সিন্ধু=৭, স্থিরা= অমর কোষগত অর্থ পৃথিবী=১) পাঠ হবে। এতে ১৭৩৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮১১ খ্রীস্টাব্দ পাওয়া যায়। অতএব ১৮১ খ্রীস্টাব্দে মন্দির নির্মিত হয়েছিল বলা যায়।

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত করায় অসুবিধা আছে।

সোমড়া নিবাসী বিপিনমোহন সেন তাঁর 'চাঁদরাণী' গ্রন্থে লিখেছেন—সোমড়ার দেবীপ্রসাদ সেন মঠের 'রিসিভার' (Receiver) থাকাকালে বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির প্রতিষ্ঠিত

হয়।[২২] দেবীপ্রসাদ সেন সোমড়ার রায়রায়ান রামচন্দ্র সেনের পুত্র। রামচন্দ্র সেন দণ্ডী শ্যামানন্দ আশ্রমের বিরুদ্ধে যে দেওয়ানী মোকর্দমা করেন, সেই মোকর্দমায় শ্যামানন্দের একরারনামামূলে মোকর্দমায় আপোষ নিষ্পত্তি হয় ও রামচন্দ্র সেন মঠের 'রিসিভার'হন। রামচন্দ্র সেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দেবীপ্রসাদ সেন মঠের 'রিসিভার' হ'ন এবং মঠের সম্পত্তির কর্তৃত্ব লাভ করেন।[২৩] রামচন্দ্র সেন ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে স্বর্গত হ'ন[২৪] এবং দেবীপ্রসাদ ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে পরলোকগত হ'ন।[২৫] সুতরাং বিপিনমোহন সেনের উক্ত মতানুযায়ী ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাস থেকে ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস মধ্যে কোন সময়ে বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির নির্মিত হয়।

কবিরত্ন মহাশয় তাঁর মঠের ইতিহাস গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—"গঙ্গানারায়ণ যথাশাস্ত্র মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তন্মধ্যে বৃন্দাবনচন্দ্রকে স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। একখানা মোহর, দেবদেবীর জড়োয়া অলঙ্কার ও রৌপ্য সিংহাসন না পাইলে দণ্ডী তাঁহার প্রস্তাবে অসম্মত হ'ন। এই জন্য কিছুদিন মন্দির শূন্যভাবে পতিত থাকে, তৎপরে সরকার দণ্ডীকে প্রসন্ন করিলে বৃন্দাবনচন্দ্র নূতন মন্দিরে আগমন করিলেন।"

অতএব আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, বৃন্দাবনচন্দ্রের বর্তমান মন্দির আঃ ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয় এবং ১৮১১ খ্রীস্টাব্দে মন্দির শাস্ত্রানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাদটীকা

১। (ক) In exercise of the power conferred by Sub-Section (1) of Section (3, of Ancients Monuments Preservation Act. 1904 (VII of 1904) the Governor General in Council is pleased to declare the group of temples Known as Brindabon Chandra's Math which are situated in the Village of Guptipara within the jurisdiction of Police Station Balagarh in the district of Hooghly and are bounded as follows to be protected monuments within the meaning of the said Act—

North—The track of Rath.

South—The Kaibartapara Road and waste land beloging to Brindabon Chandra Thakur.

East— Khal and waste land and garden belonging to Bridabon Chandra Thakur.

West— Kaibartapara Road.

Bengal Statutory Rules and Orders, Vol. I, 4th ed, 1941, pp. 774-75 Notification No 3097 dated 16.6.1913.

(খ) "The Notification No. 3097 dated the 16th June, 1913 published in the Calcutta Gazette of the 18th June, 1913 which declared the group of temples Known as Brindabon Chandra's Math, which are situated in the Village of Guptipara in the district of Hooghly to be protected

monuments is confirmed under Section (3) of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (VII of 1904)"—p. 775 ibid.

(২) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। ৮৩ বর্ষ। ৩-৪ সংখ্যা। কার্তিক—চৈত্র ১৩৮৩ গুপ্তিপাড়া জোড়বাংলা ও তাহার নির্মাণ কাল শীর্ষক প্রবন্ধ।

(৩) "The temple of Ram Chandra is made of red-colourd brick and has a curved roof ; over the roof is a tower-like structure, to which access is had by a staircase. The frontwall of barandah and to some extent of the sanctum is coverd with brick panels finely curved in the best style of Bengali art with figures of gods and goddesses and scenes from the epics. The temple is said to have been built by Harish Chandra Roy of Sheoraphuli at the end of the eighteenth century."—Bengal District Gazetteers, Hooghly, vol. *XXIX* ; Census 1951, West Bengal, Hooghly District Hand book (lst-edn) by A. C. Mitra, p. 227.

(৪) শ্রীসুধীরকুমার মিত্র : 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ' (১ম সং), ৩য় খণ্ড। পৃঃ ১২০০ দ্রষ্টব্য।

(৫) ঐ : ঐ, পৃঃ ১২০০ দ্রষ্টব্য।

(৬) ঐ : ঐ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৬ দ্রষ্টব্য।

(৭) "শাকে কালাঙ্গতর্কৌষধিপতি গণিতে কার্ত্তিকীয়ে দশাংশে। পূর্ণং শ্রীচিত্রচম্পূং ব্যতনুত দিবসে শ্রীলবাণেশ্বরাখ্যঃ॥ ২৬৭॥ শকাব্দাঃ ১৬৬৬॥"—রামচরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত 'চিত্রচম্পূঃ,। পৃঃ ৮৯

(৮) শ্লোক দু'টি যথা—

(ক) "সপ্তগ্রামসমীপধাম পরমং শ্রীগুপ্তপল্লীতি য—/চ্ছ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রনন্দিতমপি শ্রীরামচন্দ্রোজ্জ্বলম্।"—ঐ : ঐ, পৃঃ ৮৮, শ্লোক ২৬২

(খ) "ধ্যাত্বা শ্রীরামচন্দ্রং সহ জনক সুতা-লক্ষ্মণাভ্যাং প্রযত্না- /দাজ্ঞামাজ্ঞায় রাজ্ঞামপি মুকুটমণেশ্চিত্রসেনাহ্বয়স্য।" ঐ : ঐ পৃঃ ৮৯, ২৬৭ শ্লোকার্ধ। [এই শ্লোকার্ধ বাণেশ্বরের 'চন্দ্রাভিষেকম্' নাটকের (খ্রীঃ ১৭৪৫) পুঁথির শেষ পত্রে (৺রামচরণ চক্রবর্তীর কাশীস্থ বাটিতে রক্ষিত) আছে।]

(৯) "পাত্রা গ্রাম বামে রাখি করিলা গমন। গুপ্তিপাড়ায় আসি নৌকা দিল দরশন॥··· দশমহাবিদ্যা আর রাম লক্ষ্মণ সীতা। রামশঙ্কর রায় কৈলা অপূর্ব্ব নির্ম্মিতা॥ বৃন্দাবনচন্দ্র আছেন দেবের নির্মাণ। তথাকারে মহাশয় করিলা গমন॥"—বিজয়রাম সেন বিশারদঃ 'তীর্থমঙ্গল' (সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ) ১০৩, ১০৬-১০৭ পয়ার [এ থেকে এবং ৮ (খ) টীকায় উদ্ধৃত শ্লোক থেকে ধারণা হয় হনুমান বিগ্রহ পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।]

(১০) এরকম অনুমানের কারণ—১৭৪২ খ্রীস্টাব্দে বাংলায় বর্গী আক্রমণ হয়। কাজেই এই সময়ে কেউ মন্দির নির্মাণে সাহসী হবেন না।

(১১) কোন সুধী ব্যক্তি এই রামশঙ্কর রায়ের পরিচয় সম্বন্ধে আলোকপাত করিলে লেখক সুখী হইবেন।

(১২) "Just opposite the Ram Chandra temple on the other side of

the quadrangle, stands the fourth temple of Krishna Chandra with small images of Krishna and Radha, said to have been built by Dandi Madhusudanananda in the time of Nawab Alivardi Khan"—Bengal District Gazetteers, Hooghly, vol. *XXIX* ; Census 1951, West Bengal, Hooghly District Handbook (lst edn), p. 227. [চাঁদরাণীকার বিপিনমোহন সেনও ভ্রমাত্মকভাবে দণ্ডী মধুসূদনানন্দকে মন্দির প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব দিয়েছেন—'চাঁদরাণী' (২য় সং), পৃ: ৫৩-৫৫ দ্রষ্টব্য।

(১৩) এটি দাদপুর মৌজার জমিদারী। ২০শ শতাব্দীতে ম্যানেজার রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঠ প্রশাসনকালে এই জমিদারী বিক্রী হয়ে যায়।

(১৪) বিপনমোহন সেন : 'চাঁদরাণী'। (২য় সং)। ১৩১৮। পৃ: ৫৩-৫৫ ; মাসিক 'সম্মিলনী', ৯ আশ্বিন ১৩২২ : শ্রীপতি কবিরত্ন কৃত 'পীতাম্বরানন্দ'-শীর্ষক প্রস্তাব।

(১৫) এ তথ্য মঠের ব্রহ্মভূত দণ্ডী খগেন্দ্রানন্দ আশ্রমের নিকট এবং মঠের প্রবীণ কর্মচারী ৺হরি প্রামাণিকের নিকট জানা গিয়েছিল।

(১৬) 'চাঁদরানী'তে কৃষ্ণচন্দ্রপ্রতিষ্ঠা বিষয়ক কাহিনী অনুযায়ী পীতাম্বরানন্দের মুর্শিদাবাদ গমন ১৭৪১ খ্রীস্টাব্দে অথবা ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দে ঘটেছিল, কিন্তু তখন বর্গীদের আক্রমণে ও তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধে নবাবের রাজকোষ শূন্য হয় নি। সুতরাং এই মত পরিত্যক্ত হয়েছে।

(১৭) উপরের ৮নং পাদটীকায় উদ্ধৃত শ্লোকার্ধদ্বয়।

(১৮) "শাকে কালাঙ্গতর্কৌষধিপতি গণিতে চৈত্রিকীয়ে নবাংশে/পূর্ণং চন্দ্রাভিষেকং ব্যতনুত দিবসে শ্রীনবাণেশ্বরাখ্যঃ ॥"—'চন্দ্রাভিষেকম্' নাটকের প্রতিলিপি পুঁথির শেষপত্র (৺রামচরণ চক্রবর্তীর কাশীস্থ গৃহে সংরক্ষিত)।

(১৯) ৮(খ) নং পাদটীকায় উদ্ধৃত শ্লোকার্ধ, এই শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে ১৮নং পাদটীকায় উদ্ধৃত পংক্তি দু'টি আছে।

(২০) গুপ্তিপাড়া নিবাসী শ্রীঅপূর্বকুমার মুখোপাধ্যায় এ.এম্.আই.ই. মন্দির চারটি জরীপ করে যে উচ্চতা প্রভৃতি নির্ণয় করেছেন, তদনুযায়ী বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরের উচ্চতা প্রভৃতি লেখা হয়েছে। রামসীতার মন্দিরের ও কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দিরের উচ্চতাদি নীচে লেখা গেল।—

(ক) রামচন্দ্রের মন্দির।

মন্দিরের উচ্চতা (মাটি থেকে চূড়া পর্যন্ত)=আ: ৬৩´ ফুট, চূড়ার উচ্চতা আ: ৫´ ফুট মন্দিরের চারদিকের চত্বর—মাটি থেকে চত্বরের উচ্চতা ৪´ ফুট ৯ ইঞ্চি, পূর্বদিকের চত্বর ৫´ ফুট, পশ্চিমদিকের চত্বর ৫´ ফুট ৯ ইঞ্চি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রত্যেক চত্বর ৫´ ফুট ৬ইঞ্চি প্রশস্ত। চত্বর বাদে মন্দিরের দৈর্ঘ্য ৪১´ ফুট ৩ ইঞ্চি, প্রস্থ ৩৮´ ফুট ৬ ইঞ্চি মন্দিরের ছাদের উপরস্থ বুরুজের উচ্চতা আ: ৩০´ ফুট এবং বুরুজের শীর্ষ থেকে চূড়ার উচ্চতা আ: ৫´ ফুট।

(খ) কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির

মাটি থেকে চূড়া পর্যন্ত মন্দিরের উচ্চতা আ: ৫৫´ ফুট, চূড়ার উচ্চতা আ: ৬´ফুট মন্দিরের পশ্চিমদিকের চত্বর ৪´ ফুট ৩ ইঞ্চি, পূর্বদিকের চত্বর ৬´ ফুট ৬ ইঞ্চি, এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রত্যেক চত্বর ৬ ফুট ৯ ইঞ্চি প্রশস্ত। মাটি থেকে চত্বরের উচ্চতা ৪´ ফুট

৩ ইঞ্চি, চত্বর বাদে মন্দিরের দৈর্ঘ্য ৪১´ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং চত্বর বাদে মন্দিরের প্রস্থ ৩৯´ ফুট ৬ ইঞ্চি।

(২১) "The shrine of Brindabon Chandra, the biggest of the four is a brick temple of double thatch roof model * The entrance door and inside of the sanctum are painted with figures of Krishna, Radha and Gopis, of trees, folige etc.+ In the sanctum are wooden images of Krishna, Radha, Garuda, Jagannath, and Balaram."—Bengal District Gazetteers, Hooghly, vol. XXIX ; Census 1951, West Bengal. Hooghly District Handbook (lst edn) by A. C. Mitra, pp. 226-227.

[* এই মত ভ্রমাত্মক, মন্দিরটি জোড়বাংলা নয়, আটবাংলা।]

[+এই চিত্রগুলি বিংশ শতাব্দীতে ম্যানেজার রাজেন্দ্ররায়ের মঠ প্রশাসনকালে অঙ্কিত হয়।]

(২২) বিপিনমোহন সেন : 'চাঁদরাণী' (২য় সং), ১৩১৮, পৃ: ২৭১ পাদটীকা।

(২৩) ঐ : ঐ, পৃ: ২৭১

(২৪) ঐ : ঐ, পৃ: ২৫৯

(২৫) ঐ : ঐ, পৃ: ৩০৪

সোনা দিয়ে বোনা

একটা সময় গেছে যখন এক টুকরো মসলিনের জন্যে রোমের রাণী কিংবা মিশরের রাজা সাগ্রহে অপেক্ষা করতেন। ইতিহাসের সেই সুপ্রাচীন কাল থেকেই বাংলার তাঁতে বোনা শাড়ির বিশ্বজয়।

শুধু শাড়ি নয়, যে কোন হস্তশিল্প, তা যদি হয় মেঝেতে পাতার মাদুর কিংবা ঘর সাজানোর পুতুল, অথবা গায়ে পরার গহনা, কাঁধে ঝোলানোর ব্যাগ— সবই প্রাণ প্রায় বাংলার দক্ষ কারিগরদের ছোঁয়ায়। বাংলার তাঁতের কাজ কিংবা হাতের কাজ যাই-ই কিনুন তা শুধু হয়ে উঠবে না ঘরের অলঙ্কার, আপনার শিল্পবোধকেও প্রকাশ করবে তার অনুপম সৌন্দর্য।

আজই চলে আসুন————

তাঁতবস্ত্রের জন্য 'তন্তুজ' অথবা

'তন্তুশ্রী'তে হস্তশিল্পজাত সামগ্রীর জন্য—

'মঞ্জুষা' এবং 'গ্রামীণ' শিল্প বিপণিগুলিতে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ ৮৭৭১/৮৩

চন্দ্র পূজার এক লৌকিক কাহিনী

শ্রীসরোজমোহন মিত্র

প্রাগাধুনিক যুগে কৃষিপ্রধান দেশে সাধারণ ধর্মভীরু মানুষ কৃষিকার্যের সহায়করূপেই দেবতার কল্পনা করেছিলেন। অনিশ্চিত প্রাকৃতিক অবস্থায় তারা এমন শক্তির আরাধন করেছিলেন যে খেয়ালী এবং অনিশ্চিত প্রকৃতিকে আশানুরূপ বশীভূত করতে পারবেন। পুরুষদেবতা সূর্যকে অসীম শক্তিধর মনে করে অতি প্রাচীনকাল থেকেই কৃষিকার্যে রত মানুষরা পূজা করত। সূর্য পূজা বৈদিক ও পৌরাণিককালেও প্রচলিত ছিল। বাঙ্গালাদেশ কৃষিপ্রধান। এদেশে আর্য সভ্যতা বিস্তৃত হবার পরে এই বৈদিক ও পৌরাণিক সূর্য পূজা প্রবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু এ ছাড়াও সূর্যোপাসনার কয়েকটি লৌকিকরূপের পরিচয় পাওয়া যায় বলে ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন। ধর্ম বা ইতু পূজা সূর্য পূজারই নামান্তর। তপা-ব্রত ও মাঘমণ্ডল ব্রত সূর্যেরই ব্রত। চড়ক অনুষ্ঠানটিকেও ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য আদিম সূর্য পূজা বলে অভিহিত করেছেন।

এই চড়ক অনুষ্ঠান শিবমন্দিরের বার্ষিক অনুষ্ঠানের একটি প্রধান অঙ্গ। এই শিবও কৃষি-দেবতা। প্রবাদে আছে "ধান ভানতে শিবের গীত"। এই শিব বাঙ্গলার নিজস্ব সৃষ্টি। লৌকিক দেবতাদিগের মধ্যে সর্বপ্রাচীন। বাঙ্গলার শিবমঙ্গল কাব্যের শিব বিশ্বকর্মাকে দিয়ে হাতের ত্রিশূল ভাঙ্গিয়ে জোয়াল, কোদাল,ফাল ইত্যাদি কৃষিকাজের সরঞ্জাম তৈরি করিয়েছিলেন। তারপর নিজ আবাস কৈলাস ছেড়ে শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমিতে পদার্পণ করে কৃষি-বৃত্তি দ্বারা জীবিকা অর্জন করতে লাগলেন।

কৃষিকার্যের সঙ্গে সূর্য এবং শিবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বহু উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু কৃষিকার্যের সঙ্গে 'নিশানাথ' বা চন্দ্রের কোন সম্পর্কের কথা ইতিপূর্বে শোনা যায়নি। সাম্প্রতিক কালে চন্দ্রপূজার এক ব্রতকথা সম্পর্কে একটি পুস্তিকা পাওয়া গিয়েছে। পুস্তিকাটি আপাতদৃষ্টিতে খুব মূল্যবান মনে না হলেও চন্দ্রকে কৃষি দেবতা হিসেবে কল্পনা করার মধ্যে একটা নিশ্চিত অভিনবত্ব আছে। সেদিক থেকে পুস্তিকখানি উল্লেখযোগ্য বলে গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

কথা-পরিচয়

পুস্তিকা সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে পুস্তিকার কথাবস্তু সম্পর্কে পরিচিত হওয়া যাক। এই কথার মূল জিজ্ঞাসা হোল—"জন্মাবধি দুঃখী মোরা কিসের কারণ?" এই জিজ্ঞাসা আধুনিক কালে যেমন প্রাচীন বা মধ্যযুগেও তেমনি ছিল। বর্তমান কালে আমরা জানি সভ্যতার প্রথম থেকেই এই সমাজ দ্বিধাবিভক্ত। এই সমাজ সভ্যতায় মুষ্টিমেয় মানুষ প্রদীপের আলোয় উল্লসিত কিন্তু বেশীর ভাগই সভ্যতার পিলসুজ—তাদের গা দিয়ে শুধু তেল গড়িয়ে পড়ে। তারা শুধু শ্রমজীবী। তারা কেবল পরিশ্রম করে অথচ তার ফলভোগ করতে পারে না। দারিদ্র্যের জ্বালা ভোগ করতে করতে তাদের মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগত "জন্মাবধি দুঃখী মোরা কিসের কারণ?" এই মৌল জিজ্ঞাসার বাস্তব উত্তর পুস্তিকার মধ্যে নেই।

এই পুস্তিকার কাহিনী হোল—একদিন হস্তিনা নগরের অধিপতি যুধিষ্ঠির নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, "দয়াময় দুঃখ দূর কিসে হয় বল।" তখন নারায়ণ যুধিষ্ঠিরকে এক অপূর্ব

বিবরণ বর্ণনা করলেন। অবন্তী নগরে ধর্ম নামে এক ব্রাহ্মণ পুত্র দিল। সে তপস্যা করে কাল কাটাত। "মহাদুঃখ পায় দ্বিজ সংসার মাঝারে। নিত্য ভিক্ষা না করিলে খেতে নাহি পারে।" এমনি করে বহুকাল কেটে গেল। একদিন দ্বিজপত্নী ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করল "জন্মাবধি দুঃখী মোরা কিসের কারণ?" দ্বিজ তার কোন সদুত্তর দিতে পারল না। শুধু বলল, জানি না কোন পাপে পাপী আমি। "বিধাতা করিল মোরে জনম দুঃখিত।" ঠিক করল ধর্ম উদ্দেশ্যে সে প্রাণ ত্যাগ করবে। সে কথা ভেবেই নারায়ণকে স্মরণ করে সে পূর্বদিকে যাত্রা করল।

বহুদূরে গিয়ে ব্রাহ্মণ দেখল 'কাঠরিয়া'রা সে পথে যাচ্ছে। এক বৃদ্ধ কাঠরিয়া ব্রাহ্মণকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। ব্রাহ্মণ নিজ পরিচয় দিয়ে বলল, "অন্ন বিনা নিজ দেশে দুঃখী নিরন্তর।" বৃদ্ধ কাঠরিয়াও বলল. "এদেশে মিলে না অন্ন শুনহে ব্রাহ্মণ। বহু কষ্টে মোরা করি সময় যাপন।" ব্রাহ্মণ বলল, সে ঈশ্বর উদ্দেশে প্রাণ ত্যাগ করতে যাচ্ছে। তখন কাঠরিয়া বলল, তাদেরও অনন্ত দুঃখ। "কাষ্ঠ বিক্রী নাহি হয় কিসের কারণ। কি উপায়ে করি এই জীবন ধারণ।" ঈশ্বরের সঙ্গে যদি দেখা হয় তাহলে তাদের কেন এই দুর্দশা ব্রাহ্মণ যেন জিজ্ঞেস করে। তখন ব্রাহ্মণ বলল, "গ্রন্থি এক দেও মম স্মরণ কারণ।" কাঠরিয়া তখন ধান্য তৃণে গ্রন্থি বেঁধে দিল।

এরপর ব্রাহ্মণের দেখা হোল 'কোঠরিয়া'র সঙ্গে। ব্রাহ্মণ ধর্মের উদ্দেশে যাচ্ছে শুনে কোঠরিয়া বলল, "আমি এত দুঃখ রাশি পাই কি কারণ? চূর্ণ বিক্রী বিনা মম রহে না জীবন।" তখন ব্রাহ্মণের কথামত সেও এক পূর্বমত গ্রন্থি বেঁধে দিল। আরও কত দূর গিয়ে দেখা হোল "বরজের সনে।" সেও বলল ধর্মদেবের সঙ্গে দেখা হলে অবশ্য আমার দুঃখের কারণ কি জেনে নেবে। ব্রাহ্মণের কথামত সেও এক গ্রন্থি বেঁধে দিল। আরও কিছুদূর গিয়ে তার সঙ্গে দেখা হোল 'সুরভি'র সঙ্গে। 'কামদুঘা ধেনু' ব্রাহ্মণকে বলল, "মম দুগ্ধ নরলোকে করে না গ্রহণ। দুগ্ধের বেদনা আমি ভুঞ্জি সর্বক্ষণ।" কোন অপরাধে তার এই দুর্দশা। ব্রাহ্মণের যাতে মনে থাকে সেজন্য গো-জননী 'বিচালিতে' গ্রন্থি বেঁধে দিল।

আরও কত দূরে গিয়ে ব্রাহ্মণের দেখা হোল এক হস্তীর সঙ্গে। "করী বলে দ্বিজ মম দুঃখ সুবিস্তর। রাজপাট হস্তী আমি বিপদ অপার।" তার দুঃখ জানবার জন্য সেও গ্রন্থি বেঁধে দিল। সেখান থেকে ব্রাহ্মণ গিয়ে প্রবেশ করল এক অরণ্যের মধ্যে। সেখানে দেখা হোল 'অমৃত ফলের তরু'র সঙ্গে। "ফল ভরে নতশির সংশয় জীবন। কিবা অপরাধে লোকে ফল নাহি খায়।" এর কারণ জিজ্ঞাসা করতে হবে। ব্রাহ্মণকে মনে করিয়ে দেবার জন্য সেই গাছও এক গ্রন্থি বেঁধে দিল।

সেখান থেকে ব্রাহ্মণ চলে গেল 'মহানদী তটে'। সেখানে সাক্ষাৎ হোল এক কুম্ভীরের সঙ্গে। পথিককে ব্রাহ্মণ জেনে বিনয়ের সঙ্গে কুম্ভীর বলল, "জলে অর্দ্ধ স্থলে অর্দ্ধ আছি দিবা নিশি। খাইতে মিলে না কিছু দুঃখ জলে ভাসি। রবি তাপে পোড়ে সদা শীতে কাঁপে প্রাণ। কি হেতু এতেক দুঃখ দিল ভগবান।" ধর্মের দেখা পেলে ব্রাহ্মণ এর কারণ জিজ্ঞেস করবেন। তখন ব্রাহ্মণকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য কুম্ভীরও এক গ্রন্থি বেঁধে দিল। কুম্ভীর বাহনে ব্রাহ্মণ সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে পূর্বমুখে চলল। ঈশ্বরের সন্ধানে "দুর্গম কানন বহু গিরি উত্তরিল। অনাহার ক্লেশে আর চলন শক্তি নেই। তবু ব্রাহ্মণ ঈশ্বরের দর্শন পেল না। ধর্মের দেখা না পেয়ে দ্বিজ মরবার সংকল্প করল।

অবশেষে "দ্বিজের দেখিয়া হেন উদাস লক্ষণ। দয়াযুক্ত হল তবে গোবিন্দের মন।"

ব্রাহ্মণ বেশে তখন ধর্ম এসে দ্বিজকে দর্শন দিল। দ্বিজ দ্বিজরূপী ধর্মকে জিজ্ঞেস করল, "জন্মাবধি দুঃখ পাই কিসের কারণ?" ধর্ম তখন ব্রাহ্মণকে বলল,

"ধান্য-পূর্ণিমার ব্রত কর দ্বিজমণি।
কুবের সমান ধনে হবে তুমি ধনী।
এই ব্রত করি ইন্দ্র হল দেবরাজ।
ব্রতকর দ্বিজবর করিও না ব্যাজ॥
পৌষের পূর্ণিমা অদ্য হল উপস্থিত।
ধন আকাঙ্খিয়া দ্বিজ কর সেই ব্রত॥"

পূজার সব রীতিও ব্রাহ্মণকে বলে দেওয়া হোল। সে অনুযায়ী সন্ধ্যাকালে ব্রাহ্মণ পূজা করতে বসল। "গনেশাদি পঞ্চদেব অগ্রেতে পুজিয়া। করিল চন্দ্রের পূজা পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া।" ধুপ দীপ নৈবেদ্য ইত্যাদি নানা উপচারে ব্রাহ্মণ ষোড়শ কলাতে পূজা করল। দ্বিজের ভক্তি দেখে দয়াময় দেব তখন ঘটে উদয় হলেন। তখন ব্রাহ্মণ গলবস্ত্র হয়ে তার যে স্তব করেছিল তার মধ্যেই চন্দ্রদেবের মাহাত্ম্য ফুটে উঠেছে :

"নমো নমো নিশাপতি দরিদ্রের ধন॥
ষোড়শ কলাতে তুমি ত্রিজগত জনে।
ষোড়শে করেছে তৃপ্ত অমৃত সেচনে॥
তমোরাশি নাশি দীপ্ত কর ভূমণ্ডল।
প্রসন্ন চকোর চিত্ত ভুবন ধবল॥
উদিত হইলে তুমি আনন্দ সবার।
অস্তাচলে গেলে তুমি মহা অন্ধকার॥
যুবতি সধবা তুষ্টা তব আগমনে।
চোর দস্যু ক্ষুণ্ণচিত্ত তোমার কিরণে॥
কুমুদ কহ্লার আদি হয় প্রস্ফুটিত।
নানাবিধ শস্য হেতু তোমার অমৃত॥
অধম জানিয়া কৃপা আমাকে করিবে।
দারিদ্র্য সাগর হতে সদা নিস্তারিবে॥"

আত্মপরিচয়ে ব্রাহ্মণ বলল, "অন্ন বিনা আমি সদা দুঃখিত সংসারে॥ কিবা অপরাধে মম এ দুঃখ ঘটেছে।" তখন বৃদ্ধ দ্বিজ বললেন, "ব্রতভঙ্গ অপরাধে দুঃখিত সর্ব্বথা।" ব্রত আরম্ভ করে তুমি খুব ধনবান হয়ে নিজ দেশে ফিরে গেলে। "অনেক সম্পদলাভে কুমতি হইল। একেবারে পঞ্চোৎসবে চিত্ত মিলে গেল॥" ব্রাহ্মণীও সেই মহানন্দে মত্ত হয়ে গেল।"ভার্য্যাসহ এই ব্রত তুমি না করিলে। পুত্র কন্যা দার সহ ভোজনে বসিলে।" সেজন্যই তোমার এত দুঃখ হয়েছে। অতএব "ব্রতফলে গেল দুঃখ ভাবিও না আর।" অর্থাৎ তোমাকে এই ব্রত করেই যেতে হবে।

ব্রাহ্মণ তখন কাষ্ঠকার, কোঠরিয়া, বরজ, সুরভি, হস্তী, আম্রতরু এবং কুম্ভীর এই সপ্ত প্রাণীর দুঃখের কারণ জানতে চাইল। তখন বৃদ্ধ দ্বিজ বলল :

"ইন্দ্রের অপ্সরাগণে ব্রত করেছিল।
স্নান হেতু সরোবর নিকটেতে গেল॥
শীত নিবারণ হেতু অগ্নি জ্বালিবারে।
চাহে কাষ্ঠ যাবে কষ্ট অগ্নির সঞ্চারে॥

কিন্তু কাষ্ঠ নাহি দিল কাষ্ঠকার দুষ্ট।
বৃথা হল মনোরথ পুরিল না ইষ্ট॥
কোঠরিয়া বরজে না দেয় চূর্ণ পান।
দুগ্ধবতী গাভী দুগ্ধ করিল না দান॥
পূজার কারণে বৃক্ষ ফল নাহি দিল।
ব্রতীগণ অলঙ্কার করী হরে নিল॥
কুম্ভীর আগ্রহ করে নিতে ব্রতীপ্রাণ।
সে হেতু দুঃখেতে কাল কাটায় এখন॥"

শুদ্ধচিত্তে বার বৎসর যে এই ব্রত করবে তারই মুক্তিলাভ হবে। এই কথা বলে 'ধর্মদ্বিজ' নিজ মায়া প্রকাশ করে অন্তর্হিত হয়ে গেল। নিজ দোষে ব্রাহ্মণ কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। সেজন্য ব্রাহ্মণ তখন আকুল হয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল। তখন কবি একটি তত্ত্ব কথা প্রচার করে দিল—

ওরে মন মূঢ়মতি বলি কর অবগতি,
কি গতি হইবে অন্তকালে।
কালের কুটিল গতি, কে বুঝিবে তার স্থিতি,
তব গতি নাহি দেখি ফলে॥
দিন গেল ভাবি দারা, দারা পুত্র কেবা তারা,
তব ধারা কেহ নহে তারা।
তারা ভাবে একা তারা, তুই কেন তারা তারা,
ভে'বে এবে হলি এই ধারা॥
যদি নিত্য ভাব তারা, অনিত্য হইবে তারা
নিত্য তারা করহ স্মরণ।
অশিব নাশিবে তারা, মুদি নয়নের তারা,
তারাপদ ভাব ওরে মন॥"

ব্রাহ্মণের ব্যাকুল ক্রন্দন দেখে দয়াময় সদয় হলেন। তখন দৈববাণী হোল—তুমি বাড়ি গিয়ে ব্রত কর তাহলেই তোমার দরিদ্রতা দূর হবে ব্রাহ্মণ তারপরে ফিরতি পথে নিজ দেশে গেল। পথে একে একে পূর্বের সপ্ত প্রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হোল। ব্রাহ্মণ প্রত্যেককে তাদের দুঃখের কারণ জানিয়ে বললেন, তোমরা ভক্তিভাবে ব্রতী ব্রাহ্মণের সেবা কর, তাহলেই তোমাদের মুক্তি হবে। কুম্ভীর তখন তার উদরস্থিত অনন্ত রতন উদ্গারি ব্রাহ্মণের পায়ের কাছে দিল। ব্রাহ্মণ তার হাত থেকে একটি গ্রন্থি খুলে ফেলল। তারপর গাছকে বলল তুমি বার বৎসর ব্রতী দ্বিজে সেবা কর। তখন অমৃত ফলের গাছ ব্রাহ্মণের সঙ্গে চলতে আরম্ভ করল। হস্তী ব্রাহ্মণকে পৃষ্ঠে করে দেশের দিকে চলল। সুরভিও দ্বাদশ বৎসর কাল সদা দুগ্ধ দেওয়ার জন্য ব্রাহ্মণের সঙ্গী হোল। বরজও বার বৎসর সুস্বাদু তাম্বুল যোগান দেবে বলে ব্রাহ্মণের সঙ্গী হোল। কোঠরিয়া, কাঠরিয়াগণও একইভাবে ব্রাহ্মণের সঙ্গী হোল। বহু দিন পরে দ্বিজ নিজ বাসে ফিরে গেল। ব্রাহ্মণীকে সব ধন রত্ন দিল। সঙ্গী সকলকে উপযুক্ত স্থানে ও ভাবে রাখল। ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণের ধন রত্ন দাস দাসী প্রচুর হোল।

নারায়ণ তখন যুধিষ্ঠিরকে বললেন, এতক্ষণ তোমাকে আমি ব্রতভঙ্গপাপের কথা বললাম। "ব্রতভঙ্গ করিবে না কদাপি স্বজ্ঞানে।" সেই ব্রাহ্মণ যতদিন জীবিত ছিল ততদিন

দারা পুত্র সহ ব্রত করল এবং এ ভাবে অভীপ্সিত সুখভোগে জীবন কাটিয়ে প্রাণান্তে চন্দ্রলোক গিয়ে সুখ লাভ করল। অতএব—

"এক মনে ব্রত যেবা জন্মাবধি করে।
ভক্তিভাবে ব্রত কথা শুনে কর্ণ ভরে॥
সকল আপদনাশ তাহার নিশ্চয়।
চন্দ্রের প্রসাদে সদা ধন পূর্ণ হয়॥

এই ব্রত করলে চন্দ্রের প্রসাদে সব দুঃখ তিরোহিত হয়। অবশ্য এই কথা প্রায় প্রত্যেক দেব-দেবীর মাহাত্ম্যসূচক কাহিনীতেই বলা হয়।

পুস্তী পরিচয় :

পুস্তিকাটির কাহিনী-বিন্যাস থেকেই স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এই ব্রতের নাম ধান্যপূর্ণিমা-ব্রত এবং এর আরাধ্য দেবতা নিশানাথ চন্দ্র। এই ব্রতকথার একেবারে প্রথমে আছে সর্বসিদ্ধিদাতা গণপতি প্রণাম। তারপর গুরু বন্দনা, সরস্বতী বন্দনা, শঙ্কর-শঙ্করী বন্দনা, মাতৃপিতৃ প্রণাম, রাম-সীতা বন্দনা, দুর্গা-কালী, রাধা-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী-মহাদেব বন্দনা।

তারপরে আছে জগৎহিতের জন্য দ্বাপরে বাসুদেব-দেবকী ঘরে কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মাবার কথা। রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধার্মিক যুধিষ্ঠির হস্তিনায় সব সময় কৃষ্ণকে নিজের কাছে রাখতেন। সেই কৃষ্ণই এই ব্রত কাহিনী বর্ণনা করলেন।

এই ব্রত কথার রচয়িতা হলেন যাদবেন্দ্র বা যাদবকৃষ্ণ। নিজের নামোল্লেখ ছাড়া যাদবেন্দ্র নিজের সম্পর্কে আর কোন পরিচয় দেননি। পুস্তিকার ভাষা সহজ সরল, সহজবোধ্য, অর্বাচীন। পুস্তীটি মুদ্রিত আকারে পাওয়া গিয়েছে। প্রথম দিকে নামপত্র না থাকায় এ সম্পর্কে বেশী কিছু বলা সম্ভব নয়। মাতাপিতাকে অসংখ্য প্রণাম জানাতে গিয়ে কবি নিজেকে 'মূর্খপুত্র' বলে অভিহিত করেছেন। পুস্তীর ভাষাশৈলি দেখে মনে হয় এটা কবির বিনয় প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়।

এই পুস্তীটি বর্তমান বাংলাদেশের নোয়াখালি জেলার দেওপাড়া গ্রাম থেকে প্রাপ্ত। কৃষিপ্রধান অঞ্চল বলে ওখানে পৌষ পূর্ণিমায় এই ধান্য পূর্ণিমার ব্রত কথা পালন করা হোত বা চন্দ্রপূজা করা হোত। পৌষ মাসে পাকা ধান ঘরে চলে আসে। কৃষকের ঘরে ঘরে বৎসরান্তে হাসিখুশীভাব দেখা দেয়। সাময়িকের জন্য চির দুঃখের কথা বা দারিদ্রের কথা কৃষক বিস্মৃত হয়। এমনি করে যেন তাদের দারিদ্র্য চিরদিনের জন্য দূরীভূত হয় সেজন্যই পৌষ পূর্ণিমাকে ধান্য পূর্ণিমা মনে করে এই ব্রত পালন করা হোত। তখন নিশা-পতিকেই অগতির গতি বলে মনে করা স্বাভাবিক।

কতকাল থেকে এই ধান্যপূর্ণিমা বা চন্দ্রপূজার প্রচলন ছিল সেটা এই পুস্তিকা থেকে পাওয়া যাবে না। হাতে লেখা পুথি হলে তার থেকে এর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে একটা অনুমান করা যেত। কিন্তু পুস্তিকাটি মুদ্রিত বলে তাকে সেই প্রাচীনত্বের গৌরব দেওয়াও সম্ভব নয়। তবে পুস্তিকাটি বা তার ভাষা প্রাচীন না হলেও তার বিষয়বস্তু বিচার করলে বোঝা যায় এই ধারণা কৃষিকার্যের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। সাধারণ গ্রামীণ জীবনে দারিদ্র্য নিত্যসঙ্গী। তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অলৌকিক নির্ভরতার চিন্তা নিঃসন্দেহে মধ্যযুগীয়। এর মধ্য দিয়ে আমরা গ্রাম বাঙলার বাস্তব পরিচয় এবং অসহায় আকুতির নিখুঁত চিত্র পাই। তাছাড়া বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই পুস্তিকার অভিনবত্ব অবশ্য স্বীকার্য।

শ্রমিকশ্রেণীর আত্মসম্মান ও মর্যাদার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বামফ্রন্ট সরকারের প্রয়াস।

শ্রম সম্পদের উৎস। এদেশে এখনও শ্রমিকশ্রেণী তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে সাধারণতঃ বঞ্চিত। তাই নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য তারা নিরন্তর সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছেন। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন থাকার ফলে শ্রমিকশ্রেণী তাদের জীবন ও জীবিকার ন্যায্য সংগ্রামে আজ বিরাট সমর্থন পাচ্ছেন। তারা অনুভব করতে পেরেছেন বামফ্রন্ট সরকার তাদের পরম বন্ধু। শ্রমনীতির অনুকূল অবস্থার ফলে আজ শিল্পে নতুন উদ্দীপনা ও উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে—যা আগামীদিনের সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি বহন করছে।

সরকারের ঐকান্তিক প্রয়াসে ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার ও তার আইনসঙ্গত নির্বিঘ্ন অগ্রগতির ফলে শ্রমিকশ্রেণীর আত্মবিশ্বাস ও সম্মান আজ স্বমর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত।

গত ছ'বছরে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় ও জীবিকার মান উন্নয়নে বামফ্রন্ট সরকার নির্দিষ্ট কতগুলি ব্যবস্থা কার্যকরী করেছেন।

* গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ত্রিপাক্ষিক উপদেষ্টা পর্ষদগুলির পুনরুজ্জীবন ও পুনর্গঠনের বলিষ্ঠ নীতির প্রতিষ্ঠা এবং দাবীদাওয়া মীমাংসার ক্ষেত্রে যৌথ প্রয়াসের নীতিকে উৎসাহিত করার ফলে প্রধান প্রধান শিল্পগুলিতে যে চুক্তি হয়েছে তা রাজ্যের এক অবিচ্ছিন্ন শান্তিপূর্ণ শ্রমনীতির সম্ভাবনা বহন করছে।

* ঠিকা শ্রমিক যারা তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন; বহুক্ষেত্রে তা রদ করা হয়েছে।

* জরুরী অবস্থার সময়ে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন তারা আবার পূর্ণ সুযোগ-সুবিধাসহ পুনর্নিযুক্ত হয়েছেন।

* রাজ্যের বিভিন্ন শ্রম আইনগুলির উপযুক্ত সংশোধনের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা ও অন্যান্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

* বেকার সহায়ক প্রকল্পের মাধ্যমে ৪.২৭ লক্ষ জন কাজের সুযোগ পেয়েছেন এবং ৬০.৩১ কোটি টাকা এ পর্যন্ত খরচ করা হয়েছে। এর ফলে ১৫ লক্ষ শ্রম-দিবস সৃষ্টি হয়েছে।

* ৩৩টি ভিন্নতর কাজের জন্য সর্বনিম্ন মজুরী বলবৎ করা হয়েছে। কৃষি শ্রমিক এবং বিড়ি শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এই মজুরীর সংশোধিত ঊর্ধ্বতন হারের ব্যবস্থা হয়েছে।

শ্রমিকদের বাড়ি ভাড়া ভাতা-আইনের সংশোধনের ফলে ন্যূনতম বরাদ্দ ভাতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

* ৫১.৯০ লক্ষ মানুষ ই. এস. আই (এম.) প্রকল্পে উপকৃত হয়েছেন। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম বহির্বিভাগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৬টি সার্ভিস ডিসপেনসারি এবং ১১০০ শয্যা বিশিষ্ট ৩টি নতুন হাসপাতালের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

* চা শিল্প শ্রমিকদের বাসস্থানের সুব্যবস্থার জন্য ২০০০ বাড়ি তৈরির প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

বামফ্রন্ট সরকার শ্রমজীবি মানুষের স্বার্থরক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

তথ্য ও সংস্কৃতি ৮৮৮৪/৮৩

শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করের 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস'

শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল

৮০ বছর আগে ১৩০৭ সনের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় রাখালদাস কাব্যতীর্থ মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করের 'শ্রীকৃষ্ণবিলাসে'র যৎসামান্য পরিচয় দেন (পৃ. ২৩৪—৪১)। ৬০ বছরেরও বেশি আগে ১৩২৬ সনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সম্পাদনায় শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করের 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের 'সম্পাদকীয় বক্তব্যে' প্রকাশ—বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের একখানি পুথি অবলম্বন করেই আলোচ্য গ্রন্থটির সম্পাদন এবং পুথিখানি 'তত পুরাণ নহে'। মুদ্রিত গ্রন্থের শেষে লেখা আছে—'ইতি শ্রীকৃষ্ণবিলাস সম্পূর্ণ'। যদিও রচনার শেষে কবির ভণিতা পর্যন্ত পাওয়া যায় না। আসলে প্রকাশিত গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ নয়। সে কথা পরে বলছি।

কবির ভণিতায় কেবল শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর নামটুকু পাওয়া যায়। এ নাম তাঁর গুরুদত্ত।

> ব্রাহ্মণকুমার গুরু অতি দয়াবান। কর্ণে মন্ত্র দিয়া মোরে কৈল পরিত্রাণ ॥
> সেই ক্ষণে শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর নাম থুঞা। আজ্ঞা কৈল শ্রীনন্দনন্দন ভজ গিয়া ॥
>
> রাখালবাবুর প্রবন্ধ, সা. প. পত্রিকা, ১৩০৭, পৃ. ২৩৪

কবি গুরুর নাম ও তাঁর তিরোভাবের সংবাদও আমাদের জানিয়েছেন—

> বিপ্রকুলে জন্ম নাম শ্রীগোপাল দাস। আজন্ম ভরিঞা কৈল গুরুতে বিশ্বাস ॥
> অকুমার ব্রতে দেহ করিয়া শোধন। অন্তে সুরধুনী মধ্যে পাইল নির্বাণ ॥[১]
>
> ঐ ঐ পৃ. ২৩৬

কবি মাতাপিতার বন্দনা করলেও গ্রন্থমধ্যে তাঁদের নাম পাওয়া যায় না।

রাখালবাবু ও অমূল্যবাবু উভয়েই মনে করেন—মহাভারতকার কাশীরামদাসের অগ্রজ শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর 'শ্রীকৃষ্ণবিলাসে'র কবি। তাঁদের পক্ষে যুক্তি—কাশীরামের অনুজ গদাধর দাস তাঁর 'জগন্নাথমঙ্গলে' লিখেছেন যে, জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর 'রচিল কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর'। পক্ষান্তরে 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-কার ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় অনুমান করেন—জয়গোপাল দাসের 'ভক্তিভাব প্রদীপে'র অনুবাদক কৃষ্ণকিঙ্কর 'শ্রীকৃষ্ণবিলাসে'র রচয়িতা বা অনুবাদক হওয়া সম্ভব। তাঁর আরো অনুমান—জয়গোপাল দাস বোধ হয় সংস্কৃতে 'কৃষ্ণবিলাস' লিখে থাকবেন,[২] ঘনশ্যাম দাস ও শ্রীকৃষ্ণ-

---

১। পাঠান্তর—'পাইল নারায়ণ' (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড ১ম সংস্করণ ১৯৪০, পৃ. ৪৭৮), অথচ ঐ ইতিহাসেরই পরবর্তী সংস্করণে লেখা হল, " উক্ত শ্রীগোপাল দাস কে ? ইনি কি শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করের গুরু যাহাকে আমি জয়গোপাল দাস বলিয়া অনুমান করিতেছি ? না রচয়িতার নিজের নাম অথবা পরিচিতি (শ্রীগোপালের=জয়গোপালের দাস)" (১ম খণ্ড অপরার্ধ ১৯৭৫, পৃ. ৭০)—সুরধুনী মধ্যে নির্বাণ বা নারায়ণপ্রাপ্তির পর নিশ্চয়ই কেউ গ্রন্থরচনা করতে আসে না। অতএব গোপালদাসকে কবি ভাববার অবকাশ কোথায় ?

২। মধুসূদন অধিকারী-সম্পাদিত (১৩২২) জয়গোপালদাসের সংস্কৃত 'শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস' গ্রন্থটি আমরা দেখেছি। এতে ছয়টি 'প্রবন্ধে' নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বর্ণিত হয়েছে : ১। বৃন্দাবন বর্ণনা, ২। কৃষ্ণ, ব্রজাঙ্গনা ও কৃষ্ণলীলা সঙ্গীদের বর্ণনা, ৩। বনবিহার, ৪। রাসক্রীড়া, ৫। তালভক্ষণ, বস্ত্রহরণ, দানলীলা, নৌকালীলাদির রহস্য

কিঙ্করের 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' সংস্কৃত 'কৃষ্ণবিলাস'-এর অনুবাদ না হলেও সেই গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত হওয়া অসম্ভব নয় (১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ১৯৭৫, পৃ. ৭০) 'ভক্তিভাব প্রদীপে'র অনুবাদক কৃষ্ণকিঙ্করের পিতার নাম সুন্দরানন্দ—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একখানি পুথি থেকে (নং - ৩০৬৫) সেন মহাশয় এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণবিলাস-কবি শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করের বিস্তারিত পরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত কোন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা কঠিন।

গ্রন্থমধ্যে কাব্যের রচনকাল পাওয়া যায় না। রাখালবাবুর ব্যবহৃত পুথির লিপিকাল '১১৩২ সাল' [১৭২৫-২৬] খ্রীস্টাব্দ কবিকে সপ্তদশ শতাব্দের শেষার্ধে ধরলে ভুল হবার সম্ভাবনা বোধ হয় কম।

কাব্যের বিষয়বস্তু—'শুদ্ধ ভক্তিযোগ'।

শ্রীকৃষ্ণবিলাস নাম শুদ্ধ ভক্তিযোগ   শ্রবণ করিলে ঘুচে মনের বিয়োগ॥

ঐ ঐ ঐ পৃ. ২৩৪

এই শুদ্ধ ভক্তিযোগ প্রচার করতে কবি নয়জন ভক্তের কাহিনী অবলম্বন করেছেন—

অদিতি কশ্যপ ধ্রুব কশিপুনন্দন। রুক্মাঙ্গদ ভগীরথ বৃন্দা ধরা দ্রোণ॥
এই নয়জন ভক্তি কৈল গুরুতর। কহিব সে সব কথা পুরাণ গোচর॥

মুদ্রিত গ্রন্থ, পৃ. ১

অদিতি ও কশ্যপ এবং ধরা ও দ্রোণ ভক্তিবলে ঈশ্বরকে পুত্ররূপে লাভ করেন। অদিতি ও কশ্যপের গৃহে বামনরূপে এবং ধরা ও দ্রোণের (জন্মান্তরে নন্দ ও যশোদার) ভবনে কৃষ্ণরূপে ঈশ্বর আবির্ভূত হন। ছাপা বই এ বামন উপাখ্যান ও অসম্পূর্ণ কৃষ্ণকথা (শোণিতপুর থেকে ঊষা-অনিরুদ্ধের উদ্ধারসাধন পর্যন্ত) পাওয়া যায়—ধ্রুব, প্রহ্লাদ, রুক্মাঙ্গদ, ভগীরথ বা বৃন্দার কোন 'পুরাণ-গোচর' কাহিনী পাওয়া যায় না। কাজেই বসন্তবাবুর পুথিখানি যে অসম্পূর্ণ, তা সহজেই অনুমেয়। রাখালবাবু একখানি সম্পূর্ণ পুথি অবলম্বন করেই প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, সেখানি বোধহয় আজ এসিয়াটিক সোসাইটির সম্পত্তি (পুথি নং গ ৫৩৯৫, পত্র সংখ্যা ১-১৭৬, লিপিকাল ১১৩২)। ছাপা বই-এ ঐ পুথির ১-৭৮ পত্রের বিষয় পর্যন্ত স্থান পেয়েছে, বাকি ৯৮ পত্র অর্থাৎ ১৯৬ পৃষ্ঠাই অমুদ্রিত।[৩] ঊষা অনিরুদ্ধের উদ্ধারের পর প্রভাবতীহরণ, সুদাম উপাখ্যান, কৃষ্ণার্জুন

বর্ণনা ও ৬। অনুরাগ বর্ণনা। গ্রন্থের রচনাকাল ১৫১৭ শকাব্দ—'শাকে জলনিধি শশভৃদ্বাণ সুধাংশৌ প্রযত্ন বাহুল্যাদয়ং'—[১৫৯৫-৯৬ খ্রীস্টাব্দ]। সংস্কৃত 'শ্রীকৃষ্ণ-বিলাসে'র সঙ্গে ঘনশ্যামদাসের বাংলা 'শ্রীকৃষ্ণবিলাসে'র প্রথমাংশের সুগভীর মিল আছে (প্রবন্ধান্তরে আলোচ্য)। শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করের 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' সম্পর্কে সে কথা বলা যায় না। মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁদরা গ্রামে জয়গোপাল দাসের বংশধরগণ অদ্যাপি বাস করছেন বলে অধিকারী মহাশয় সংবাদ দিয়েছেন। এঁরা জাতিতে কায়স্থ। ডঃ সত্যকুমার গিরি মহাশয় সংস্কৃত 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' গ্রন্থটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এজন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

৩। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' কার লিখেছেন—"বইটির একটি খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ পুথির সন্ধান মিলিয়াছে। তাহা অমূল্য বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় ছাপা হইয়াছে ?" পাদটীকায় খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ পুথির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—গ৫৩৯৫ (১ম খণ্ড, অপরার্ধ ১৯৭৫, পৃ. ৬৯) এ কথা ঠিক নয়। ঐ ইতিহাসেরই ১ম খণ্ড ২য় সংস্করণে বলা হয়েছে যে, গ ৫৩৯৫ পুথি অবলম্বনে কাব্যটির পরিচয় প্রকাশ করেন রাখালদাস কাব্যতীর্থ। খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ পুথি অবলম্বনে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক কাব্যটি সম্পাদিত (পৃ. ৪২৬)। রাখালবাবুর প্রবন্ধে ধ্রুব উপাখ্যানের যে দীর্ঘ উদ্ধৃতি আছে, ছাপা বই-এ তার কিছুই নেই।

কর্তৃক ব্রাহ্মণের মৃতপুত্র আনয়ন, বলরামের বিক্রম, জরাসন্ধবধ, সুভদ্রাহরণ, কৃষ্ণের প্রভাসগমন, উদ্ধবকে কৃষ্ণের যোগশিক্ষাদান, যদুবংশধ্বংস ও কৃষ্ণের দেহত্যাগের পর বলা হয়েছে—

যে কিছু কহিল চারিজনার ভজন কহিল সকল কথা শাস্ত্রনিরূপণ ॥ ১০৯খ
(এসিয়াটিক সোসাইটির পুথি)

এরপর যথাক্রমে ধ্রুব, ভগীরথ, রুক্মাঙ্গদ, বৃন্দা ও প্রহ্লাদের ভজন বর্ণিত হয়েছে। আমরা সংক্ষেপে সেগুলির ধারাবাহিক পরিচয় দিচ্ছি, এসিয়াটিক সোসাইটির পুথি থেকে।

বিমাতা সুরুচি ধ্রুবকে বললেন—

যদি রাজ সিংহাসনে আছ এ বাসনা। তবে উর্ধ্বপদে রহি করহ কামনা ॥ ১১৩খ

ধ্রুব তপস্যা করতে বনে গেল। সেখানে সাতজন ঋষির সঙ্গে তার দেখা হল। তাঁরা সকলেই তাকে ঈশ্বরারাধনার উপদেশ দিলেন। নারদ কিন্তু বললেন—

ঘরে যাঞা ছাত্রশালে কর অধ্যয়ন। যৌবনে রমণী সঙ্গ করিহ যতন ॥
পুত্র জন্মাইঞা বনে করিহ প্রবেশ। সমগ্র তপের ফল দিব হৃষীকেশ ॥ ১১৭খ
কিন্তু ধ্রুবের আগ্রহাতিশয্যে (খ) নারদ তাকে বিষ্ণু-আরাধনার নিয়মপদ্ধতি জানালেন—
ধৌতবস্ত্র পরিঞা করিহ আচমন। তার পিছে কর ন্যাস করিয়া যতন ॥
তার পিছে অঙ্গন্যাস ভূতশুদ্ধি করি। প্রাণায়াম বাউ বন্দি নাসিকাতে পুরি ॥
মন্ত্রপূর্ণ হৈলে শ্বাস করিয়া মোক্ষণ। রেচক কুম্ভক এই ন্যাস নিরূপণ ॥
ইঙ্গলা পিঙ্গলা দুই নাড়ী দেহে আছে। সুষুম্না ভেদিঞা বাউ উর্ধ্ব পথে আছে ॥
নাড়ীতে দেখিহ ব্রহ্মা হৃদে নারায়ণ। ললাটে দেখিহ রুদ্র অচঞ্চল মন ॥
অধো নাড়ীদেশে পাপপুরুষ চিন্তিহ। প্রাণায়ামে সেই পাপ শুখাঞা পোড়াহ ॥১১৮ক-খ

নারদ ধ্রুবকে দ্বাদশাক্ষর মহামন্ত্রদান করলেন। কঠোর তপস্যায় ধ্রুব নারায়ণের দর্শনলাভ করল। নারায়ণ বললেন—সপ্তর্ষির উর্ধ্বে তোমার ভুবন নির্ধারিত।

তথা এক কল্পাবধি তোমার বসতি। ধ্রুবলোক বলি তার রহিব খেয়াতি ॥
তোমা বিদ্যমানে ইন্দ্র চতুর্দশ নাশ। এতকাল তথা থাকি যাবে মোর পাশ ॥ ১২১খ

নারায়ণের উপদেশে ধ্রুব দেশে প্রত্যাবর্তন করল। রাজা উত্থানপাদ ধ্রুবকে রাজ্যদান করে বানপ্রস্থ অবলম্বনের অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন—

নিজ সুখে দিব আমি ধ্রুবে রাজ্যখণ্ড। বিচিত্র নির্মাণে আন ছাতা নবদণ্ড ॥
নবদণ্ড পাদুকা চামর হাতে করি। সত্বরে উত্তম আইলা ধ্রুব বরাবরি ॥
উত্তমে দেখিয়া রাজা আজ্ঞা দিল তারে। নবদণ্ড ছত্র ধর ধ্রুবের উপরে ॥ ১২৩খ

সুরুচির পুত্র উত্তম একদিন মৃগয়াতে গিয়ে গন্ধর্বের হাতে প্রাণ হারাল। বহুদিন রাজত্ব করার পর ধ্রুব 'সত্যলোক' গমন করলেন।

এরপর ভগীরথের কাহিনী। অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে গিয়ে সগরবংশ ধ্বংস হল। সগরের পৌত্র অংশুমানকে কপিলমুনি উপদেশ দিলেন, মর্ত্যে গঙ্গা এনে পিতৃপুরুষদের উদ্ধারসাধন করতে। অংশুমান ও তৎপুত্র দিলীপ তপস্যা করেও গঙ্গা আনতে পারলেন না। দিলীপের পুত্র ভগীরথ তপস্যার কালে ইন্দ্রের সাক্ষাৎলাভ করলেন। ইন্দ্র ভগীরথকে উপদেশ দিলেন—

গঙ্গা আনিবারে যদি করিয়াছ মন। সত্বরে চলিয়া যাহ শিবের ভুবন ॥ ১২৮খ

কৈলাসে ঊর্ধ্ব যুক্ত করে শিবের তপস্যা করলে শিব ভগীরথকে নির্দেশ দিলেন— ক্ষীরোদসমুদ্রে শ্রীহরির আরাধনা করতে। তপস্যায় তুষ্ট শ্রীহরি ভগীরথকে বর দিলেন—

যে গঙ্গারে মুনিসিদ্ধা না পায় দেখিতে। হেনক দুর্লভ গঙ্গা যাইব মরতে ॥১২৮খ

শ্রীহরি ভগীরথকে নিয়ে ব্রহ্মার কাছে গেলেন। ব্রহ্মা পাদ্যার্ঘ্য দিতে গেলে—

ব্রহ্মার সদনে যথা ছিল যত জল। বিষ্ণুর মায়াতে তাহা হরিল সকল ॥
হেন বেলে সে ব্রহ্মার মনে পড়ি গেল। কমণ্ডুল জল আনি পাদ্য অর্ঘ্য দিল ॥
পদরজে বিহার করিঞা সেইজল। বহিঞা চলিল পথে অতি নিরমল ॥
তা দেখি গোবিন্দ মনে আনন্দ জন্মিল। হাথসানে ভগীরথে গঙ্গা দেখাইল ॥
গোবিন্দের ইঙ্গিত বুঝিঞা মহাশয়। চলিলা গঙ্গার পিছে হইঞা নির্ভয় ॥ ১২৯ক

গঙ্গা সত্যলোক, তপলোক, জললোক, মহর্লোক, ধ্রুবলোক, গুরুলোক, শুক্রলোক, মঙ্গললোক, বসুলোক, নক্ষত্রলোক, চন্দ্রমণ্ডল, সূর্যমণ্ডল অতিক্রম করে দক্ষের রাজ্যে উপস্থিত হলেন। সেখান থেকে ধর্মপুর, গরুড়পুর, বিদ্যাধরপুর, তক্ষকনগর পার হয়ে পিতৃলোকে পৌঁছলেন। সেখান থেকে হাজির হলেন সুমেরুতে।

সুমেরুতে গঙ্গা যদি পড়িল আসিঞা। একার্ণব হৈল জল পর্বত জুড়িঞা ॥
চতুর্দিগে শৃঙ্গমধ্যে সে গঙ্গার পানি। হিল্লোল কল্লোলে রাত্রিদিন নাহি জানি ॥ ১৩০ক

ভগীরথ ফাঁপরে পড়লেন। ইন্দ্রের শরণ নিলে ইন্দ্র ঐরাবতকে আদেশ দিলেন 'সুমেরুতে চারিদ্বার, কর শীঘ্রগতি'। ঐরাবতের দন্তাঘাতে সুমেরু খান খান হয়ে গেল। চারিদ্বারে গঙ্গার চারিধারা বইল।

সিত বক্ষ ভদ্রা শ্রীঅলোকনন্দা নাম। চারিদ্বারে চারি নাম হইল অনুপাম ॥১৩০ক

গঙ্গা অতল, বিতল, সুতল, তলাতল হয়ে মহাতলে এসে বিশ্রাম নিলেন। তারপর রসাতল, পাতালভেদ করে কূর্মের পৃষ্ঠে পতিত হলেন। এখন গঙ্গা হিমালয়ে এসে পৌঁছুলেন। সেখানে শিব গঙ্গাকে জটার মধ্যে ধারণ করলেন। গঙ্গাকে দেখতে না পেয়ে ভগীরথ কাঁদতে লাগলেন। তা দেখে শিব 'জটা বিদারিঞা গঙ্গা দিল ততক্ষণ'। গঙ্গা বললেন—

এথনে চলিব আমি মরতের পথ। শঙ্খ বাজাইঞা আগে চল ভগীরথ ॥ ১৩১ক

এবার ভগীরথ আগে, গঙ্গা পশ্চাতে। মানস সরোবর অতিক্রম করে গঙ্গা ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষে দশমী মঙ্গলবার হস্তানক্ষত্রে গঙ্গা বেণীমাধবে এসে পৌঁছুলেন। এরপর ত্রিবেণী প্রয়াগ অতিক্রম করে বারাণসী। সেখানে জহ্নুমুনির আশ্রমের ফুলফল সব জলে ভেসে গেল। 'তে কারণে পিল মুনি সর্বগঙ্গাজল'। কাতর ভগীরথ মুনিকে বললেন—

যদি বা না দেহ গঙ্গা শুন মুনিবর। আত্মঘাতী হব আমি তোমার গোচর ॥১৩১খ

মুনি ভাবলেন—

মুখে দিলে উচ্ছিষ্ট আছ-এ বেদবাণী। বুক বিদারিলে দেহে না রহে পরাণি ॥
ধ্যানস্থ হইঞা মুনি কৈল অনুমান। কর্ণপথে দিএ গঙ্গা করিল নিদান ॥১৩১খ

এরপর গঙ্গা দক্ষিণমুখী। কণ্টকনগর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর হয়ে সপ্তগ্রামে এসে গঙ্গার স্রোত প্রবল হল। সহস্রমুখী হয়ে গঙ্গা সমুদ্রে প্রবেশ করলেন।

সে স্থানের নাম গঙ্গাসাগরসঙ্গম। ধরণীতে তীর্থ নাহি তাহার উপম ॥১৩১খ

যেখানে ভগীরথের পিতৃপুরুষরা ভস্ম হয়েছিলেন, গঙ্গা সেখানে উপস্থিত হলেন।

সে গঙ্গার জলে যেই ভস্ম মিশাইল। চতুর্ভুজ হঞা সব কুমার উঠিল ॥১৩১খ

তারপর যথারীতি তাঁদের স্বর্গারোহণ। জগৎতারণ 'ব্রহ্মই নারায়ণ' ভগীরথকে স্বরাজ্যে যেতে উপদেশ দিয়ে 'সত্য-লোকে' চলে গেলেন। যুবরাজ শ্রুতকীর্তিকে রাজ্যভার অর্পণ করে ভগীরথ 'গঙ্গানারায়ণে'র নাম জপ করতে করতে স্বর্গারোহণ করলেন।

এরপর রুক্মাঙ্গদের কাহিনী। দ্বারাবতীর রাজা রুক্মাঙ্গদ পরম নিষ্ঠার সঙ্গে একাদশী ব্রত পালন করেন।

স্বদেশসমেত করে ব্রত উপবাস। হস্তী ঘোড়া আদি নাহি খাএ পানি ঘাস।
জন্মিল বালকে মাত্র নাহি দেই স্তন। নিরম্বুসাধনে ব্রত করে সর্বজন ॥১৩৩ক

ফলে সে-দেশে যেই মরুক সেই বৈকুণ্ঠে যায়। একদিন একজনের মৃত্যুতে যমদূত এসে বিষ্ণুদূতের কাছে অপমানিত হয়। যমদূত ধর্মরাজের কাছে নালিশ জানালে ধর্মরাজ চিত্র-গুপ্তের সঙ্গে পরামর্শ করে ব্রহ্মার কাছে গেলেন। নারদও তাঁদের সঙ্গী হলেন।

বিষাদ ভাবিঞা যম বসিলা ভূমিতে। নিজ নিবেদন কৈল কান্দিতে কান্দিতে ॥১৩৩খ

শুনে ব্রহ্মা বললেন, রুক্মাঙ্গদ অতি বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ রাজা। একাদশীব্রত ছাড়া তাঁর দ্বিতীয় কোন চিন্তা নেই। তাঁর প্রজাদের আনবার আশা ত্যাগ কর। নারদ পরামর্শ দিলেন—যজ্ঞ আরাধনা করে এক কন্যার সৃষ্টি কর, সেই কন্যা রুক্মাঙ্গদকে প্রলুব্ধ করুক, তাতেই রাজার ভক্তি বিচলিত হবে।

মহাযজ্ঞ শুরু হল। যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতে তা থেকে এক কন্যার উৎপত্তি হল।
বিজুরীর ছটা জিনি দেহের বরণ। মোহিনী বলিঞা নাম থুইল দেবগণ ॥
অতি অপরূপ কন্যা যেন বিদ্যাধরী। দেবঋষি কৈল তাঁরে ব্রহ্মার ঝিয়ারী ॥১৩৪ক

ব্রহ্মাকে প্রণাম করে কন্যা জানতে চাইল, তাকে কি কাজ করতে হবে। কিন্তু হায়, 'মোহিনী দেখিঞা ব্রহ্মা কামে অচেতন'। কন্যা বলল—

আমি কন্যা তুমি পিতা বেদ-নিয়োজিত। হেন তুমি মোরে কেনে দেখ বিপরীত ॥
কোপমন হঞা কন্যা দিল শাপবাণী। সম্পাতে অপূর্ণ হবে শুনহ কাহিনী ॥
তার পিছে কামে শাপ দিল দুরাশয়। শিবের লোচনে তুমি হবে পরাজয় ॥১৩৪ক

লজ্জিত ব্রহ্মা নারদের উপর কন্যার ভারার্পণ করলেন। নারদ এক বনের মধ্যে কন্যাকে অপেক্ষা করতে বলে দ্বারাবতী প্রবেশ করলেন। সেখানে রাজাকে বললেন, নগরপ্রান্তে বনে এক রূপসী কন্যা বসে আছে; অপ্সরী, কিন্নরী কিংবা দেবকন্যা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, সে কন্যা কিন্তু তোমারই যোগ্য। রাজা নারদের সঙ্গে বনে এসে কন্যার রূপ দেখে মোহিত হলেন। নারদ বিবাহের ঘটকালি করতে উদ্যত হলে কন্যা বলল—'দেবতা মানুষে কোথা হঞাছে মিলন'। নারদের অনুরোধে কন্যা বিবাহে রাজি হল এই সর্তে—

মোর অসম্মত কার্য রাজা যদি করে। সেইক্ষণে যাব ঘোর নরক মাঝারে ॥১৩৪খ

কামপীড়িত রাজা সেই সর্তেই কন্যাকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে এলেন।

রাজা ও কন্যা শয্যায় শায়িত। এমন সময় সকালে 'সংযমবাদ্য' বেজে উঠল। রাজা তখনই—

পালঙ্ক ত্যেজিঞা কৈল ভূমিতে আসন। রত্নাসন ছাড়ি কৈল কুশের শয়ন।
ধৌতবস্ত্র পরিঞা ছাড়িল রাত্রিবাস। তা দেখিঞা মোহিনীর মনে হৈল ত্রাস ॥১৩৫ক

মোহিনী রাজাকে বলল, দেবর্ষির সামনে তুমি শপথ করেছ, সে-শপথ ভঙ্গ করলে নরকে নিমজ্জিত হবে।

আলিঙ্গন দেহ রাজা না কর বিরাম। তে-কারণে সত্য করাঞাছি অনুপাম ॥১৩৫ক
রাজা বললেন, এই অনুরোধ ছাড়া তোমার সব কথা পালন করতে আমি রাজি। রাজ-আগমনের বিলম্ব দেখে মহারাণী সন্ধ্যা রাজার 'বাসঘরে' গিয়ে তাঁদের দুজনকেই একাদশী-পালনের অনুরোধ জানালেন। মোহিনী ক্রোধে জ্বলে উঠল। মহারাণী পুত্র ধর্মাঙ্গদকে গিয়ে সব কথা বললেন। ধর্মাঙ্গদ বিমাতাকে বোঝাতে ব্যর্থ হল। মোহিনী রাজাকে বলল—

একাদশীব্রত যদি করিবারে চাহ। মুখ্য মহাদেবী-স্তন কাটি আনি দেহ ॥
নহে ধর্মাঙ্গদ পুত্রদেহ বলিদান। নহে মোর বাসঘরে করহ শয়ান ॥১৩৬ক

মহারাণী সন্ধ্যা তাঁর স্তন কেটে দিতে উদ্যত হলেন, ধর্মাঙ্গদ বলল 'মোরে বলি দিয়া ব্রত করুন রাজন'।

ধর্মাঙ্গদ দেখি বলে [ব্রহ্মার] দুহিতা। 'হাস্যমুখে তোমারে ধরিবে তোর মাতা ॥
তাড়িপত্রে তোমা বলি দিবেক রাজন। ইহা না করিলে নহে সত্যের' পালন ॥১৩৬খ
রাণী হাসিমুখে পুত্রকে ধরলেন। রাজা রুক্মাঙ্গদ কৃষ্ণনাম স্মরণ করে—

খড়্গ উচ্চ কৈল পুত্র কাটিবার মনে। হেন বেলে গোলোকে জানিলা নারায়ণে ॥১৩৬খ
যেখানে রাজা রুক্মাঙ্গদ পুত্রবধে উদ্যত, সেখানে নারায়ণ আবির্ভূত হলেন। নারায়ণ রুক্মাঙ্গদকে স্বর্গে নিয়ে যাবার ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন।

রাজা বলে কৃপা যদি কৈলে যদুপতি। স্বদেশ সমেত যাব তোমার বসতি ॥১৩৭ক
রাণী, পুত্র, পুত্রবধু নিয়ে শত বৎসর রাজত্ব করে রাজা রুক্মাঙ্গদ 'স্বদেশসমেত' স্বর্গগমন করলেন। মোহিনী মর্ত্যেই থেকে গেল। কবি বলছেন, তিনি নারদীপুরাণমতে এই কাহিনী বর্ণনা করলেন।

অতঃপর বৃন্দা বা তুলসীর কাহিনী। মহাশূর শঙ্খাসুর দেবগণের ভীতির হেতু। ইন্দ্র ব্রহ্মাকে শঙ্খাসুরের অত্যাচারের কথা জানালেন। ব্রহ্মা নারায়ণকে বললেন—

সতীর প্রসাদে শঙ্খ ত্রিভুবনে জয়। তোমা বিনে অন্যজনে নহিবেক ক্ষয় ॥ ১৩৮ক
নারায়ণ ব্রহ্মাকে বিদায় দিয়ে শঙ্খাসুরের মূর্তি ধরে অসুর-ভবনে গেলেন। পতিজ্ঞানে বৃন্দা নারায়ণের পরিচর্যা করলেন। উভয়ের সম্ভোগ হল। বৃন্দার সন্দেহ হল, পতির সঙ্গে মিলনের মত এ মিলন নয়।

মোর পতিব্রতা ধর্ম বিদিত সংসারে। হেনক সতীত্ব ভঙ্গ কোনজনা করে ॥
অভিশাপ দিতে মনে করে অনুমান। তা দেখিঞা কাতর হইলা ভগবান ॥১৩৮ক
শঙ্খাসুর নিজ পুরী প্রবেশ করলেন। সেখানে অন্য পুরুষকে দেখে বৃন্দাকে তার হেতু জিজ্ঞাসা করলেন। বৃন্দা অকপটে সব কথা বলে স্বামীকে যুদ্ধে নিবৃত্ত হতে অনুরোধ জানালেন। শঙ্খাসুর সে-কথায় কর্ণপাত করলেন না। নারায়ণ ও শঙ্খাসুরের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বেধে গেল।

তিন নব রাত্রি যুদ্ধ একই সোসর। দেখি সশঙ্কিত হইলা স্বর্গে পুরন্দর ॥ ১৩৯ক
চন্দ্রবাণে নারায়ণ শঙ্খাসুরের হস্তপদ ছিন্ন করলেন, তারপর গদাঘাতে তার প্রাণনাশ করলেন। শোকাতুরা বৃন্দা—

মনে কৈল যে জনা ভণ্ডিমা কৈল মোরে। সেজন হউক শিলা শাপিল অন্তরে ॥১৪০খ
শিলামূর্তি নারায়ণ বললেন—

আমি হইলাঙ শিলা তোমার কারণ। তুমি বৃক্ষজাতি হবে তুলসী কারণ ॥১৪০খ
দেখতে দেখতে বৃন্দা তুলসীবৃক্ষে পরিণত হলেন।

তুলসী শালগ্রাম হঞা গণ্ডকের তীরে। চক্রতীর্থ বলি খ্যাতি রাখিল সংসারে ॥
সতী সঙ্গে চক্রতীর্থে দেব গদাধর। আনন্দে রহিলা দশ সহস্র বৎসর ॥১৪০খ

শিব ব্রহ্মা সকলেই তুলসীর সম্মান করলেন। গঙ্গা ঈর্ষান্বিত হলে ব্রহ্মা বললেন, তুলসী ও নারায়ণে ভেদ নেই। 'বিনি তুলসীকে সর্বপূজা অকারণ'।

সব শেষে প্রহ্লাদের কাহিনী। স্বর্গবিজয়ী দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ঘোরতর বিষ্ণুদেষী। দৈত্যরাণী কয়াধু কিন্তু 'দানে ধর্মে সতীত্বে সাক্ষাত যেন সীতা'। তাঁর চার পুত্র হ্লাদ, অনুহ্লাদ, হ্লাদঁবান ও প্রহ্লাদ। প্রথম তিন পুত্র দেবহিংসক, কনিষ্ঠ প্রহ্লাদ কিন্তু—

আপনার কর্ম কায় কৃষ্ণে সমর্পিঞা। করএ মনন পূজা নির্জনে বসিয়া ॥১৫৪ক

অন্যান্য দৈত্যবালকের মত শিশু প্রহ্লাদ গুরুগৃহে পড়তে গেল। একদিন দৈত্যরাজ পুত্রকে তার পাঠ জিজ্ঞাসা করলে প্রহ্লাদ উত্তর দিল—

আদি অন্ত জন্ম মৃত্যু ক্ষয় যার নাঞি। হেন বিদ্যা পঢ়ি আমি শুনহ গোসাঞি ॥ ১৫৪খ

পুত্রমুখে নারায়ণের নাম শুনে ক্রোধান্ধ দৈত্যরাজ বললেন, নারায়ণ দৈতকুলের বৈরী, তোমার মুখে তার নাম কেন? দৈতরাজ গুরুদের ডেকে বললেন, তোমাদের কাছে ছেলে পাঠালাম পড়াবার জন্য, এতদিনে তার কোন সংস্কার হল না! ষণ্ডামক নিজেদের অসহায়তার কথা প্রকাশ করলেন। হিরণ্যকশিপু পুত্রকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, হয় গুরুবাক্য পালন করতে হবে, নয়তো তোমার জীবনের শেষ।

শিশু বলে শুন রাজা কর অবধান। হরি বিনে রাখিতে বধিতে নাহি আন ॥১৫৫ক

দৈত্যরাজ ভাবলেন, এই শিশু হতেই বিষময় ফল ফলবে। অঙ্কুরেই একে বিনষ্ট করা উচিত। দৈত্যরাজের আদেশে প্রহ্লাদের উপর অনেক অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হল, কিন্তু অদৃশ্য বিষ্ণুচক্রে সবই প্রতিহত হল। দৈত্যরাজ আদেশ দিলেন, 'আছাড়িঞা মার শিশু অন্তরীক্ষে রঞা'। অন্তরীক্ষ থেকে প্রহ্লাদকে ভূমিতলে ফেলে দিলে, স্বয়ং বসুমতী আঁচল পেতে তাকে রক্ষা করলেন। দৈত্যেশ্বর মত্ত মাতঙ্গের সামনে প্রহ্লাদকে নিক্ষেপ করতে আদেশ দিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় প্রহ্লাদকে লেগে হাতীর দাঁত ভেঙ্গে গেল। অনুচরদের পরামর্শে দৈত্যরাজ আবার প্রহ্লাদকে গুরুগৃহে পাঠালেন, কিন্তু অবস্থা একই। প্রহ্লাদ সতীর্থদের বোঝাল, 'বৈষ্ণব সমান কেহ ত্রিভুবনে নাই'। সর্পদংশনে, অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপে, বিষান্ন ভোজনে, সমুদ্রনিক্ষেপে কোনভাবেই প্রহ্লাদের জীবননাশ করা গেল না। প্রহ্লাদ বলল, ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান।

নদ নদী পর্বত কানন চরাচর। সর্বময় তিহো কথা শুন নৃপবর ॥১৭০খ

ক্রুদ্ধ দৈত্যেশ্বর প্রশ্ন করলেন, এই স্ফটিক স্তম্ভের মধ্যে কি নারায়ণ বিরাজ করে। প্রহ্লাদ বলল, নিশ্চয়ই। উন্মত্ত দৈত্যরাজ খড়্গাঘাতে সেই স্তম্ভ দ্বিখণ্ডিত করলেন। অমনি—

সিংহের আকৃতি মুখ নরের শরীর। সপ্ত আকাশে জটা অতি বড় বীর ॥
জটার আক্ষেপে ভ্রষ্ট হএ তারাগণ। চরণে ব্যাপিল সপ্ত পাতাল ভুবন ॥
অজানুলম্বিত ভুজ দীর্ঘ কলেবর। বজ্রাঙ্কুর নখ হস্ত অঙ্গুলি উপর ॥
যুগান্তের অগ্নি হেন শরীরের জ্যোতি। তা দেখিঞা আপনা পাসরে দৈতপতি ॥
অরুণ বরণ মুখ বিকট দশন। তাহে লহ লহ জিহি করিছে শোভন ॥

দুখানি নয়ন কোটি রবির প্রতাপে। হেনক আকৃতি দেখিয়াছে কার বাপে ॥১৭১ক

সাতদিন সাত রাত্রি যুদ্ধের পর দিবা রাত্রির সন্ধিক্ষণে উরুদেশে স্থাপন করে নখাঘাতে

হিরণ্যকশিপুর প্রাণ সংহার করলেন নৃসিংহরূপী নারায়ণ। দেবগণের অনুরোধে প্রহ্লাদ ভয়াল নৃসিংহকে শান্ত করলেন। প্রহ্লাদের রাজ্যাভিষেক করে নৃসিংহ অন্তর্হিত হলেন।

উপসংহারে কবি লিখেছেন—

পুনরপি শ্রীগুরুচরণে পরণাম। যার গুণে শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর হৈল নাম॥
যার গুণে গোবিন্দভজনে কৈল আশ। যার গুণে কৈল হরিদাসের সম্ভাষ॥১৭৪খ

এই হরিদাস কারো নাম, না হরির দাস, এই অর্থে ব্যবহৃত ?

শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করের রচনা নিটোল গাঢ়বন্ধ নয়। স্থানে স্থানে পরিমিতিবোধের অভাব দেখা যায়। তবুও চিন্তার স্বাতন্ত্র্যে কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে তাঁর রচনা একটা বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে পারে।

একখানি সম্পূর্ণ পুথির পরিচয় পেয়েও অমূল্যবাবু একখানি খণ্ডিত পুথির সম্পাদনা করলেন কেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদই-বা তা প্রকাশে উৎসাহিত হলেন কেন জানি না।

আলোচনা

'কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধুর' কাল সম্পর্কে

শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

'কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধুর' কাল সম্পর্কে শ্রীযুক্ত অক্ষয় কয়ালের সর্বশেষ আলোচনা (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৮৭তম বর্ষ—বৈশাখ-আশ্বিন) পড়লাম। ঐ আলোচনার দ্বারা নূতন প্রমাণ লাভ হয়েছে বলে বোধ করছি না। বলা বাহুল্য আমি 'যেন তেন প্রকারেণ' রামপ্রসাদের কাব্যকে অষ্টাদশ শতকে রচিত বলে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টিত হইনি। রাম শব্দের শকাঙ্কভেদে ১ ধরার প্রশ্নে আমি যথোচিত যুক্তি দিয়েছিলাম। ঐ উপলক্ষ্যেই আমি ডঃ সেনের গ্রন্থের যে উদ্ধৃতিটি ব্যবহার করি, তদ্বারা আমার ধারণায় লোকব্যুৎপত্তি গণ্য হওয়ার সম্ভাবনাই স্বীকৃত হয়েছে। আমার ঐটুকুই দরকার ছিল বলে দীর্ঘতর উক্তি উদ্ধৃত করিনি। তবে ডঃ সেনের উদ্ধৃতিটি আমার আলোচনায় যেভাবে ছাপা হয়েছে তার জন্য ত্রুটি স্বীকার করছি। উদ্ধৃতি-চিহ্নের অন্তর্গত শেষ ছত্রটি আমার নিজের। ঐ ভুল আমার স্বেচ্ছাকৃত নয়। হয় ঐ ভুল আমার পাণ্ডুলিপিতেই ছিল, অথবা মুদ্রণপ্রমাদ ঘটেছে। এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই বলে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

'কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধুকে' অষ্টাদশ শতাব্দীর কাব্য বলায় অক্ষয়বাবু আমার মোটিভের অনুসন্ধান করেছেন। এই কাজ শোভনও নয়, বিজ্ঞোচিতও নয়। কারণ এমন চিন্তা অবান্তর। রামপ্রসাদের কাব্যকে স্বকালে নির্ভুল প্রতিষ্ঠাদানই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তবে 'কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধুকে' কোনমতেই তিন বছরে রচিত বলে যে ভাবা যায়না তার প্রমাণ তো এই কাব্যের বিষয়-পরিকল্পনাতেই আছে। বোধহয় অক্ষয়বাবু মতানৈক্য জনিত ক্রোধে এখানে যুক্তিভ্রষ্ট হয়েছেন, আর আমার মূল প্রবন্ধটিও ভাল করে পড়েন নি। যদি ঐ কাব্যে বর্ণনাত্মক বিষয়বস্তুকে মোটামুটিভাবে পয়ারের ছাঁচে গড়িয়ে দেওয়া হতো তবে এমন সম্ভাবনা সত্য হতেও পারত। কিন্তু কাব্যটি শুধু তাইই নয়, এতে সঙ্গে সঙ্গে স্থান পেয়েছে শ্রীরূপের অলঙ্কার-গ্রন্থদ্বয়ের সুললিত কাব্যানুবাদ। একাজ যে কতখানি শ্রম এবং সময়সাধ্য তা শ্রীরূপের ভাষার প্রকৃতি বিষয়ে জনৈক বিশেষজ্ঞের মন্তব্য থেকে বোঝা যাবে—"যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষেও এই গ্রন্থ সহজবোধ্য হয় না।" (ডঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়-এর ভূমিকা, ডঃ হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়কৃত উজ্জ্বলের বঙ্গানুবাদে, পৃ.—চ)। এতদ্ভিন্ন রামপ্রসাদের কাব্যে যে শ দুয়েক বৈষ্ণবপদ আছে, সেগুলি সৃষ্টিমূলক সাহিত্য। বর্ণনাত্মক নয়। তাদের আবার লেখা হয়েছে শ্রীরূপ-বর্ণিত আলঙ্কারিক পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে। একেই তো দু বছরে দুশো কবিতা লেখা মহাকবির পক্ষেও শ্লাঘনীয়, তদুপরি এইভাবে শাস্ত্রের নির্দেশে লেখবার প্রয়াস অন্ততঃ দু বছরের আগে সফল হওয়া অসম্ভব। তাই ঐকাজেই তো শুধু কমপক্ষে দু বছর লাগবার কথা। এর সঙ্গে বাদবাকী বর্ণনাত্মক ব্যাপারের রচনাংশকে গণ্য করলে, তিন বছরে তিন খণ্ড লিখে ফেলার কথা আদৌ মনে আসতে পারে কি ? আমি কি তাঁকে এখন প্রশ্ন করব যে, এইভাবে তিনি 'যেন তেন প্রকারেণ' কাব্যটিকে উনবিংশ শতাব্দীর বলে প্রতিপন্ন করতে চাইছেন কেন ?

এবারে প্রশ্নের বসন্তরঞ্জন এবং সুনীতবাবুর প্রসঙ্গে আসা যাক। শ্রীযুক্ত কয়ালের

মোটামুটি অভিযোগ যে, আমি উল্লিখিত এই দু জন পূর্ব স্বরীর আবিষ্কার ও আলোচনায় উপকৃত হয়ে, তাদের নাম চেপে আলোচনা করতে নেমেছি। অন্যান্য অনেক পুথির মতো 'কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধুর' ক্ষেত্রেও বসন্তরঞ্জনই মূল আবিষ্কর্তা। তাঁর আবিষ্কৃত পুথি আদিলীলার হলেও তা সত্য। এখন কেউ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' অখণ্ড সংস্করণ আবিষ্কার করলেও বসন্তরঞ্জনই তার মূল আবিষ্কারের গৌরবভাগী হয়ে থাকবেন। তাই এ বিষয়ে আমার বা স্থনীতবাবুর কারোরই প্রথম আবিষ্কারকের দাবী নেই। আচার্য দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-পরবর্তী সাহিত্য-ইতিহাসেও, বসন্তরঞ্জনের পুথিটির উল্লেখ নেই। আমি সম্পূর্ণ পুথি আবিষ্কারের সময়ও এর কথা জানতাম না। পরে জেনেছি। তবে আমার মূল প্রবন্ধে এর উল্লেখ না করার একটি কারণ আমি দিয়েছিলাম। আরেকটি কারণ হল এই যে, আমার প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন লাহার একটি প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধের বিস্তার হিসেবেই মূলতঃ রচিত হয়েছিল। শ্রীযুক্ত লাহা যে পদগুলির উল্লেখ করেছিলেন তার সঙ্গে আদিলীলার কোনো সম্পর্ক ছিলনা তাই প্রাসঙ্গিকভাবে আমি ঐস্থানে ক্ষুদিরামবাবুর দু খণ্ডের এবং আমার তিন খণ্ডের পুথিটির উল্লেখ শুধু করেছিলাম। এর পেছনে আমার অসদুদ্দেশ্য কিছু ছিল না।

এবারে স্থনীতবাবুর কথা। আমি আমার গবেষণাকার্য দাখিল করার সময় তাঁর নাম শুনেছিলাম। শ্রীযুক্ত কয়ালের আলোচনা পড়ে আমি নিজে শান্তিনিকেতনে গিয়ে শ্রদ্ধেয় পঞ্চানন মণ্ডলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর পরিচয় পাই। সত্য হচ্ছে এই যে, আমরা দু জনে পরস্পর-নিরপেক্ষভাবে একই কাব্যের উপরে দুই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কাজ করেছি। আমি করেছি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর স্থনীতবাবু কাজ করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমি আমার পুথি হস্তগত করি ১৯৭৫ এ। ক্ষুদিরামবাবু তারও কিছু আগে, এবং স্থনীতবাবুও সম্ভবতঃ আমার কিছু আগেই পুথি পান। কিন্তু তাবলে আলোচনায় তিনি আমার পূর্বস্বরী নন। আমার কাজ স্থনীতবাবুর বছরখানেক আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল হয়ে স্বীকৃতি পায়। অর্থাৎ গবেষণা যে অর্থে পুরাবিষ্কার বা রিসার্চ, সে অর্থে বিদ্বজনসমাজে আমিই আগে কাজ দাখিল করেছি। এমন ঘোষণার মধ্যে যেটুকু অবিনয় আছে তার জন্য যথোচিত দুঃখ প্রকাশ করে লিখি যে, দুর্বিনয়ের মিথ্যা অপবাদ থেকে আত্মরক্ষার্থেই আমাকে এই সত্য প্রকাশ করতে হল। পঞ্চাননবাবু আমাকে বলেছেন যে, আমার গবেষণার কথা তিনি জানতে পেরেছিলেন, তবে পুথি-পরিচয়ে সাময়িক অনবধানবশতঃ আমার কথা হয়তো স্থান পায়নি। যাই হোক্ তিনি আমাকে বলেছেন যে, রাঢ়-সংস্কৃতি-সংবাদ পত্রিকায় যথাশীঘ্র সম্ভব এ বিষয়ে উল্লেখ করবেন। কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু'র ভুলুই থেকে প্রাপ্ত দুখানি পুথির পাঠ মিলিয়ে সম্পূর্ণ পুথির পাঠ পাওয়া যায়। কাজেই ঐ কাব্যের সম্পূর্ণ পুথি আমি দেখিনি তা ঠিক নয়। এরপর ঐ পুথির কালনির্ণয়ব্যাপারে শুধু অক্ষয়বাবুর সঙ্গে যদি আমার মতভেদ থাকে তো থাক না। এমন তো হতেই পারে। আগেও বহু হয়েছে। তবে আমার বই কখনো যদি ছাপা হয় তবে অক্ষয়বাবুর মতামতেরও নিশ্চয় উল্লেখ করে দেব। আর একটি কথা, অক্ষয়বাবু লিখেছেন, বসন্তবাবু পুথিটি সংগ্রহ করেন বাঁকুড়া থেকে। সাহিত্য পরিষদের পুথির তালিকা-গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী ঐটি সংগৃহীত হয়েছিল 'মানভূম' থেকে

ঊননবতিতম বর্ষের সম্পাদকীয় বিবরণী

(১লা বৈশাখ ১৩৮৯ হইতে ৩১শে চৈত্র ১৩৮৯)

আজ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ঊননবতিতম বার্ষিক অধিবেশনে সমাগত সদস্যগণকে যথোচিত শ্রদ্ধা, প্রীতি ও সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ঊননবতিতম বার্ষিক কার্যবিবরণ সদস্যগণের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করিতেছি।

সভার প্রারম্ভে আলোচ্য কালসীমার মধ্যে লোকান্তরিত সংস্কৃতি সাধক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, অরুণকুমার রায়, (সাংবাদিক) সুশোভন সরকার, অনিলেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শেখ আবদুল্লা, বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য, জ্যোতির্মালা দেবী, সুধাকান্ত দে, আবু সয়ীদ আয়ুব, প্রিয়দারঞ্জন রায়, বিষ্ণু দে, সাগর সেন, হিরন্ময় রায়চৌধুরী, মমতা দাশগুপ্ত, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিময় মিত্র (পরিষৎ গ্রন্থাগারিক), প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, অশোককুমার সরকার, ত্রিদিবেশ বসু, মণি বাগচী, মন্মথনাথ সান্যাল, কানাইলাল মুখোপাধ্যায়, অরুণচন্দ্র গুহ, গিরিবালা দেবী, সুবোধ বসু, সত্যেন্দ্রনাথ সেন—ইহাদের উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

বিভিন্ন অধিবেশন (১৩৮৯)

(ক) নির্মলকুমার বসু স্মারক বক্তৃতা—২৫ ভাদ্র, ১৩৮৯ তারিখে নির্মলকুমার বসু স্মারক বক্তৃতা দেন শ্রীঅম্লান দত্ত। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল 'সমাজ সংগঠনের পথের সন্ধানে'। শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় সভায় সভাপতিত্ব করেন।

(খ) রামলাল হালদার ও হরিপ্রিয়া দেবী স্মারক বক্তৃতা :—২রা ও ৩রা পৌষ, ১৩৮৯ শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য রামলাল হালদার ও হরিপ্রিয়া দেবী স্মারক বক্তৃতা দেন। উভয় দিনেই সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল "আচার্য আনন্দবর্ধন ও কাব্য নয়।"

আলোচ্য বর্ষে অন্যান্য স্মারক বক্তৃতার জন্য বক্তা নির্বাচিত হইয়াছেন :

(ক) রাধাগোবিন্দনাথ স্মারক বক্তৃতা—শ্রীসুকুমার সেন।

(খ) বনফুল স্মারক বক্তৃতা—শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র।

(গ) অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা—শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় দীর্ঘকাল পর অধরচন্দ্র স্মারক বক্তৃতা প্রদানের আয়োজন করা হইয়াছে। সকল বক্তাই পরিষৎ কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা এখনও পর্যন্ত বক্তৃতাগুলি দিবার সময় করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্যিক হরনাথ ঘোষ পদক প্রদান করা হইয়াছে শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবীকে এবং গোবিন্দগৌরী স্মৃতি পদক দেওয়া হইয়াছে পরিষদের দীর্ঘকালের সেবক শ্রীত্রিদিবনাথ রায়কে।

(গ) ৪ঠা বৈশাখ পরিষৎভবনে ভারতী তামিল সঙ্ঘম্ ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যৌথ উদ্যোগে তামিল কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতীর জন্মশতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীকে. এস. রমন, শ্রীমতী কে. রুক্মিণী প্রমুখ সভায় কবি ভারতীর জীবন ও সাহিত্য

বিষয়ে আলোচনা করেন। শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য সভায় সভাপতিত্ব করেন। উক্ত সভায় কবি ভারতীর একখানি চিত্র পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

(ঘ) ১১ ভাদ্র পরিষৎ মন্দিরে সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তীর চিত্র প্রতিষ্ঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ, শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সভায় বক্তৃতা করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। অনুষ্ঠানটি পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রয়াত লেখকের চিত্রখানিও পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি অনুগ্রহপূর্বক পরিষদকে দান করিয়াছেন।

(ঙ) বৈশাখ মাসে পরিষদ ভবনে নিখিল ভারত ওড়িয়া সাহিত্যিক সম্মেলনের অধিবেশন হয়। তিনদিন ব্যাপী অধিবেশন চলে। পরিষদের সর্ববিধ সহযোগিতা লাভে তাহারা যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।

বিশেষ অধিবেশন

১১ বৈশাখ 'নববর্ণা'র আবিষ্কর্তা শ্রীভুবনমোহন দাস পরিষৎ মন্দিরে তাঁহার আবিষ্কৃত নূতন লিপি বিষয়ে উদাহরণ সহযোগে একটি বক্তৃতা দান করেন।

প্রতিষ্ঠা দিবস

৮ই শ্রাবণ, ১৩৮৯ অপরাহ্নে নব্বইটি প্রদীপ জ্বালাইয়া প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান শুরু হয়। পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য সভায় সভাপতিত্ব করেন। শ্রীবন্দীরাম চক্রবর্তী স্বাগত ভাষণ দেন। শ্রীমতী বাসন্তীনন্দন উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। শ্রীমতী রমা চৌধুরী মঙ্গলাচরণ করেন। এই অনুষ্ঠানে অশীতিপর সাহিত্য সেবী শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীনলিনীকান্ত সরকার, শ্রীকালীকিংকর সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্তা শান্তাদেবী, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু, শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবী, শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী, শ্রীমন্মথ রায়, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ও শ্রীগোপাল হালদারকে পরিষদের পক্ষ হইতে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই দিন সাহিত্যিক হরনাথ ঘোষ পদক দেওয়া হয় জ্যোতির্ময়ী দেবীকে। এই দিন মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘী নিবাসী শ্রীকিশোরীমোহন সিংহ প্রদত্ত ১২শ শতাব্দীর একটি বিষ্ণুমূর্তি পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই উপলক্ষে শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী, শ্রীমন্মথ রায়, শ্রীমহাদেবপ্রসাদ সাহা, শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য,, শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসমরেশ বসু সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। শ্রীমতী গিরিবালা দেবীর ভাষণ পাঠ করিয়া শোনান শ্রীমতী বাণী রায়।

বার্ষিক অধিবেশন

১৬ই আশ্বিন, ১৩৮৯ পরিষদের ৮৯তম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় পরিষৎ নিয়মাবলীর ২০ সংখ্যক ধারাটি সংশোধিত হয়। আগামী বৎসর হইতে হিসাব পরীক্ষকের এক হাজার টাকা সম্মান দক্ষিণা ধার্য হয়। পরিষদের আজীবন সদস্য শ্রীহুলুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষদকে দুই হাজার পাঁচশত টাকা উপহার দেন। নূতন ন্যাসরক্ষক সমিতি এই সভায় অনুমোদিত হয়।

বর্তমান বর্ষে পরিষদের উল্লেখযোগ্য কৃত্য

বর্তমান বর্ষে পরিষদের চিত্রশালার জন্য ১২খানি মূর্তি রাখিবার স্ট্যাণ্ড কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে তৈয়ারী করানো হইয়াছে। বর্তমান বর্ষে আরতি মল্লিক অনুদানের

অর্থে সাহিত্য-সাধক চরিতমালার নিম্নলিখিত চরিতসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে—প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, যদুনাথ সরকার, ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী ও সরলবালা সরকার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, বটকৃষ্ণ ঘোষ ও অতুলপ্রসাদ সেন। ইহা ছাড়া অধ্যাপক জগদীশ নারায়ণ সরকার প্রণীত 'বাংলার মধ্যযুগে হিন্দুমুসলমান' গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়াছে। বর্তমান বর্ষে সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার ৫, ১১, ১২, ১৪, ৪০, ৬২, ৯১, ৯৩, ৯৪ সংখ্যক গ্রন্থ যথাক্রমে – রামনারায়ণ তর্করত্ন ; দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, তারাশঙ্কর তর্করত্ন ; অক্ষয়কুমার দত্ত ; ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, গিরিশচন্দ্র বসু, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমীলা নাগ, নিরুপমা দেবী পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। বঙ্গে নব্য ন্যায় চর্চা, আনন্দমঠ পুনর্মুদ্রণের কাজ চলিতেছে। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার নূতন চরিত গ্রন্থ—বটকৃষ্ণ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ ও যোগেশচন্দ্র বাগল ছাপার কাজ চলিতেছে।

বর্তমান বর্ষে কার্যনির্বাহক সমিতির বারটি সভা হইয়াছে, মাসিক অধিবেশন হইয়াছে চারিটি—আয়-ব্যয় উপসমিতির সভা হইয়াছে সাতটি, পুস্তক প্রকাশ উপসমিতির একটি, ইহাছাড়া গ্রন্থাগার উপসমিতির একটি, ন্যাসরক্ষক সমিতির একটি, স্মারক বক্তৃতা উপসমিতির একটি, চিত্রশালা উপসমিতির একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

১৩৮০ বঙ্গাব্দে সরকারের আর্থিক সাহায্য

(১) কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ হইতে চিত্রশালা উন্নয়ন খাতে নয় হাজার এবং গ্রন্থাগার উন্নয়ন খাতে পঁচিশ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে।

(২) পঃ বঃ সরকারের কাছ হইতে কর্মচারী নিয়োগ খাতে বত্রিশ হাজার আটশ সাত, পত্রিকা প্রকাশ খাতে আট হাজার, এবং ঘাটতি বাজেট পূরণ খাতে এগার হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে।

গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বিবরণ

১। পরিষৎ খোলা ছিল—২৭৯ দিন।

২। মোট পাঠক-পাঠিকা গ্রন্থাগার ব্যবহার করিয়াছেন – ১৮,৫৬৮।

৩। লেনদেন বিভাগে (ক) মোট পাঠক-পাঠিকার উপস্থিতির সংখ্যা ছিল –৮৫৯৯। এবং (খ) পাঠকক্ষে মোট পাঠক-পাঠিকার উপস্থিতি ছিল—৯৯৬৯।

৪। পাঠকক্ষ ও লেনদেন বিভাগে সর্বোচ্চ উপস্থিতি ছিল ৭২ (লেনদেন, তাং ৪।৭।৮৯) ৪৬ (পাঠকক্ষ, তাং ১৭।৬।৮৯)।

৫। বর্তমান বর্ষে (১৩৮৯) নূতন সদস্য সংখ্যা হইয়াছে—২৯২।
আজীবন সদস্য—২, সাধারণ সদস্য—২৮৪, মফঃস্বল সদস্য—৬, বিশিষ্ট সদস্য—২ (গোপাল হালদার ও অসীমা চট্টোপাধ্যায়)।

পুস্তক আদান-প্রদান : ১৩৮৯ (বিষয়ানুষায়ী)

		লেনদেন	পাঠকক্ষ
দর্শন—	১০০	৬০	১৬২
ধর্ম—	২০০	২১৫	৩৩৪
সমাজ-বিজ্ঞান—	৩০০	৬৯	১১৫
শিক্ষা—	৩৭০	৩৩	১৪১
ভাষা—	৪০০	২১৯	১৩১
বিজ্ঞানশাস্ত্র—	৫০০	১৩	৯৯
ফলিত-বিজ্ঞান—	৬০০	২৬	৮১
শিল্পকলা—	৭০০	৭	৫৮
সঙ্গীত—	৭৮০	১৮৫	৩৭৬
সাহিত্য—	৮০০	৮৭০৭	৮২১৩
ভূগোল ভ্রমণ—	৯১০	১৪৬	২২০
জীবনী—	৯২০	৪৯৮	৪৮০
ইতিহাস—	৯৩০—৯৯৯	১৩০	৪৭৮
সহায়ক গ্রন্থ—	০০০	৪২	২৪৯
পত্র-পত্রিকা—	—	—	৬৬২৪
অন্যান্য গ্রন্থ— (হিন্দী, ইংরেজী, সংস্কৃত)		(৩+২৬+—)	(২৫+৫৭০+৪৭)
		১০,৩৭৯	১৮,৪০৬

পঞ্জীকৃত পুস্তক : ১৩৮৯

বাংলা—৭৭৫, ইংরেজী—১৮০, পত্র-পত্রিকা—১২৫=১০৮০

নব্বইতম বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণী

তারিখ—১৮ ভাদ্র, ১৩৯০ (৪.৯. ১৯৮৩) সময়—অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকা

পরিষৎ সভাপতি শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় অদ্যকার সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীঅসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করেন শ্রী দিলীপকুমার বিশ্বাস। তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করেন শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী। অতঃপর শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতির অনুমতি লইয়া সম্পাদক পরিষৎ সভাপতির লিখিত ভাষণ পাঠ করিয়া শোনান। তাহাতে ডঃ সুকুমার সেন লিখিয়াছেন ঃ

"পাঁচ বছর আগে আপনারা আমাকে নির্বাচন করেছিলেন। সে সম্মান ভার আমি এতদিন বহন করে এসেছি লজ্জাভরে। আমি তা নামিয়ে দিয়ে স্বস্তি বোধ করছি। অশেষ ইচ্ছা সত্ত্বেও আমি পরিষদের বিশেষ কিছু করতে পারিনি। হয়ত একটু কর্তাগিরি করেছি। তবে এটা আপনারা. অবশ্যই স্বীকার করবেন যে অনেকদিকে পরিষদের উন্নতি হয়েছে। সেজন্য আমি স্মরণ করছি সম্পাদক মহাশয়ের কৃতিত্ব ও কর্মীদের সহায়তা। ওদের আমি বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভারত গভর্ণমেণ্ট আমাদের যে সাহায্য করেছেন ও করবেন তার জন্যেও ধন্যবাদ জানাই।

আর কি বলব। জয় হোক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের। নমস্কার।"

সম্পাদক ১৩৮৯ বঙ্গাব্দের লিখিত কার্য বিবরণ সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করেন। শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী উক্ত কার্য বিবরণ সমর্থন করেন। উক্ত কার্য বিবরণ গৃহীত হয়।

কোষাধ্যক্ষ শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী ১৩৮৯ বঙ্গাব্দের পরীক্ষিত আয়-ব্যয় বিবরণ সভায় উপস্থাপিত করেন। শ্রীযুক্ত অতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন উহা সমর্থন করেন। অত:পর উক্ত পরীক্ষিত আয়-ব্যয় বিবরণ গৃহীত হয়।

কোষাধ্যক্ষ শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী ১৩৯০ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয় সভার অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করেন। শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায় তাহা সমর্থন করেন। উক্ত আনুমানিক আয়-ব্যয় বিবরণ গৃহীত হয়। প্রসঙ্গ-ক্রমে কোষাধ্যক্ষ বলেন যে সদস্যগণের নিকট প্রেরিত আয়-ব্যয় বিবরণ অনুগ্রহপূর্বক লক্ষ্য করিলে তাঁহারা উপলব্ধি করিবেন পরিষৎ কি বিপুল পরিমাণ আর্থিক দেনা লইয়া চলিতেছে। তিনি সকলকে এই বিষয়ে সহযোগিতার হাত বাড়াইয়া দিতে অনুরোধ জানান।

১৩৯০ বঙ্গাব্দের কর্মাধ্যক্ষ পদে কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক প্রস্তাবিত সতের জন কর্মাধ্যক্ষের নাম সভায় অনুমোদনের জন্য সম্পাদক উপস্থাপিত করেন—

সভাপতিঃ— শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য। সহ-সভাপতিঃ— শ্রীযুক্ত রমাচৌধুরী, শ্রীঅসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়, শ্রীমনোজ বসু, শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত, শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ, শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস এবং শ্রীবিমলেন্দুনারায়ণ রায়।

সম্পাদকঃ—শ্রীকানাই চন্দ্র পাল। সহ-সম্পাদকঃ—শ্রীরবীন্দ্র গুপ্ত এবং শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়। কোষাধ্যক্ষ— শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী। চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীধীরাজকৃষ্ণ বসু। গ্রন্থশালাধ্যক্ষ—শ্রীঅসীমকুমার দত্ত। পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীসরোজমোহন মিত্র। পুঁথিশালাধ্যক্ষ—

শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী। শ্রী বন্দিরাম চক্রবর্তী এই প্রস্তাব সমর্থন করেন ও এই সুপারিশ অনুমোদিত হয়।

সম্পাদক ১৩৯০ বঙ্গাব্দের কুড়িজন কার্যনিবাহক সমিতির সদস্য নির্বাচনের সংবাদ বিজ্ঞাপিত করেন :—(১) শ্রীকুমারেশ ঘোষ (২) শ্রীদেবকুমার বসু (৩) শ্রীহৃষীকেশ ঘোষ (৪) শ্রীহারাধন দত্ত (৫) শ্রীউত্তমকুমার দাশ (৬) শ্রীকার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায় (৭) শ্রীশিব মুখোপাধ্যায় (৮) শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী (৯) শ্রীমনুজচন্দ্র সর্বাধিকারী (১০) শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত (১১) শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায় (১২) শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ (১৩) শ্রীজ্ঞানশঙ্কর সিংহ (১৪) শ্রীযুক্তা উষা সেন (১৫) শ্রীরাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৬) শ্রীশঙ্করপ্রসাদ নস্কর (১৭) শ্রীতুলুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮) শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্তী (১৯) শ্রীরামেন্দ্র দেশমুখ্য (২০) শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য।

সম্পাদক শাখা পরিষদের সদস্য নির্বাচন সংবাদ বিজ্ঞাপিত করেন। এই বৎসর মেদিনীপুর শাখা হইতে শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী, নৈহাটী শাখা হইতে শ্রীষতুলাচরণ দে পুরাণ রত্ন, কৃষ্ণনগর শাখা হইতে শ্রীনমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায় ও বর্ধমান শাখা হইতে শ্রীসদানন্দ দাসের নাম প্রস্তাবিত হইয়াছিল। অপর কোন নাম প্রস্তাবিত না হওয়ায় এই চারিজন শাখা পরিষদ প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছেন।

সম্পাদক বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচন সংবাদ বিজ্ঞাপিত করেন—শ্রীযুক্তা অসীমা চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীগোপাল হালদার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য পদে নির্বাচিত হইয়াছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৩৯০ বঙ্গাব্দের জন্য আয়-ব্যয় পরীক্ষকের জন্য মেসার্স বি. সি. কুণ্ডু এ্যাণ্ড কোং-এর অংশীদার শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করেন শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী। শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস ঐ প্রস্তাব সমর্থন করেন। স্থির হয় আয়-ব্যয় পরীক্ষক বার্ষিক এক হাজার টাকা সম্মান দক্ষিণা পাইবেন।

কার্য নির্বাহক সমিতি পরিষৎ নিয়মাবলীর ৮০নং ধারার পরিবর্তন করিয়া বান্ধব সদস্য চাঁদা পাঁচ হাজার টাকা হইতে দশ হাজার টাকা করার জন্য যে প্রস্তাব করিয়াছেন সম্পাদক তাহা অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপিত করেন। উক্ত প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

বিবিধ পর্যায়ে সম্পাদক সভাপতির অনুমতি লইয়া বলেন যে, কোষাধ্যক্ষ পরিষদের আর্থিক দুর্দশার চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত সত্য। বর্তমান বৎসরে United Commercial Bank দশ হাজার টাকা পরিষদকে দান হিসাবে দিয়াছেন। এই বিষয় উদ্যোগী হইয়াছিলেন শ্রীনিত্যপ্রিয় ঘোষ। পরিষদের পক্ষ হইতে তাহাকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়।

সম্পাদক জানান পঃ বঃ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর পরিষদের চিত্রশালার জন্য পঁচিশ হাজার টাকার অনুদান অনুমোদিত করিয়াছেন। এই জন্য পরিষদ সদস্য শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি শ্রীভট্টাচার্যকে ধন্যবাদ দেন।

সম্পাদক আরও বলেন কেন্দ্রীয় সরকার পরিষদ পুঁথিশালার জন্য ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার একটি স্কীম অনুমোদন করিয়াছেন। তিন বৎসরে ঐ সাহায্য পাওয়া যাইবে। বর্তমান বৎসরের জন্য ত্রিশ হাজার টাকা অনুদান পাওয়া যাইবে। সম্পাদক জানান ৯০ বৎসর পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি সভা কর্তৃক

রেজিষ্ট্রিকৃত হইয়াছে। এই জন্য দিল্লী প্রবাসী শ্রীসুবীর রায়চৌধুরীর প্রচেষ্টার কথা তিনি ধন্যবাদের সহিত স্মরণ করেন।

তাঁহার সম্পাদক পদে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ায় তিনি পরিষদ সদস্য, এবং কর্মীবৃন্দকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

অতঃপর সভাপতি বলেন যে সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় পরিষদ তাহার উদ্দেশ্য সাধনে সফল হইবে ইহাই তিনি প্রত্যাশা করেন। সভাপতির অনুরোধে শ্রীরমা চৌধুরী শান্তি স্তোত্র পাঠ করেন। অতঃপর সভা সমাপ্ত হয়।

পরিষৎ-সংবাদ

১৩৯০ বঙ্গাব্দের পরিষৎ-পত্রিকার ২য় সংখ্যা (আশ্বিন, ১৩৯০) যথা সময়ে প্রকাশিত হইতেছে। সুদীর্ঘকাল পরে পরিষৎ-পত্রিকার কোন সংখ্যা নির্ধারিত সময়েই প্রকাশিত হইল। সংশ্লিষ্ট সকলের শুভেচ্ছা এবং সহযোগিতায় এই কাজ সম্ভবপর হইয়াছে। আশা করি ভবিষ্যতে এই ধারা অব্যাহত থাকিবে।

আলোচ্য কালসীমার মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্মী কেশব ধাওয়ানের অকাল মৃত্যু ঘটিয়াছে। তাহার মৃত্যুতে সাহিত্য পারষদের কার্যনির্বাহক সমিতি যথোচিত শোক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রতিষ্ঠা দিবস

গত ৮ই শ্রাবণ, (২৫ শে জুলাই, ১৯৮৩) সোমবার অপরাহ্নে সাড়ম্বরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একানব্বইতম প্রতিষ্ঠাদিবস উদযাপিত হয়। এইবারের প্রতিষ্ঠা দিবসের প্রধান আকর্ষণ ছিল পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ভৈরবদত্ত পাণ্ডের প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান। তিনি যথাসময়ে পরিষদে উপস্থিত হইলে পরিষদের পক্ষ হইতে তাহাকে রক্ত গোলাপের স্তবক এবং শঙ্খধ্বনি দ্বারা আন্তরিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে রাজ্যপাল পরিষদের গ্রন্থশালা, পুথিশালা চিত্রশালা প্রভৃতি সব বিভাগ এবং দর্শনীয় বস্তুগুলি সাগ্রহে পরিদর্শন করেন। পরিষদের ম্যুজিয়মে রক্ষিত মহাত্মা গান্ধীর বাঙলা শিক্ষার প্রচেষ্টার নিদর্শনটি তিনি কৌতুহলের সঙ্গে পরীক্ষা করিয়া দেখেন।

তারপর, একানব্বইটি প্রদীপ জ্বালাইয়া প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান শুরু হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের অন্যতম ন্যায়রক্ষক ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে প্রধান অতিথি রাজ্যপাল এবং উপস্থিত সকল সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীকে স্বাগত জানাইয়া পরিষদের সম্পাদক বহু স্মৃতি এবং ঐতিহ্য বিজড়িত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। সম্পাদক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বর্তমান তীব্র আর্থিক সঙ্কটের কথা উল্লেখ করিয়া এই ব্যাপারে যাহাতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উপযুক্ত সাহায্য লাভ করা যায় সেইদিকে রাজ্যপালের সহযোগিতার জন্য একান্ত অনুরোধ জানান।

প্রধান অতিথির ভাষণে রাজ্যপাল ভৈরবদত্ত পাণ্ডে বলেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মত একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রতিষ্ঠানই সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের অভ্যর্থনা করিতে পারে। তিনি বলেন, এক সময় পরিষদে সমস্ত দিকপাল সাহিত্যিকদের সমাগম হইয়াছিল। আমাদের দেখা দরকার তাদের সাহিত্যিক এবং অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি যেন অবহেলিত না হয়। এখানকার প্রাচীন পুথি, বই, মূর্তি ইত্যাদি সংরক্ষণে কেন্দ্র ও রাজ্যকে আরও মনোযোগী হইতে হইবে। রাজ্যপাল বলেন, এই প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় ঐতিহ্যের রক্ষক হিসাবে বিচার করা উচিত। তিনি বলেন, সাহিত্য সম্প্রীতি প্রসারের ক্ষেত্রে অনুবাদমূলক রচনা অপরিহার্য। অনুবাদ ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের রস গ্রহণ সম্ভব নয়। রাজ্যপাল বলেন, আধুনিক বাংলা সাহিত্য যথেষ্ট উন্নত। সুতরাং ইহার অনুবাদ হইলে আধুনিক বাংলা 'সাহিত্যিক ও সাহিত্য' দুইয়েরই প্রচার হইবে। রাজ্যপাল পরিষদকে তাঁহার পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়াছেন এবং পরিষদের পুথি সংরক্ষণ এবং বই ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য সহযোগিতার প্রতীক হিসাবে পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিবার কথা ছিল পরিষদের সভাপতি ডঃ সুকুমার সেনের কিন্তু শারীরিক কারণে তিনি উপস্থিত হইতে না পারায় ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র সভাপতিত্ব

করেন। সভাপতির ভাষণে ডঃ চন্দ্র বলেন, আগে ধনীরা এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য যথেষ্ট বদান্যতা দেখাইতেন। কিন্তু বর্তমানে পারিবারিক কোন পুরুষের স্মৃতি রক্ষার জন্য দান করা হয় নতুবা দানের পিছনে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে। সেজন্য এই ধরনের সারস্বত প্রতিষ্ঠানগুলি খুবই আর্থিক দুরবস্থায় পড়ে। বৃটেনের রয়্যাল অ্যাকাডেমীকেও অর্থসংগ্রহের জন্য একটি দুর্মূল্য ছবি বিক্রয় করিতে হইয়াছে। তিনি বলেন, আমাদের দেশে অবশ্য এই ধরনের ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি সম্ভব নয়। বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে পরিষদ যে আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়িয়াছে তাহা হইতে পরিষদকে রক্ষা করিতে হইলে এই প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে ঘোষণা করিতে হইবে এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষণের সব দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

এই দিনের অনুষ্ঠানের অন্যতম বিষয় সূচী ছিল প্রখ্যাত ওড়িয়া সাহিত্যিক কালিন্দী-চরণ পাণিগ্রাহীকে সাহিত্যিক হরনাথ ঘোষ স্মৃতিপদক দিয়া সম্মানিত করা। কিন্তু শ্রী পাণিগ্রাহী অনিবার্য কারণে শেষ মুহূর্তে উপস্থিত হইতে না পারায় স্থির হয় শ্রী পাণিগ্রাহীর উদ্দেশ্যে পদকটি পাঠাইয়া দেওয়া হইবে

বার্ষিক অধিবেশন :

গত ১৮ই ভাদ্র, ১৩৯০, (৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩) রবিবার অপরাহ্নে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৯০ তম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পরিষৎ পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় তার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

স্মারক বক্তৃতা : আচার্য রাধাগোবিন্দ স্মারক বক্তৃতা

গত ১২ হইতে ১৪ই শ্রাবণ, ১৩৯০ (ইং ২৯—৩১ শে জুলাই, ১৯৮৩) শুক্র, শনি এবং রবিবার তিনদিন পরিষদে রাধাগোবিন্দ স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হইয়াছে। বক্তব্য রাখেন শ্রী মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। তাঁহার বক্তব্যের বিষয় ছিল 'মহাপ্রভু ও অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ'। অনুষ্ঠানের প্রথম দিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, দ্বিতীয় দিনের সভায় শ্রী হরিপদ চক্রবর্তী এবং তৃতীয় দিনের সভায় শ্রী বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। শ্রী ব্রহ্মচারী তাঁহার অপূর্ব বাগ্মিতায় তিনদিনই শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন।

রামলাল হালদার হরিপ্রিয়া দেবী স্মারক বক্তৃতা

গত ৩রা ও ৪ঠা ভাদ্র, (ইং ২০ শে ও ২১ শে আগষ্ট) শনি ও রবিবার শ্রী-শ্রীমোহন তর্ক বেদান্ততীর্থ ভট্টাচার্য রামলাল হালদার হরিপ্রিয়া দেবী স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার আলোচ্য বিষয় ছিল 'ভারতীয় দর্শনে বাগর্থ বিচার'। দুই দিনই এই আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য।

বিভিন্ন শাখা সমিতি ও উপসমিতির সদস্যগণ

কার্যনির্বাহক সমিতির ৯১ তম বর্ষের ১ম অধিবেশনে (২৫ই ভাদ্র, ১৩৯০, ইং ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩,) নিয়মাবলীর ৪ ও ২৬নং ধারা অনুযায়ী বিভিন্ন শাখা সমিতি ও উপসমিতি গঠন করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া বর্তমান কার্যনির্বাহক সমিতি পরিষদের উন্নয়নকল্পে জনসংযোগ উপসমিতি এবং অর্থসংগ্রহ উপসমিতি নামে দুইটি নূতন উপসমিতি গঠন করিয়াছেন। বিভিন্ন শাখা সমিতি, ও উপসমিতির নির্বাচিত সদস্যগণ হইলেন :

আয়-ব্যয় উপসমিতি :

সর্বশ্রী দিলীপকুমার বিশ্বাস (সভাপতি), বন্দিরাম চক্রবর্তী, অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, দুলুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজমোহন মিত্র, কেশবচন্দ্র কর, সুদাম রায়, কল্যাণ চৌধুরী, সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য, হরিপদ ভৌমিক, সম্পাদক (আহ্বায়ক)

ছাপাখানা উপসমিতি :

সর্বশ্রী কুমারেশ ঘোষ (সভাপতি), উত্তমকুমার দাস, দেবকুমার বসু, সরোজমোহন মিত্র, শিব মুখোপাধ্যায়, গোপেকেন্দু ঘোষ, সনৎ মিত্র, নেপাল ঘোষ, গোপীমোহন সিংহরায়, স্বপন বসু, সম্পাদক (আহ্বায়ক)

গ্রন্থাগার উপসমিতি :

সর্বশ্রী অসামকুমার দত্ত (সভাপতি), গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, অমলেন্দু ঘোষ, অতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন, রাধাধন দত্ত, সুনীল দাস, অশোক উপাধ্যায়, সন্তোষ বসাক, স্বস্তি মণ্ডল, প্রদ্যোৎ রায়, বন্দিরাম চক্রবর্তী, সম্পাদক (আহ্বায়ক)

৪। **পুস্তক প্রকাশ উপসমিতি :**

সর্বশ্রী দেবীপদ ভট্টাচার্য (সভাপতি), রামেন্দ্র দেশমুখ্য, দেবকুমার বসু, গৌরাঙ্গ সেনগুপ্ত, দিলীপকুমার বিশ্বাস, রমাকান্ত চক্রবর্তী, রমেন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত, দেবজ্যোতি দাস, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক (আহ্বায়ক)

৫। **চিত্রশালা উপসমিতি :**

সর্বশ্রী বীরাজকৃষ্ণ বসু (সভাপতি), রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চানন চক্রবর্তী, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, উষা সেন, কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, মনোমোহন ঘোষ, রত্না চৌধুরী, নির্মলেন্দু ভৌমিক, অশোক ভট্টাচার্য, সম্পাদক (আহ্বায়ক)

১। **সাহিত্য শাখা সমিতি :**

সর্বশ্রী শিবদাস চক্রবর্তী (সভাপতি), মনোজ বসু, শঙ্করপ্রসাদ নস্কর, জগন্নাথ চক্রবর্তী, কুমারেশ ঘোষ, সমরেশ বসু, রমেন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত, নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত বসু, কালিদাস ভট্টাচার্য, সম্পাদক (আহ্বায়ক)

২। **দর্শন শাখা সমিতি :**

সর্বশ্রী রমা চৌধুরী (সভাপতি), হৃষীকেশ ঘোষ, মনুজচন্দ্র সর্বাধিকারী, সুকুমার চট্টোপাধ্যায়, দেবনারায়ণ গুপ্ত, অমিয়কুমার মজুমদার, আশুতোষ ভট্টাচার্য, চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, হরনাথ পাল, কল্যাণকুমার বাগচী, সম্পাদক (আহ্বায়ক)

৩। **ইতিহাস শাখা সমিতি :**

সর্বশ্রী দেবনারায়ণ গুপ্ত, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, দিলীপকুমার বিশ্বাস, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবদাস চক্রবর্তী, (সভাপতি), কিরণচন্দ্র চৌধুরী, নিমাই সাধন বসু, রমাকান্ত চক্রবর্তী, তিনকড়ি ভট্টাচার্য, প্রেমবল্লভ সেন, সম্পাদক (আহ্বায়ক)

৪। **বিজ্ঞান শাখা সমিতি :**

সর্বশ্রী বিমলেন্দু নারায়ণ রায়, রামেন্দ্র দেশমুখ্য (সভাপতি), কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায় সুকুমার চট্টোপাধ্যায়, দেবজ্যোতি দাস, প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, কেশবচন্দ্র কর, তরুণদেব ভট্টাচার্য, সম্পাদক (আহ্বায়ক)

৫। **অর্থনীতি শাখা সমিতি :**

সর্বশ্রী জ্ঞানশঙ্কর সিংহ, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (সভাপতি) দুলুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমলেন্দুনারায়ণ রায়, শিব মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণা রঞ্জন বসু, নিত্যপ্রিয় ঘোষ, হরিপদ চক্রবর্তী, অনিল কাঞ্জিলাল, স্বপন বসু, সম্পাদক (আহ্বায়ক)

R. N. 41097/81

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক শ্রীকামাইচন্দ্র পাল পি. এইচ্. ডি. (লণ্ডন), ব্যারিষ্টার-এট্-ল. কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীহরি প্রিন্টার্স, ১২২/৩ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট কলিকাতা-৪ হইতে শ্রীমতী রেখা দে কর্তৃক মুদ্রিত।
মূল্য : চার টাকা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

৯০ বর্ষ ॥ তৃতীয় সংখ্যা ॥

পৌষ

১৩৯০

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসরোজমোহন মিত্র

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,

কলিকাতা-৭০০০০৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

৯০ বর্ষ ॥ তৃতীয় সংখ্যা

পৌষ

১৩৯০

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসরোজমোহন মিত্র

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,

কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচীপত্র

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়ক বিবৃতি—

(৮নং ধারা অনুযায়ী ৪নং ফরম)

১। **প্রকাশের স্থান**—
২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০০০০৬

২। **প্রকাশের কাল পর্যায়**—
ত্রৈমাসিক : আষাঢ়, আশ্বিন, পৌষ এবং চৈত্র

৩। **মুদ্রকের নাম**—
শ্রীমতী রেখা দে, শ্রীহরি প্রিণ্টার্স ১২২/৩, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

৪। **প্রকাশকের নাম**—
ডঃ কানাইচন্দ্র পাল, সম্পাদক ;বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। জাতি—ভারতীয়। ২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাত-৭০০০০৬

৫। **সম্পাদকের নাম**—ডঃ সরোজমোহন মিত্র, জাতি—ভারতীয়। ২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা--৭০০০০৬

৬। **পত্রিকার মালিক**—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩/১,আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০০০০৬

আমি এতদ্বারা জানাইতেছি যে উপরোক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য। স্বাঃ ডঃ কানাইচন্দ্র পাল
প্রকাশক

ধর্মপাল সম্পর্কে নূতন তথ্য

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

আগে ঐতিহাসিকগণের ধারণা ছিল যে, খ্রীস্টীয় অষ্টম-শতাব্দীতে উত্তরভারতে প্রভুত্ব বিস্তারের উদ্দেশ্যে বাংলার পালবংশ, রাজস্থানের জোধপুরবাসী গুর্জর-প্রতিহার বংশ এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট-বংশ—এই ত্রিশক্তির মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এখন দেখা গেছে, এই সিদ্ধান্তে কিছু ত্রুটি আছে। প্রথমতঃ, এই সংঘর্ষে পঞ্চালদেশের অধিপতি আয়ুধবংশীয় রাজগণের ভূমিকা উপেক্ষা করা হয়েছে। এই আয়ুধ রাজ্য আকারে বিশাল ছিল। আয়ুধবংশীয়দের রাজধানী ছিল কান্যকুব্জ; কিন্তু পশ্চিমদিকে তাঁদের রাজ্য রাজস্থান ও পঞ্জাবের কিয়দংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তা না হলে ৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে জৈন হরিবংশের গুজরাতী কবি তাঁর দেশের উত্তরদিকে রাজা ইন্দ্রায়ুধের রাজ্যের বিস্তারের কথা উল্লেখ করতে পারতেন না। দ্বিতীয়তঃ, গৌড়-কান্যকুব্জের বিবাদ ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে মৌখরিরাজ ঈশান বর্মার সময় আরম্ভ হয়ে দ্বাদশশতাব্দীর শেষপাদে সেন-গাহড়বাল আমল পর্যন্ত চলেছিল। হয়তো বিহারের অধিকার নিয়েই এ বিবাদ। অপর দিকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাষ্ট্রকূট এবং গুর্জর-প্রতিহার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই দন্তিদুর্গ এবং প্রথম নাগভটের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের সূচনা হয়। এই বিরোধ গুজরাতের অধিকার নিয়ে এবং দশমশতকে রাষ্ট্রকূট বংশের অবসানের পরেও এর জের মেটেনি।[১]

পালবংশের পরাক্রান্ত সম্রাট্ ধর্মপালের (আ ৭৭৫-৮১০ খ্রী) খালিমপুর তাম্রশাসন এবং তাঁর ভ্রাতার প্রপৌত্র নারায়ণপালের (আ ৮৬১-৯১৭ খ্রী) ভাগলপুর শাসনে ধর্মপালের সঙ্গে কান্যকুব্জ অর্থাৎ বর্তমান কনৌজের আয়ুধরাজবংশের বিবাদের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। খালিমপুর শাসনের দ্বাদশশ্লোকে বলা হয়েছে যে, যখন পঞ্চালদেশের বৃদ্ধেরা সেদেশের রাজাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করছিলেন এবং ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গন্ধার এবং কীরদেশীয় নরপতিগণ সেই কাজে তাঁদের সমর্থন জানাচ্ছিলেন, তখন ধর্মপাল তদধিকৃত কান্যকুব্জনগর পঞ্চালরাজকে উপহার দান করেন। ভাগলপুর শাসনের তৃতীয় শ্লোকে দেখা যায়, ধর্মপাল ইন্দ্ররাজ (অর্থাৎ ইন্দ্রায়ুধ) এবং তাঁর সহায়ক রাজবৃন্দকে পরাজিত করলে মহোদয় অর্থাৎ কান্যকুব্জের শ্রী বা রাজলক্ষ্মী তাঁর অধিকৃত হয় এবং তিনি তখন চক্রায়ুধ নামক প্রার্থীকে তা দান করেছিলেন।[২]

উপরিলিখিত বিবরণের একটা ত্রুটি এই যে, ঐসব ঘটনার তারিখ আমাদের অজ্ঞাত। অবশ্য পরে আমরা দেখব যে, ঘটনাটি হয়তো ৮০০ খ্রীস্টাব্দের বেশী পূর্ববর্তী নয়। আবার রাজাদের এই ধরণের দাবিতে কখনো কখনো কিছু অতিরঞ্জন থাকতে পারে। দুপক্ষের বিবরণ পেলে সেটা অনেক সময় স্পষ্ট হয়। অবশ্য যে দাবিতে শত্রু বা মিত্র-পক্ষের নামের উল্লেখ থাকে, তা একেবারে মিথ্যা হবার সম্ভাবনা কম। আমরা দেখেছি যে, ইন্দ্রায়ুধ ৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে রাজত্ব করছিলেন। জৈন হরিবংশ অনুসারে তখন গুজরাতের পশ্চিমাঞ্চলবর্তী দেশের রাজা ছিলেন বৎসরাজ এবং তার দক্ষিণদিকের দেশের রাজা কৃষ্ণপুত্র শ্রীবল্লভ। এই বৎসরাজ গুর্জর প্রতিহারবংশীয়; জোধপুরের নিকটবর্তী ভিল্লমাল (ভিনমাল) তাঁর রাজধানী ছিল। শ্রীবল্লভ হচ্ছেন রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণের পুত্র দ্বিতীয় গোবিন্দ (আ ৭৭৮-৮৩ খ্রী) কিংবা তাঁর ভ্রাতা ধ্রুব (আ ৭৮৩-৯৪ খ্রী)। ধ্রুবের পুত্র তৃতীয় গোবিন্দের (আ ৭৯৪-৮১৪ খ্রী) তাম্রশাসন অনুসারে যে-বৎসরাজ গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করে তাঁর শ্বেতছত্রদ্বয় অধিকার করেছিলেন, তিনি তাঁর পিতা ধ্রুবের হস্তে

পরাস্ত হয়ে মরুমধ্যে পলায়ন করতে বাধ্য হন। দেখা যাচ্ছে, ধর্মপালের আক্রমণে পর্যুদস্ত ইন্দ্রায়ুধকে সাহায্যের জন্য বৎসরাজ পালসম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হন। কিন্তু রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের হস্তে পরাজয়ের পর তিনি আর কান্যকুব্জরাজকে সাহায্য করতে পারেননি। তখন ধর্মপালের আক্রমণ থেকে ইন্দ্রায়ুধকে রক্ষা করার জন্য তাঁর আমন্ত্রণে ধ্রুবকেই অগ্রসর হতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার পর ধর্মপাল আবার কনৌজ আক্রমণ করেন। এই অবস্থায় কি হয়েছিল, বৎসরাজের একখানি অধুনাবিষ্কৃত শিলালেখে সে সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়।[৩] ধর্মপাল ও ইন্দ্রায়ুধের বিরোধ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

৭১৭ শকাব্দে (৭৯৩ খ্রী) উৎকীর্ণ এই অভিলেখে বৎসরাজ দাবি করেছেন যে, তাঁর সামন্ত শ্রীবর্মক ও তৎপুত্র গল্লকনামক নায়কদ্বয়ের সহায়তায় তিনি কান্যকুব্জ অধিকারপূর্বক ইন্দ্ররাজকে সিংহাসনে পুনঃস্থাপিত করেছিলেন। এর অর্থ এই যে, ৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই ধর্মপাল ইন্দ্রায়ুধকে কান্যকুব্জ থেকে বিতাড়িত করেন; কিন্তু বৎসরাজ ধর্মপালকে পরাজিত করে কান্যকুব্জরাজকে সিংহাসনে পুনঃস্থাপন করতে সমর্থ হন। এদিকে খালিমপুর ও ভাগলপুর শাসনে ধর্মপালের যে কৃতিত্বের উল্লেখ আছে, সেটা এর পরবর্তীকালের ঘটনা বলে বোধ হয়। তবে তো ইন্দ্রায়ুধ ৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের পরেও একবার ধর্মপাল দ্বারা সিংহাসনচ্যুত হয়েছিলেন।

খালিমপুর ও ভাগলপুর শাসনানুসারে ধর্মপাল ইন্দ্রায়ুধ ও তাঁর সহায়ক রাজাদের পরাজিত করেন এবং তৎকর্তৃক ইন্দ্রায়ুধের রাজধানী কান্যকুব্জনগর নিজের অনুগত নবীন পঞ্চালরাজ চক্রায়ুধকে প্রদত্ত হয়। এই ঘটনা ৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের পূর্ববর্তী নয়। কারণ আনুমানিক ৮০২ খ্রীস্টাব্দে যখন রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ কান্যকুব্জ অঞ্চলে উপস্থিত হন, তখন চক্রায়ুধ ও ধর্ম (ধর্মপাল) তাঁর কাছে নতিস্বীকার করেছিলেন, সঞ্জান তাম্রশাসনে এই কথা দেখা যায়। গোবিন্দ বৎসরাজ-পুত্র দ্বিতীয় নাগভটকে (আ ৮০০-৩৩ খ্রী) পরাজিত করেন এবং সম্ভবতঃ ইন্দ্রায়ুধের সাহায্যার্থ উত্তরপ্রদেশে উপস্থিত হন। কিন্তু এর মধ্যে ইন্দ্রায়ুধের মৃত্যু হয়েছিল বলে বোধ হয়। তাই হয়তো গোবিন্দ চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের রাজা স্বীকার করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এদিকে কিছুকাল পরে চক্রায়ুধ ও তাঁর সহায়ক বঙ্গপতি (বোধহয় ধর্মপাল) নাগভটের হস্তে পরাস্ত হলেন এবং নাগভট কর্তৃক গুর্জর-প্রতিহার রাজধানী ভিল্লমাল থেকে কান্যকুব্জে স্থানান্তরিত হল। কি করে এটা ঘটেছিল, তা বলা কঠিন। নাগভটের একজন সামন্ত বলেছেন যে, তিনি গৌড়গণের সঙ্গে মুদ্গগিরি বা মুঙ্গেরের যুদ্ধে যশ অর্জন করেছিলেন; অর্থাৎ গুর্জর-প্রতিহার সেনা পূর্বদিকে মুঙ্গের পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু পাটনা ও গয়া জেলায় দেবপালের (আ ৮১০-৪৭ খ্রী) এবং বারাণসী জেলায় তাঁর পুত্র শূরপালের (আ ৮৪৭-৬০ খ্রী) অধিকারের প্রমাণ আছে। এই সময় তিব্বতরাজগণ গুর্জর-প্রতিহারদের সঙ্গে একযোগে পালসাম্রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন বলে বোধ হয়। তিব্বতের রাজা Mu-tig Btsan-po (৮০৪-১৫ খ্রী) ধর্মপালকে পরাস্ত করার দাবি করেছেন। Ral-pa-chan (৮১৭-৩৬ খ্রী) বলেছেন যে, তিনি গঙ্গাসাগর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। কিছুকাল পরে গুর্জর-প্রতিহার মহেন্দ্রপাল (আ ৮৮৫-৯০৮ খ্রী) দক্ষিণবিহার ও উত্তরবাংলায় দীর্ঘকালের জন্য অধিকার বিস্তার করেছিলেন। তার অল্পকাল পরেই উত্তরবাংলায় কিছুদিনের জন্য কম্বোজজাতির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেকে মনে করেন, এই কম্বোজেরা তিব্বতীয় জাতি এবং তারা বর্তমান কোচ বা কোঁচ জাতির পূর্বপুরুষ।[৪]

ধর্মপাল যে তাঁর সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন, তার প্রমাণ এই যে একাদশ

শতকে গুজরাতী কবি সোড্‌ঢল তাঁর 'উদয়সুন্দরীকথা'য় তাঁকে উত্তরাপথস্বামী অর্থাৎ আর্যাবর্তের অধীশ্বর বলেছেন। তাতে বোঝা যায়, বাংলার বাইরে সুদূর পশ্চিমভারতে পর্যন্ত দীর্ঘকাল ধরে ধর্মপালের রাজনৈতিক প্রভুত্বের স্মৃতি জাগরূক ছিল। সম্প্রতি আমরা দেখতে পাচ্ছি, ধর্মপালের সমসাময়িক এবং শত্রু বৎসরাজ তাঁর নবাবিষ্কৃত শিলালেখে তৎকর্তৃক পরাজিত গৌড়েশ্বর অর্থাৎ ধর্মপালকে 'চতুরুদধিপতি' অর্থাৎ চক্রবর্তিক্ষেত্রের অধিকর্তা বলে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং পালসম্রাটের অপূর্ব রাজনৈতিক মর্যাদা তাঁর শত্রুপক্ষ পর্যন্ত স্বীকার করত। ধর্মপালের মৃত্যুর কিছুকাল পরে (৮৫১ খ্রী) রচিত 'সিল্‌সিলাতুৎতয়ারখ' সংজ্ঞক গ্রন্থে আরবদেশীয় বণিক সুলেইমান্ পূর্বভারতীয় পাল-সাম্রাজ্যটিকে 'ধর্ম' (অর্থাৎ ধর্মপাল) নামে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে পালসম্রাট্ প্রতিবেশী রাষ্ট্রকূটরাজ এবং গুর্জর-প্রতিহাররাজ অপেক্ষা সৈন্যবলে অধিক বলীয়ান্ ছিলেন। তিনি পঞ্চাশসহস্র হস্তী নিয়ে যুদ্ধ করতে যেতেন এবং তাঁর সেনাদলের কাপড়-চোপড় কাচার জন্য দশ থেকে পনের সহস্র রজক তাঁর সঙ্গে যেত। সুলেইমানের বিবরণ অনুসারে রাষ্ট্রকূটরাজ তৎকালে পৃথিবীর চারজন শ্রেষ্ঠ নরপতির মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। এই চারজন হচ্ছেন বাগদাদের খলিফা, রুম অর্থাৎ কন্‌স্তান্তিনোপলে রাজত্বকারী পূর্বরোম-সাম্রাজ্যের সম্রাট্, চীনসম্রাট্ এবং ভারতের রাষ্ট্রকূটরাজ। সুতরাং আরব বণিকের মতে পৃথিবীর চারজন শ্রেষ্ঠ নরপতির অন্যতম রাষ্ট্রকূটরাজ অপেক্ষাও শক্তিশালী ছিলেন পাল-বংশীয় সম্রাট্। তাই তৎকালীন পৃথিবীর ইতিহাসে পূর্বভারতের পালবংশীয় সম্রাট্ যে একজন মহাপরাক্রান্ত নরপতি রূপে পরিগণিত হতেন, তাতে সন্দেহ নেই।[৫]

ধর্মপালের বিজয়গৌরবই উত্তরভারত-বোধক 'পঞ্চগৌড়' নামটির উৎপত্তির কারণ বলে মনে হয়। পরবর্তীকালে উত্তরভারতের ব্রাহ্মণসমাজ যে পাঁচভাগে বিভক্ত হয়, সেগুলি পঞ্চগৌড় নামে প্রসিদ্ধ। সে পাঁচটি হচ্ছে—সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মৈথিল এবং উৎকল। 'পঞ্চগৌড়' নামের সর্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায় রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্রের চিঞ্চনি তাম্রশাসনে (৯২৬ খ্রী)। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত 'রাজতরঙ্গিণী'তেও 'পঞ্চগৌড়' উল্লিখিত আছে। পরবর্তীকালের মিথিলাধিপতি শিবসিংহ 'পঞ্চগৌড়েশ্বর' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।[৬]

টীকা

১। দীনেশচন্দ্র সরকার, Kanyakubja-Gauda Struggle from the Sixth to the Twelveth Century A.D (in the press)।

২। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, গৌড় লেখমালা, পৃষ্ঠা ১ এবং ৫৫ থেকে।

৩। Epigraphia Indica, Vol. XLI (in the press)।

৪। দীনেশচন্দ্র সরকার, পাল-সেনযুগের বংশানুচরিত, পৃষ্ঠা ৫৮ থেকে।

৫। Elliott and Dowson, History of India as told by its own Historians, Vol. I. pp. 3ff.

৬। Ep. Ind. Vol. II. pp. 53 and 334.

মহাপ্রভু ও অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ

শ্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারী

বৈষ্ণব জগতে রাধাগোবিন্দ নাথ একজন অতুলনীয় পুরুষ ছিলেন। গত পাঁচশত বৎসরের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে এত দান আর কোন এক ব্যক্তি করেন নাই। তাঁর মহাদানে বৈষ্ণব সাহিত্য আজ সমৃদ্ধ। তিনি আমাদের অসীম শ্রদ্ধার আস্পদ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের তিনি একজন বিশিষ্ট আচার্য পদবাচ্য।

বাঙ্গালী আত্মভোলা জাতি। প্রায়ই তাহারা মহৎ ব্যক্তিদের ভুলিয়া যায়। বৈষ্ণবাচার্য নাথ মহাশয়ের দান যে আমরা ভুলিয়া যাই নাই ইহা শ্লাঘনীয়। তাঁহার একখানি স্মারক গ্রন্থও হইয়াছে। তাহাতে প্রথম প্রবন্ধে আমি তাঁহাকে ঋষি বলিয়াছি। সেই ঋষির গভীর ভক্তি ও জ্ঞানগর্ভ দান হইতেই কিঞ্চিৎ মাত্র আলোচনা করিব। তাঁহাকে স্মরণ করিব, করিয়া ধন্য হইব।

পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার ধর্ম আছে। হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ইসলাম প্রভৃতি। ইহাদের প্রায় প্রত্যেক ধর্ম মতেরই জীবন দর্শন একটা আছে। উহা বিভিন্ন প্রকারের। ভারতের হিন্দুদের জীবন দর্শন সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া একটা বিশেষ প্রকারের রূপ নিয়াছে, এক কথায় সেটাকে বলা যায় বেদান্ত দর্শন। হিন্দুধর্মের নরনারী ছোট বড় শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই জীবনাদর্শ, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বেদান্ত ভিত্তিক।

ভারতে বহুপ্রকারের দর্শন সৃষ্টি হইয়াছে। তন্মধ্যে বেদান্ত দর্শনই সর্বশ্রেষ্ঠ। বেদান্ত বা বৈদান্তিক চিন্তা শুধু ভারতের নয় বিশ্বমানবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বেদান্ত ভারতীয় জাতির জীবন। এই জাতির সকল চিন্তা সকল চেষ্টা সকল আদর্শ ভাবনা বেদান্তকে কেন্দ্র করিয়াই প্রবর্তিত হইয়াছে। ভারতের মর্মবাণী উপলব্ধি করিতে হইলে বেদান্ত শাস্ত্রকে জানিতেই হইবে।

হিন্দুধর্মের মধ্যে বহুমত বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। সেই সব ধর্মমতের শ্রেষ্ঠ আচার্যগণ প্রায় প্রত্যেকেই নিজ জীবনে ও ধর্মমত প্রচারণে এক একটা বৈদান্তিক চিন্তাধারা অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন। সেইটাই সেই সেই ধর্মমতের জীবন দর্শন। ঐ জীবন দর্শনের বর্তিকাই তাঁহাদের দৈনন্দিন চলার পথে ও ভাবনা রাজ্যে আলোক প্রদান করে।

বেদান্ত দর্শনের দুইটি ধারা। একটি জ্ঞানের ধারা আর একটি ভক্তির ধারা। কেহ কেহ ইহাকে ঋষির ধারা ও মুনির ধারাও বলেন। যদিচ সকল আচার্যই বেদান্তানুসারী তথাপি সাধারণতঃ জ্ঞান ধারার আচার্যদের বলা হয় বৈদান্তিক ও ভক্তিধারার আচার্যদের বলা হয় বৈষ্ণব। জ্ঞানধারার শ্রেষ্ঠ আচার্য গৌড় পাদ, শঙ্কর, শ্রীকণ্ঠ, ভাস্কর, মধুসূদন (প্রভৃতি অগণিত)। বৈষ্ণব ধারার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আচার্য রামানুজ, নিম্বার্ক, বিষ্ণুস্বামী, মধ্ব, বল্লভ, শ্রীজীব, বলদেব প্রমুখ বহুভক্ত।

উল্লিখিত আচার্যপাদগণ মধ্যে অধিকাংশই খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী। ঐ শতাব্দীর শেষভাগে একজন বিরাট আচার্য বাংলাদেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তিনি শুধু আচার্য নহেন, অনেকেই মনে করেন তিনি বেদান্ত প্রতিপাদ্য পরতত্ত্বই আচার্যের সাজে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্য দেব। তাঁহার আবির্ভাব ভূমি গৌড়দেশ বলিয়া তাঁহার আচরিত ও প্রচারিত ধর্মমতকে গৌড়ীয় বেদান্তমত বলা হয়।

জ্ঞানধারার আচার্যগণ মধ্যে শ্রীশঙ্করাচার্যই সর্বশ্রেষ্ঠ। ভক্তিধারায় গৌড়ীয় মতের আচার্যগণের শিরোমণি শ্রীচৈতন্যদেব। শঙ্করাচার্যকে শ্রীশিবের অবতার বলা হয়।

শ্রীচৈতন্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার রূপে পূজা করা হয়। শ্রীশিবের অপর নাম হর। শ্রীকৃষ্ণের অপর নাম হরি। অনেক মহাত্মার ভজন ধারায় হরিহর অভিন্ন। হরিহর অভিন্ন হইলেও শ্রীশঙ্কর ও শ্রীচৈতন্যের বেদান্তভিত্তিক জীবনাদর্শ এক নহে। তাঁহাদের কোথায় ঐক্য কোথায় পার্থক্য তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

ভিত্তিভূমি একই ব্রহ্মসূত্র। কিন্তু তাহার উপরে প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক মতবাদ অন্যূন সাতটি। শঙ্করাচার্যের কেবলাদ্বৈতবাদ, ভাস্করাচার্যের ঔপাধিক ভেদাভেদবাদ, রামানুজাচার্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, নিম্বার্কাচার্যের স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ, মধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদ, বিষ্ণু স্বামীর শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, শ্রীচৈতন্যদেবের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ। শেষোক্তটি আমাদের মুখ্য আলোচনীয় বিষয়।

ঐতিহাসিক ধারায় এই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদটি সর্বকনিষ্ঠ। কিন্তু তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এই মতবাদটি ব্রহ্মসূত্রের আবির্ভাব অবধি অন্তর্লীন হইয়া আছে। প্রত্যেকটি মতবাদকে গভীর ভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় সকলের অন্তরের হার্দ্দ এই অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ। যদিচ ভাষায় ও ভাবে তাহা সুস্পষ্ট নহে। ইহা দ্বারা এই কথাই বলিতে চাহিতেছি যে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই বেদান্তের প্রকৃত সিদ্ধান্ত। এই কথা সর্বজনগৃহীত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না।

ব্রহ্মসূত্রের উপর শ্রীচৈতন্যদেবের কোনও ভাষ্য নাই। তাহার কারণ প্রারম্ভেই বলা প্রয়োজন। অপৌরুষেয় শাস্ত্রই বেদশাস্ত্র। বেদের প্রাণমন্ত্র প্রণব। প্রণবের অর্থ ব্যক্ত হইয়াছে গায়ত্রীতে। গায়ত্রীর অপর নাম তাই বেদমাতা। বেদ ও উপনিষদ সমূহের অভ্যন্তরে গভীর ভাবে প্রবেশ করিয়া মর্ম উদ্ঘাটন করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস ৫৫৫টি ব্রহ্মসূত্রে। ব্রহ্মসূত্রের মত চতুঃশ্লোকীও একইভাবে বেদব্যাসের হৃদয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকটিত হইয়াছে। যাহা ব্রহ্মসূত্রে সূত্রাকারে তাহাই চতুঃশ্লোকীতে শ্লোকাকারে প্রকটিত। ব্রহ্মসূত্র খুব কঠিন, রহস্যপূর্ণ ও দুর্বোধ্য হওয়ায় বেদব্যাস নিজেই চতুঃশ্লোকীতে ব্যক্ত করেন শ্রীমদ্ভাগবতে বিস্তার রূপে। এই ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য।

গরুড় পুরাণ বলিয়াছেন "শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রানাং ভারতার্থ বিনির্ণয়ঃ।" "গায়ত্রী ভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ পরিবৃংহিতঃ॥" এই কথা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীগ্রন্থ বলিয়াছেন সুললিত ভাষায়, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কণ্ঠে—

প্রভু কহে আমি জীব অতি তুচ্ছ জ্ঞান।
ব্রহ্মসূত্রের গম্ভীরার্থ ব্যাস ভগবান্॥
তার সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে।
অতএব আপন সূত্রের করিয়াছেন ব্যাখ্যানে॥
যে সূত্রকর্তা সে যদি করে ব্যাখ্যান।
তবে সূত্রের মূলঅর্থ লোকের হয় জ্ঞান॥
প্রণবের যেই অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয়॥
ব্রহ্মারে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকীয়ে কহিল।
ব্রহ্মা নারদেরে সেই উপদেশ কৈল॥
সেই অর্থ নারদ ব্যাসেরে কহিল।
শুনি বেদব্যাস মনে বিচার করিল॥
এই অর্থ আমার সূত্রের ব্যাখ্যা রূপ।
শ্রীমদ্ভাগবত করিব সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ॥

সুতরাং ভাগবতই হইল ব্রহ্মসূত্রের যথার্থ ভাষ্য। সূত্রের এই অকৃত্রিম ভাষ্য ভাগবত থাকিতে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকারগণের নূতন ভাবে মূল্যায়ণ করিতে হইবে। যে ভাষ্যকারের যে কথা শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগত তাহাই আদরণীয়। যাহা ভাগবতের অনুগত নহে বরং বিরুদ্ধার্থ তাহা ভাষ্যকারের স্বকপোলকল্পিত বলিয়া গ্রহণের অযোগ্য।

শ্রীচৈতন্যদেব যে কেবল বেদান্তসূত্রের ভাষ্য লিখেন নাই তাহাই নহে তিনি কোন গ্রন্থই রচনা করেন নাই। তাহার আটচল্লিশ বৎসরব্যাপী জীবনলীলাই শ্রীমদ্ভাগবতের জীবন্ত ভাষ্য। সেই লোকোত্তর জীবনলীলা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারা বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য না লিখিয়া শুধু শ্রীমদ্ভাগবতের উপর টীকা টীপ্পনী ভাষ্য, নিবন্ধ সন্দর্ভাদি লিখিয়াছেন। ভাগবতের ব্যাখ্যাকারগণ মধ্যে শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, সর্বশ্রেষ্ঠ।

শ্রীরূপগোস্বামীর লঘুভাগবতামৃতভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীসনাতন গোস্বামীর বৃহদ্ভাগবতামৃত কৃষ্ণলীলাস্তব প্রভৃতি উপাদেয় গ্রন্থ ভাগবতভিত্তিক। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত শ্রীগ্রন্থে মহাপ্রভুর মধুর লীলা বাংলা কবিতায় রূপায়ণ করিয়াছেন, ভাগবতীয় শ্রীকৃষ্ণ লীলার আলোকে। এই সকল গ্রন্থ হইতে মহাপ্রভুর কি হার্দ্দ, কি জীবনাদর্শ, কি অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের রহস্য সকলই নির্ভুলভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

পূর্ববর্তী দার্শনিক মতবাদের পার্শ্বে দাঁড় না করাইয়া পরবর্তী কোন দার্শনিক সিদ্ধান্ত আলোচনা করা সুন্দর হয় না। অচিন্ত্যভেদাভেদ সুষ্ঠু রূপে আলোচনা করিতে হইলে পূর্ববর্তী অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও ভেদাভেদবাদের পাশাপাশি দাঁড় করাইয়াই স্থাপন করা প্রয়োজন। বিস্তারভয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনায় বিরত থাকিয়া শুধু আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদের পার্শ্বে উপস্থিত করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ উপস্থাপন করিতে প্রয়াসী হইব। এই ত্রুটি সুধীজন ক্ষমাসুন্দর চক্ষে দেখিবেন।

আমরা চেতনাবিশিষ্ট জীব। আমাদের সম্মুখে আমাদের চেতনার বিষয় হইয়া আছে বিশাল জগৎ। এই জীব ও জগতের যিনি মূল কারণ-ঈশ্বর। এই তিনটি বিষয় লইয়াই বেদান্তের মুখ্য আলোচনা। জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে কি সম্বন্ধ, ঈশ্বর ও জগতের সঙ্গে কি সম্পর্ক—ইহা লইয়া বহু মত-বৈষম্য দৃষ্ট হয়। যদিও সকলেরই উপজীব্য ব্রহ্মসূত্র, উপনিষদ ও ভগবদ্গীতা।

আচার্য শঙ্কর বলেন—জীবই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই জীব—ইহারা একই অভিন্ন। অজ্ঞানতা-বশতঃ ভিন্ন মনে হয়। মধ্বাচার্য বলেন—জীব ভগবান হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন—স্রষ্টা ও সৃষ্ট কোন প্রকারেই অভিন্ন হইতে পারে না। ইহাদের অভিন্নতা ভাবনা অপরাধ, এক মত বলেন অভেদ চিন্তাকরা পাপ. আর একমত বলেন ভেদ চিন্তাকরা পাপ। এই দুই প্রান্ত—অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ। ইহাদের মধ্যস্থলে আছেন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ। সকল বাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আনিবার চেষ্টা চালাইয়াছেন অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ।

উপনিষদই-জগতে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উপনিষদকেই বলে শ্রুতি। শ্রুতির বাক্যই ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে একমাত্র প্রমাণ। শ্রুতিবাক্য—ব্রহ্ম "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ব্রহ্ম এক, দ্বিতীয় রহিত। এই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" মন্ত্রকে আচার্য শঙ্কর সুদৃঢ়ভাবে ধরিয়াছেন। তিনি বলেন ব্রহ্ম সর্বপ্রকার দ্বিতীয়রহিত, ভেদশূন্য। তিনি—নিরুপাধি নির্গুণ নিঃশক্তিক। ব্রহ্মে কোন শক্তি স্বীকার করিলে ব্রহ্মে ভেদ স্বীকার করিতে হয়

শক্তি স্বীকার করিলে একামেবাদ্বিতীয়ম্ প্রতিজ্ঞা নষ্ট হইয়া যায়। একটি বস্তু ব্রহ্ম, আর একটি বস্তু শক্তি। সুতরাং অদ্বয়ত্ব থাকেনা।

শঙ্করের বিরুদ্ধবাদিরা প্রশ্ন করেন যে এই যে বৈচিত্র্যময় জগৎ ইহা ত ব্রহ্মই সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টি করিলেই বুঝিতে হইবে তাহাতে সৃজনীশক্তি আছে। তিনি পালন করেন, সংহার করেন, ইহাতেই বুঝা যায় তাঁহাতে পালনী ও সংহারিণী শক্তি আছে। সুতরাং একেবারে শক্তি নাই ব্রহ্মেতে একথা কি করিয়া বলা যায়।

এই পূর্বপক্ষের উত্তরে শঙ্কর বলেন যে, দৃশ্যমাণ জগৎটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। একেবারেই ভ্রান্তি। অন্ধকারে একগাছি দড়ি দেখিয়া তাহাকে যেমন সর্প বলিয়া ভ্রান্তি হয় সেইরূপ একমাত্র ব্রহ্মই আছেন--অজ্ঞানতান্ধকারে তাঁহাকে জগৎরূপে মনে হয়। ব্রহ্মই সত্য জগৎ ভানমাত্র, মিথ্যা। মিথ্যার আবার সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা কি ?

শঙ্করের বিরুদ্ধবাদী প্রধানতঃ বৈষ্ণব আচার্যেরা। তাঁহার পূর্বপক্ষ বলেন যে, দিনের উজ্জল আলোকে কখনও রজ্জুকে সর্প বলিয়া মনে হয় না, অন্ধকারেই হয়। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, আলোময়, তাহাতে অন্ধকার কোথায় ? উত্তরে শঙ্কর বলেন, ঐ অন্ধকারটার নাম মায়া। মায়ার দুইটি কাজ আবরণ আর বিক্ষেপ। সত্যকে ঢাকিয়া রাখে ইহা আবরণ। মিথ্যাকে দেখায় ইহা বিক্ষেপ। সত্য দড়িকে ঢাকিয়া রাখে দেখিতে দেয়না ইহা আবরণ। মিথ্যা সর্পকে দেখায় ইহা বিক্ষেপপদবাচ্য। মায়া ব্রহ্মবস্তুকে দেখিতে দেয় না ইহা—আবরণ। মিথ্যা-জগৎকে দেখায় ইহা—বিক্ষেপ।

বৈষ্ণবাচার্যেরা প্রশ্ন করেন—আবরণ ও বিক্ষেপ ঘটাইবার মত শক্তিবিশিষ্ট মায়া নামক একটা বস্তু তাহা হইলে আছে। যদি থাকে তাহা হইলে ব্রহ্ম ও মায়া দুইটি বস্তু হইল। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" তত্ত্ব টিকিল কোথায় ? শঙ্করপন্থীদের উত্তর এই যে, মায়া নামক একটা বস্তু আছে একথা আমরা বলি নাই। তবে কি মায়া নাই ? মায়া নাই তাহাও বলি না। একেবারে না থাকিলে আবরণ, বিক্ষেপ ঘটায় কে ? মায়া থাকিলে অদ্বয়বাদের হানি হয়। না থাকিলে আবরণ বিক্ষেপ ঘটায় কে ? এই উভয়মুখী বিপদ (Dillema) মধ্যে আচার্য শঙ্কর খুব চাতুর্যপূর্ণ উত্তর দেন। বলেন, মায়া আছে একথাও ঠিক নয়, মায়া নাই একথাও ঠিক নয়। মায়া অনির্বচনীয়। মায়া সৎও নয়, অসৎও নয়। শঙ্করের এই সৎ-অসতের মধ্যবর্তী মায়া নামক একটা অত্যদ্ভুত বস্তু—নাই। থাকিতে পারে না। উহা শঙ্করের একটা মায়া স্থাপনের কৌশল মাত্র।

শঙ্করাচার্যেরা এই ভ্রমের ব্যাখ্যা বৈষ্ণবাচার্যেরা গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বলেন—আবরণ বিক্ষেপ কার্যে সক্ষম একটা কাল্পনিক মায়া মানিবার প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃ কথা এই যে, দড়ি আর সাপের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে, বৈসাদৃশ্যও আছে। অন্ধকারে সাদৃশ্য অংশ দৃষ্টিগোচর হইয়াছে—তাহাই ভ্রম। আলো আসিলে বৈসাদৃশ্য অংশও দৃষ্টিগোচর হইল, ভ্রম চলিয়া গেল। ভ্রম হইল আংশিক জ্ঞান। এই জগৎটার মধ্যে ব্রহ্মকে আংশিক ভাবে দেখা যাইতেছে। পূর্ণভাবে দেখা যাইতেছে না। বৈচিত্র্যময় জগৎটা ব্রহ্মের ভ্রান্তিমাত্র নহে, ব্রহ্মের আংশিক জ্ঞানমাত্র। ব্রহ্মও সত্য জগৎও সত্য।

ভ্রমজ্ঞানের বহু প্রকার ব্যাখ্যা আছে। শঙ্করের ব্যাখ্যাকে বলে অনির্বচনীয়তা খ্যাতি। যে মত দ্বারা তাহা খণ্ডন করা হইল তাহাকে বলে সৎখ্যাতি। রামানুজাচার্য সৎখ্যাতিবাদী।

শঙ্করের মতে জগৎ মিথ্যা। ইহারই নাম মায়াবাদ। বৈষ্ণবাচার্যেরা মায়াবাদকে কঠোরভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। সৎও নয় অসৎও নয় এইরূপ একটি বস্তুর কথা বেদে

নাই। মায়াবাদ অবৈদিক, অশাস্ত্রীয়। এই মায়া আচার্য শঙ্করের স্বকপোলকল্পিত। আরও পূর্বপক্ষ আছে। মায়ার আশ্রয় কি? মায়া থাকে কোথায়? মায়া কি ব্রহ্ম হইতে পৃথক না অপৃথক? যদি পৃথক হয়—অদ্বৈতবাদ টিকেনা, যদি বল অপৃথক-অভিন্ন—তাহা হইলে জ্ঞানস্বরূপ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের মধ্যে মায়ার স্থান কোথায়? মায়া ব্রহ্মকে আবৃত করিতে পারিলে ব্রহ্মের স্বপ্রকাশতার হানি হয়। শ্রুতির "একমেবাদ্বিতীয়ম্" মন্ত্র আচার্য শঙ্কর খুব দৃঢ়ভাবে ধরিয়াছেন। গৌড়ীয় আচার্যেরাও অনুরূপ দৃঢ়ভাবে ধরিয়াছেন, কারণ শ্রুতির অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত পরমতত্ত্বকে "অদ্বয়" বলিয়াছেন—

বদন্তি তত্ত্ববিদ স্তত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

ভাগবতের এই শ্লোকে পরম তত্ত্ববস্তুকে অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব বলা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ ঐ শ্লোকের অনুবাদে বলিয়াছেন—

অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব বস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান তিন তার রূপ॥

তবে, আচার্য শঙ্করের অদ্বয়ত্ব ও গৌড়ীয় আচার্যগণের "অদ্বয়ত্ব" এক কথা নহে। কী পার্থক্য তাহা বলা যাইতেছে।

ভেদ তিন প্রকার। স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত। আম গাছ ও কাঁঠাল গাছ দুইই বৃক্ষ জাতি—স্বজাতি, কিন্তু তাহাদের মধ্যে ভেদ আছে। এই ভেদ স্বজাতীয় ভেদ। একটি মানুষ ও একটি অশ্ব—ইহাদের মধ্যে যে ভেদ তাহা বিজাতীয় ভেদ। এই দুই প্রকার ভেদ ব্রহ্ম বস্তুতে থাকিতে পারে না। কারণ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন বস্তু নিখিল বিশ্বে বিদ্যমান নাই। সুতরাং তাহাতে স্বজাতীয় বা বিজাতীয় কোনপ্রকার ভেদই নাই।

তৃতীয় আর একপ্রকার ভেদ আছে তাহাকে বলে স্বগতভেদ। স্বগতভেদ বলিতে অভ্যন্তরীণ ভেদ বুঝায়। একটা দালান তৈয়ারী করিতে ইট চুন বালি লোহা লাগিয়াছে। ইহা দালানের স্বগত ভেদ। কারণ এই সকল উপাদান পরস্পর ভিন্ন। ব্রহ্মেতে স্বগত ভেদ থাকিতে পারে না। কারণ ব্রহ্মেতে কোন উপাদান নাই। ব্রহ্ম চিদ্‌ঘন। চিদ্‌বস্তু ঘনীভূত। একইভাবে সমানভাবে ব্রহ্মেতে চিদ বস্তু বিরাজিত। শ্রুতি বলেন 'ব্রহ্ম একরসম্।'

আচার্য শঙ্কর বলেন ব্রহ্ম স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত-ভেদশূন্য। শ্রীরামানুজ বলেন ব্রহ্মে স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদ নাই বটে কিন্তু স্বগত-ভেদ আছে। চিৎ ও অচিৎ, জীব ও জগৎ এই দুই ব্রহ্মের স্বগত-ভেদ। জীবও সত্য জগৎও সত্য তাহারা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মেতে আছেন স্বগত-ভেদ রূপে। এই সিদ্ধান্ত রামানুজ বহু বিচার করিয়া স্থাপন করিয়াছেন। এইজন্য রামানুজের মতবাদের নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। অদ্বৈত ব্রহ্ম চিৎ জীব ও অচিৎ জগৎ এই দুই বিশেষণে বিশেষিত বা বিশিষ্টতাযুক্ত।

গৌড়ীয় আচার্য শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীরামানুজ আচার্যের সঙ্গে একমত নহেন। তিনি শ্রীশঙ্করের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া বলেন ব্রহ্মে স্বগতভেদও নাই। শঙ্করও ব্রহ্মে স্বগতভেদ মানেন না। এই জন্যই তিনি যুক্তিযুক্ত ভাবেই জগৎকে বলেন মিথ্যা ও জীবকে বলেন ব্রহ্মভিন্ন। মহাপ্রভুর মতে জীবও সত্য জগৎও সত্য অথচ তিনি ব্রহ্মে স্বগতভেদ স্বীকার করেন না। সুতরাং এই পক্ষের যুক্তি বিশেষভাবে অনুধাবন করিতে হইবে।

শ্রীজীব মহাপ্রভুও হার্দ্দ স্থাপন করিতে ব্রহ্মে স্বগতভেদ স্বীকার করেন নাই। অথচ জীবকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলেন নাই। জগৎকেও মিথ্যা বলেন নাই। ইহা কিরূপে সামঞ্জস্যতা লাভ করিল? শ্রীজীব ব্রহ্মে স্বগতভেদ মানেন নাই কিন্তু ব্রহ্মে শক্তির সত্তা বিশেষ ভাবেই স্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্ম নিঃশক্তিক নহেন। যত শক্তিমান জীব ও

জগৎ ব্রহ্মের তটস্থাও বহিরঙ্গা শক্তি। শক্তি মানিলে স্বগত-ভেদ হয় না কি ? শ্রীজীব বলেন—হয় না। কারণ শক্তি আর ব্রহ্ম পৃথক নহে ভেদাভেদ সম্বন্ধ বিশিষ্ট। অগ্নির দাহিকা শক্তির মত ব্রহ্মেতে শক্তি স্বাভাবিক, আগন্তুক নহে।

শঙ্কর বলেন জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। বৈষ্ণবাচার্যেরা বলেন ইহা শ্রুতি বিরুদ্ধ। শ্রুতি বলেন ব্রহ্ম বিভু। জীব অণু। একটা কেশকে শতভাগ করিলে যতটুকু সূক্ষ্ম হয় জীব তত সূক্ষ্ম, সুতরাং অণু জীব ও বিভু ব্রহ্ম অভিন্ন কি করিয়া হয়। শ্রুতি বলেন জীব অনন্ত, অসংখ্য আর ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। সুতরাং কি করিয়া ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হয় ?

শ্রুতিতে ব্রহ্মতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে দুই প্রকারের বাক্য আছে। তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। এই সকল বাক্য জীব ব্রহ্মের অভেদাত্মকতা জ্ঞাপক। শঙ্কর বলেন যে সকল শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মের সঙ্গে অভেদত্ব জ্ঞাপক ঐ গুলিই পারমার্থিক সত্য। যেগুলি ভেদজ্ঞাপক সেগুলি ব্যবহারিক সত্য।

বৈষ্ণবাচার্যেরা বলেন সত্যের এই দ্বিবিধ ভেদ পারমার্থিক ও ব্যবহারিক—শ্রুতিতে কোথাও দৃষ্ট হয় না। এই দ্বিবিধ ভেদ আচার্য শঙ্করের স্বকপোলকল্পিত, শ্রুতি স্মৃতিসিদ্ধ নহে। অভেদাত্মক মন্ত্র পাইলেই তাহা পারমার্থিক সত্য, ভেদাত্মক পাইলেই তাহা ব্যবহারিক—অদ্বৈতবাদ স্থাপনে ইহা এক অশাস্ত্রীয় কৌশল মাত্র। মহাপ্রভুর মতে জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ ভেদাভেদ। যেখানে অভেদের দিকে দৃষ্টি করা হইয়াছে সেখানে অভেদাত্মক শ্রুতি, যেখানে ভেদের দিকে দৃষ্টি করা হইয়াছে দুই অভিন্ন সেখানে ভেদাত্মক শ্রুতি প্রযুক্ত হইয়াছে। সমুদ্রভরা জল আর এক ফোঁটা জল। যদি অভেদের দিকে দৃষ্টি করেন দুই অভিন্ন কারণ দুইই জল যদি ভেদের দিকে দৃষ্টি করেন দুই ভিন্নকারণ সমুদ্র বিরাট, এক ফোঁটা জল ক্ষুদ্র। জলাংশে অভেদ, পরিমাণ দৃষ্টিতে ভেদ। সুতরাং উভয়ের সম্বন্ধ ভেদাভেদ। এই ভেদাভেদ সম্বন্ধ বিচার বুদ্ধিগ্রাহ্য নহে বলিয়াই অচিন্ত্য।

"অচিন্ত্যাঃ খলু যা ভাবাঃ ন তাং স্তর্কেন যোজয়েৎ"। জীব ও ব্রহ্মের এই অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ গৌড়ীয় আচার্যেরা স্থাপন করিয়াছেন ব্রহ্মেতে শক্তি স্বীকার করিয়া। ব্রহ্মেতে শক্তি নাই, তিনি নিঃশক্তিক—আচার্য শঙ্করের এই মতবাদ গৌড়ীয় দৃষ্টিতে অশ্রদ্ধেয়। কারণ ব্রহ্ম যখন আছেন তখন তাহার সত্তা বজায় রাখার মত শক্তি তো নিশ্চয়ই আছে। যে বস্তুর নিজ সত্তা বজায় রাখার মত শক্তি নাই সে বস্তু তো অলীক—আকাশকুসুম তুল্য। বস্তুতঃ শ্রুতি ব্রহ্মেতে শক্তি স্পষ্ট ভাষাতেই স্বীকার করিয়াছেন—

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়া চ।

শ্রুতিবাক্য অনুসারে ব্রহ্মে তিনটি শক্তি আছে। এই তিনটি শক্তির কথা গীতাতেও পাই। গীতা বেদান্তেরই স্মৃতি প্রস্থান। তিনটি শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নাম আছে। চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি এই তিনই তার স্বরূপগত শক্তি, আগন্তুক নহে। চিৎশক্তি বলে তিনি আপনাতে আপনি আছেন। পূর্ণরূপে জীবশক্তি হইতে জীবাত্মার প্রকাশ। মায়াশক্তি দ্বারা এই বৈচিত্র্যময় জগৎ সৃষ্টি করেন।

জীবশক্তি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন একথা বলা হইয়াছে। মহাপ্রভু দৃষ্টান্ত দিয়াছেন অগ্নি ও তাহার স্ফুলিঙ্গ। বস্তু একই, অগ্নিত্ব হিসাবে অভিন্ন। আর বৃহত্ত্ব আর অণুত্ব দৃষ্টিতে ভিন্ন। জীবশক্তি সম্বন্ধে মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন, জীব—কৃষ্ণের তটস্থা শক্তির ভেদাভেদ প্রকাশ। তটস্থ অর্থ জল আর স্থলের মধ্যবর্তী। তটস্থ ব্যক্তি দুই দিকের যে কোন একটিতে যাইতে পারে।

ব্রহ্ম পরম স্বতন্ত্র। জীবের আছে অণু স্বাতন্ত্র্য। অণু স্বতন্ত্রতা আছে বলিয়াই তাহাকে তটস্থ বলা হইয়াছে। সে দুইদিকের যে কোন একদিকে যাইতে পারে। ঐ অণু স্বতন্ত্রতা বলেই সে নিজ শক্তিকে যথেষ্ট ভাবে খাটাইতে পারে। কৃষ্ণ মুখে চিৎশক্তির দিকে চলিয়া কৃষ্ণময় হইয়া পরানন্দ লাভ করিতে পারে অথবা কৃষ্ণ বিমুখ হইয়া কৃষ্ণকে ভুলিয়া মায়ার পথে ছুটিয়া দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত হইতে পারে। উভয় কোটিতে প্রবেশাধিকার আছে বলিয়াই তটস্থ শব্দ দেওয়া হইয়াছে। চিৎশক্তির দিকে গেলে আনন্দ, মায়া শক্তির দিকে গেলে অশেষ দুঃখ।

যে শক্তিবলে শ্রীকৃষ্ণ এই বিশ্বসংসার সৃজন পালন ও সংহার করেন তাহাকে বলে মায়া শক্তি। এই শক্তি কখনও শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইতে পারে না সর্বদা বাহিরে থাকে। ইহার অপর নাম বহিরঙ্গা শক্তি, গুণ মায়া ও জীব মায়া ভেদে মায়াশক্তির দ্বিবিধ ভেদ, গুণ মায়া হইল সত্ব, রজঃ, তমোগুণাত্মিকা। ইহা হইল বিশ্বসংসারের উপাদান। জীব মায়া কৃষ্ণবিমুখ জনকে সংসারের নশ্বর দুঃখ সুখ ভোগ করায়। মহাপ্রভুর ভাষায়—

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় নানা দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

স্বরূপভূত চিৎশক্তি বলে শ্রীকৃষ্ণ নিত্যলীলার আনন্দসমুদ্রে ডুবিয়া আছেন। এই শক্তির অপর নাম অন্তরঙ্গা শক্তি বা হলাদিনী শক্তি। ইহা দ্বারা অন্তরঙ্গলীলা বিস্তার করেন, এই লীলা নিত্য। এই শক্তির কথা পরে আবার বলিব। তটস্থা ও মায়া শক্তির সম্বন্ধ সম্পর্কে যে আর কিছু বক্তব্য আছে তাহা বলিব।

আচার্য শঙ্কর ব্রহ্ম নিঃশক্তিক বলিয়াছেন। গৌড়ীয় আচার্যগণ শক্তি স্বীকার করিয়াও ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব ও অখণ্ডত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। কারণ শক্তি পরব্রহ্মে স্বাভাবিক। কস্তুরী ও তার গন্ধ যেমন অবিচ্ছেদ্য ব্রহ্ম ও তার শক্তিও সেইরূপ। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।"

শঙ্করবাদীরা পূর্ব পক্ষ করেন যেহেতু মায়া শক্তি বিশ্বের উপাদান ও তাহা পরিণামশীল সেইহেতু ইহা ব্রহ্মের শক্তি হইতে পারে না। হইলে ব্রহ্ম পরিণামী হন। পরিণামী বস্তুর নিত্যত্বই থাকে না। ব্রহ্ম অনিত্যবস্তু হইয়া পড়ে। গৌড়ীয়াচার্যেরা বলেন কৃষ্ণের মায়া-শক্তির পরিণাম জগৎ হইলেও ব্রহ্মপরিণামী হন না। জগৎ সৃষ্টি করিয়াও ব্রহ্মভাব শক্তি অপরিণামীই থাকে। মহাপ্রভু বলেন—

"মনি যৈছে অবিকৃতে প্রসবে হেমভার" একপ্রকার মণি আছে তাহার স্পর্শে অন্যান্য ধাতু সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তাহাতে মণির কোন পরিবর্তন বা পরিণাম হয় না। তদ্রূপ তাহার মায়া শক্তি জগদ্রূপে পরিণত হইলেও ব্রহ্ম অপরিণামী থাকেন।

পাছে ব্রহ্ম পরিণামী হন এই ভয়ে আচার্য শঙ্কর পরিণামবাদ মানেন নাই। তিনি মানিয়াছেন বিবর্তবাদ। রজ্জুতে সর্পভ্রম বিবর্তবাদের দৃষ্টান্ত। রজ্জুর যে সর্প সৃষ্টি তাহা পরিণাম নহে, বিবর্ত। জগৎ যে ব্রহ্মের সৃষ্টি তাহাও পরিণাম নহে বিবর্ত। এই বিবর্তবাদ মায়াবাদেরই ফল। গৌড়ীয় আচার্যেরা মায়াবাদ খণ্ডন করিয়াছেন তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। মায়াবাদ খণ্ডনেই বিবর্তবাদ খণ্ডিত হয়। বৈষ্ণবাচার্যগণ বিবর্তবাদ খণ্ডন করিয়া পরিণামবাদ স্থাপন করিয়াছেন। এখন দেখান হইল যে পরিণামবাদ স্বীকারে ব্রহ্ম পরিণামী হন না। ব্রহ্মসূত্রে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' হইতে আরম্ভ করিয়া অগণিতসূত্রে পরিণামবাদ গৃহীত হইয়াছে। শক্তি স্বীকারে ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব হানি হয় না একথা পূর্বে বলিয়াছি। কারণ

শক্তি ও শক্তিমান একই বস্তু। কারণ এক হইতে অপরকে ভিন্ন করা যায় না। দাহিকা শক্তি হইতে অগ্নিকে কোনও প্রকারে পৃথক করা যায় না। শক্তি ও শক্তিমান একবস্তু বলিয়াই ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব হানি হয় না, শক্তি স্বীকার না করিলেই হানি হয়। শক্তিহীন ব্রহ্ম শূন্যে পরিণত হয়। শঙ্করের নিঃশক্তিক ব্রহ্মবাদ বৌদ্ধদের শূন্যবাদের কাছাকাছি। এই জন্য শঙ্করকে কেহ কেহ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া থাকেন।

পুনরায় এইরূপ পূর্বপক্ষ হইতে পারে—শক্তি ও শক্তিমান যদি এক ও অভিন্ন হয় তাহা হইলে পৃথকভাবে শক্তি স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা কি? এই জিজ্ঞাসায় বৈষ্ণবাচার্যগণের উত্তর এই যে—শক্তি শক্তিমান এক হইলেও কিছু পৃথকত্ব আছে। যেখানে অগ্নি নাই সেখানে তাহার তাপ থাকিতে পারে যেমন অগ্নিতে উত্তপ্ত লৌহখণ্ডে অগ্নি নাই কিন্তু তাপ আছে। যেখানে প্রদীপ নাই সেখানে তার প্রভা থাকিতে পারে। বস্ত্রমধ্যে কস্তুরী না থাকিলেও তাহার গন্ধ থাকিতে পারে। আসল কথা যেহেতু অগ্নি ছাড়া তাপকে ভাবিতে পারা যায় না। তাপ ছাড়া অগ্নিকে ভাবা যায় না, সেই হেতু শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ ভেদাভেদ। শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়াছেন শক্তিকে শক্তিমান হইতে অভিন্ন ভাবে ভাবা যায় না বলিয়া 'ভেদ' আছে ভাবিতে হইবে আবার ভিন্ন ভাবে ভাবা যায় না বলিয়া 'অভেদ' ভাবিতে হইবে। এই জন্য শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যুগপৎ ভেদাভেদ সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। ভেদাভেদের যৌগপদ্য বিচার যুক্তিদ্বারা স্থাপনীয় নহে। সুতরাং ইহা অচিন্ত্য।

তস্মাৎ স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিন্তায়িতুমশক্যত্বাদ ভেদঃ ভিন্নত্বেন চিন্তায়িতুমশক্যত্বা-দভেদশ্চ প্রতীয়ত ইতি শক্তি শক্তিমতো ভেদাভেদৌ এব স্বীকৃতৌ। তৌ অচিন্ত্যৌ ইতি। ভেদ ও অভেদের একত্র অবস্থিতি-ইহাদের সত্যত্ব ও নিত্যত্ব মানববুদ্ধি দ্বারা অবোধ্য। অপ্রাকৃত বিষয়ে শাস্ত্র বাক্যই একমাত্র গ্রাহ্য। এই জন্যই স্বীকার করিতে হইবে। যে জ্ঞান তর্ক যুক্তি দ্বারা স্থাপিত হইতে পারে না অথচ প্রত্যক্ষ বলিয়াও স্বীকার করা যায় না তাহাই অচিন্ত্য।

অচিন্ত্য খলু যা ভাবাঃ ন তাং স্তর্কেন যোজয়েৎ
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তদাচিন্ত্যস্য লক্ষণম্।

যাহা অচিন্ত্য তাহা লইয়া তর্ক বিচার করিবে না। বেদান্তে একটি সূত্র আছে—

শ্রুতেস্তু শব্দ মূলত্বাৎ।

সূত্রের অর্থ এই যে ব্রহ্ম শব্দমূলক, অর্থাৎ শব্দ দ্বারাই প্রমাণ যোগ্য। ইন্দ্রিয়াদির প্রত্যক্ষ প্রমাণযোগ্য নহে, যুক্তি বিচার দ্বারাও স্থাপনীয় নহে। এই সূত্রের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন—

যদা লৌকিকানাং প্রত্যক্ষদৃষ্টানামপি শক্তিরচিন্ত্যা তদা শব্দৈকসমধিগম্যস্য ব্রহ্মণঃ কিমু বক্তব্যম্।

কোন কোন মণি ও মন্ত্রের শক্তি প্রত্যক্ষ দেখা যায় কিন্তু যুক্তিবিচার দ্বারা স্থাপন করা যায় না। লৌকিক বস্তুরই যখন এরূপ অচিন্ত্যশক্তি দেখা যায় তখন একমাত্র শব্দ মূলক ব্রহ্মের যে অচিন্ত্যশক্তি থাকিবে এসম্বন্ধে আর বলিবার কি আছে?

বাস্তবিক প্রাকৃত বস্তুনিবহের যে শক্তি তাহাও অনেকসময় চিন্তার অতীত। চিনি কেন মিষ্টি, কেন নিম তিক্ত ইহাও অচিন্ত্য। অম্লজান ও উদকজান বিশেষ কোন অনুপাতে মিলাইলেই কেন জল হয় তাহাও অচিন্ত্য। যে কোন বস্তুর শক্তিই যখন অচিন্ত্য তখন

একমাত্র শব্দ প্রমাণগম্য. ব্রহ্মবস্তু অচিন্ত্য হইবে এবিষয় আর বলিবার কি থাকিতে পারে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মের স্বরূপ কীর্তনে বলিয়াছেন।

সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ, এই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিজস্ব মত। শ্রীজীব বলিয়াছেন "স্বমতেতু অচিন্ত্যভেদাভেদৌ এবং অচিন্ত্যশক্তিময়ত্বদিতি।" "স্বমতে" অর্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে।

এই অচিন্ত্যভদাভেদবাদ অত্যন্ত ব্যাপক। প্রাকৃত রাজ্যে, অপ্রাকৃত রাজ্যে সর্বত্র ইহার ব্যাপ্তি। জীবশক্তি ও মায়াশক্তির মধ্যে ইহার তাৎপর্য দেখান হইল। স্বরূপভূত অন্তরঙ্গ শক্তির লীলা রাজ্যেও যে ইহার অচিন্ত্য কার্যকারিতা তাহা ক্রমশঃ দেখান যাইতেছে।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সর্বশ্রেষ্ঠ-দান হইল শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব। ইহাই জগজ্জীবের সন্নিধানে শ্রীগৌরসুন্দরের অভিনব সন্দেশ। উপনিষদের অদ্বয়তত্ত্ব বলিতে শ্রীমন মহাপ্রভু বুঝেন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। যাঁহার ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা তিনি স্বয়ং ভগবান। শ্রীকৃষ্ণ চিদশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তির আশ্রয়। এই শক্তি কৃষ্ণের স্বাভাবিক ও তাহা হইতে অবিচ্ছেদ্য। সুতরাং শক্তিস্বীকারে অদ্বয়ত্বের হানি নাই।

শঙ্কর মতে নির্বিশেষ ব্রহ্মই পরতত্ত্ব। মহাপ্রভুর মতে এই ব্রহ্ম হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ জ্যোতি, তনুভা। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণর অসম্যক প্রকাশ। জ্যোতিঃ হইল জ্যোতি বিশিষ্ট বস্তুর অসম্যক বা আংশিক প্রকাশ। ব্রহ্ম জ্যোতিঃ দর্শন শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের প্রথম সোপান। শ্রীকৃষ্ণ নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। ঘনীভূত ব্রহ্মের পরমাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ। গীতাও বলিয়াছেন—

ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাচমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥

অতএব শঙ্করের নির্বিশেষ ব্রহ্ম মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণের অস্ফুট স্বরূপ তনুভা।

শঙ্করমতে "তত্ত্বমসি" শ্রুতির মহাবাক্য। গৌড়ীয়াচার্যগণ তাহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বলেন প্রণবই মহাবাক্য। শ্রীরূপ বলিয়াছেন "শ্রীবৈষ্ণবাচার্যাণাং প্রণব এব মহাবাক্যম্" প্রণব বেদের নিদান। সমগ্র বেদ সূক্ষ্মরূপে প্রণবই অন্তর্লীন। তত্ত্বমসি বেদের একদেশমাত্র।

জগৎ শ্রীকৃষ্ণের মায়া শক্তির পরিণাম, বিবর্ত নহে। বিবর্তের স্থান একস্থানে আছে বটে। জীব যখন অনাত্মাকে আত্মা মনে করে তখন সেখানে মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ বিবর্ত সৃষ্টি করে।

শঙ্করাচার্য সগুণ সবিশেষ ঈশ্বরও স্বীকার করেন। জীব তাঁর অংশ একথাও বলেন। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা একথাও বলেন তবে এই ঈশ্বরের সত্তা ব্যবহারিক, পারমার্থিক নহে। গৌড়ীয় আচার্যগণ ব্যবহারিক পারমার্থিক সত্যের এই দ্বৈবিধ্য স্বীকার করেন না। ব্যবহারিক সত্য সত্যই নহে। অনিত্য বলিলেও চলে।

শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা ও তটস্থা শক্তির কথা বলা হইয়াছে। এখন অন্তরঙ্গ শক্তির কথা বলিতেছি।

স্বরূপ শক্তির তিনটি বৈচিত্র্য। সৎ, চিৎ ও আনন্দ। যে শক্তি বলে ব্রহ্ম আছেন ও জীবজগৎ আছে তাহা সৎশক্তি বা সন্ধিনী শক্তি। যে শক্তিদ্বারা তিনি নিজেকে জানেন ও

নিখিল জীবজগৎকে জানেন তাহা চিৎশক্তি বা সংবিৎ শক্তি। যে শক্তি বলে তিনি সর্বদা পরমানন্দে থাকেন ও জীবজগৎকে পরমানন্দ দান করেন তাহা আনন্দশক্তি বা হ্লাদিনী শক্তি। সৎ শক্তির বিলাসে শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম। চিৎ শক্তির বিলাসে শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা। আনন্দ শক্তি বা হলাদিনী শক্তির বিলাসে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন গোপীজন-বল্লভ ব্রজবিহারী, রাধারসমাধুরীর আস্বাদক।

শ্রুতি পরব্রহ্মের স্বরূপ বিচারে তাহাকে অন্নময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় বলিয়াছেন। আনন্দময় ভূমিতেই ব্রহ্মের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। আনন্দের মূল কোথায় তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন। রসহ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। রসের আস্বাদনেই রস মূর্তি ধারণ করেন। আনন্দঘন রসস্বরূপ পরব্রহ্মই শ্রীকৃষ্ণ। তিনি রসস্বরূপ রসিক - রসিক-শেখর। নিজেকে নিজে পরিপূর্ণভাবে আস্বাদন করিয়া তিনি রসিকশেখর।

রসের বিলাস হইল শ্রীকৃষ্ণের আত্মাস্বাদন। ইহা একাকী হয় না। একাকী নৈব রমতে, আত্মানাং দ্বেধা অপাতয়েৎ। তত্ত্ব শাস্ত্রের দাবী পরম বস্তু একমেবা দ্বিতীয়ম্ তিনি অদ্বিতীয় একই। রস শাস্ত্রের দাবী তিনি একাকী রমন করেন না, নিজেকে দুই করিলেন। রসের আস্বাদক দুই-ই রহিবেন। এক হইলে চলিবেনা। আস্বাদন হইবে না। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলেন—একাত্মানাবপি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ একই ছিলেন, রসাস্বাদনের জন্য দুই হইলেন। বস্তুতঃ চিরকালই দুই ছিলেন। যখন ব্রজে ব্যক্ত হইলেন তখন আমরা জানিলাম। রাধাকৃষ্ণ রূপে বিলাসী ব্রহ্মের পরস্পর রসাস্বাদন। এই আস্বাদন-লীলায় তিনি অনন্তকাল নিমজ্জিত।

লীলা নিত্য। সূর্য যেমন স্থির, তাহার উদয় অস্ত সত্য নহে। এসব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ। আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ। লীলা নিত্য শাশ্বত। ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড হইতে ভিন্ন ভিন্ন সময় তাহার দর্শন হয়। বৈবস্বতীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় দ্বাপরের শেষভাগে এই লীলা প্রপঞ্চে ব্যক্ত হইয়াছিল। এখনও লীলা জগৎ চলিতেছে। অন্য ব্রহ্মাণ্ডে দৃষ্ট হইতেছে।

নিত্যলীলার ধাম পরিকর-সবই তিনি। শ্রীবৃন্দাবনধাম, নন্দ যশোদা সকলই সন্ধিনী-শক্তির বিলাস। যাহাদের সঙ্গে বৎসল্য ও সখ্য রসের আস্বাদন করিয়াছেন তাহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের শক্তির বিলাস। এই জন্য এত বৈচিত্র্যময় হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ স্বগতভেদশূন্য।

শ্রীরাধা ও সখীগণ সকলেই হলাদিনী শক্তির বিলাস। শ্রীরাধা যেন আনন্দরসের একটি লতা, সখীগণ তাহার পল্লব পুষ্প পাতা। শ্রীরাধাও সখীসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দরসের আস্বাদন। ইহা রসিকশেখরের রসের বৈচিত্র্যময় বিলাস।

লীলা স্থির নহে সর্বদাই গতিমান। এই গতি সিদ্ধ হয় মিলন ও বিরহ এই দুইটি তটের দ্বারা। শ্রীরাধাকৃষ্ণ কখনও পরম মিলনে মিলিত, আবার কখনও তীব্র বিরহব্যথায় ব্যথিত। বিরহ মিলনকে পুষ্ট করে, মিলন বিরহকে পুষ্ট করে। অপ্রাপ্তির প্রাপ্তি আবার প্রাপ্তির অপ্রাপ্তি। কখনও অন্তরে পাওয়া বাহিরে হারান, কখনও বাহিরে পাওয়া অন্তরে হারান। ইহ দ্বারা লীলারসপ্রবাহ সতত নবায়মান। অতিবেগবতী স্রোতস্বিনীর মত। সর্বদাই নিত্যনূতনতরভাবে আস্বাদ্যমান।

বিরহ চারিপ্রকার পূর্বরাগ, প্রেমবৈচিত্য, মান ও মাথুর। মিলনও চারি-প্রকার সংক্ষিপ্ত, সম্পন্ন, সম্পূর্ণ ও সমৃদ্ধমান। এই সমৃদ্ধমান রসেই সর্বাধিক আস্বাদন।

এই আস্বাদনে দুই আবার এক হইয়া যান। এই একবস্তু হইলেন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর। তাহাতে আছে তত্ত্বের একত্ব; রসের দ্বৈত। এই একত্ব ও দ্বৈতের মিলন ঘটিয়াছে অচিন্ত্য ভেদাভেদের রহস্য হেতু। শ্রীগৌরসুন্দরের রসাস্বাদনের মধ্যে অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ জীবন্ত।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গরূপে প্রকটিত হইবার গভীর রহস্য গৌড়ীয় আচার্যপাদগণ অননুকরণীয় ভাষায় ব্যক্ত করিয়া জীবজগৎকে রসের নির্যাস উপহার দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত শ্রীগ্রন্থের আদিলীলায় চতুর্থ পরিচ্ছেদে শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের অন্তরঙ্গ হেতু আস্বাদিত হইয়াছে। এক পরম বস্তু রসাস্বাদনের জন্য দুই হইলেন, ইহাদের পারিভাষিক নাম আশ্রয় ও বিষয়। শ্রীরাধা আনন্দরসের আশ্রয়, শ্রীকৃষ্ণ বিষয়। আশ্রয় ও বিষয়ের আস্বাদিত আনন্দ ঠিক একরূপ নহে। শিশুকে কোলে লইয়া মায়ের যে সুখ, আর মায়ের কোলে উঠিয়া শিশুর যে সুখ তাহা একই প্রকারের নহে। গভীরতারও তারতম্য আছে। শ্রীকৃষ্ণাস্বাদনে শ্রীরাধার সুখ এত অধিক ও অতলস্পর্শী যে শ্রীকৃষ্ণ তাহার গভীরতা ও ব্যাপকতার পরিসীমা করিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ ভাবনা করেন আমাকে আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধার যে সুখ তাহা আমাকে আস্বাদন করিতে হইবে। শ্রীরাধার মাধুর্য কত বৈচিত্র্যময়, শ্রীরাধা কর্তৃক আস্বাদিত আমার মাধুর্য কত মধুরিমাযুক্ত তাহা আমি কৃষ্ণ কিছুই জানিতে পারি না।

শ্রীকৃষ্ণের অন্তরের একটি রসাস্বাদনের বাঞ্ছা তিনটি রূপ ধারণ করিল। আশ্রয়নিষ্ঠ বিষয়নিষ্ঠ ও রসনিষ্ঠ। আশ্রয়নিষ্ঠ হইল শ্রীরাধার কি মাধুর্য, বিষয়নিষ্ঠ হইল রাধা কর্তৃক আস্বাদিত আমার কি মাধুর্য, আর রসনিষ্ঠ হইল আস্বাদনে যে শ্রীরাধার সুখ্যাতিশয্য তাহার স্বরূপ কি? গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ ইহাকে শ্রীকৃষ্ণের তিনবাঞ্ছা বলেন।

পূর্ণ পূর্ণতম যিনি তাহার আবার অপূর্ণ বাঞ্ছা ইহা রসের রাজ্যের এক অপরূপ কথা। আশ্রয় বিষয়রূপে দুই হইলেন বলিয়াই এই বাঞ্ছার উদ্ভব। শ্রীরাধাকৃষ্ণের একত্বও নিত্য, দ্বৈতও নিত্য, বাঞ্ছাও নিত্য। বাঞ্ছার পরিপূর্তি শ্রীগৌরসুন্দরের মূর্তি তাহাও নিত্য। শ্রীরাধার অন্তরে শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিলেন বাঞ্ছা পূর্তির জন্য। প্রবেশ করিয়া দুই এক হইলেন। এক হইলেন বটে কিন্তু একের মধ্যে দুইয়ের বৈচিত্র্য বিদ্যমান রহিল। কখনও কৃষ্ণভাবে রাধাহারা হইয়া কান্দিতেছেন কখন রাধাভাবে কৃষ্ণহারা হইয়া অশ্রুজলে প্লাবিত হইতেছেন। ইহা এক বৈচিত্র্যময় অভূতপূর্ব স্বরূপ।

শ্রীগৌরসুন্দর অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের মূর্তিমান বিগ্রহ। এই ভেদ ও অভেদের একত্ব যুক্তিদ্বারা স্থাপনীয় নহে। ইহা শুধু অচিন্ত্য বা চিন্তারাজ্যের অতীত নহে—ইহা রসভূমিকায় অনুভবনীয়। দীর্ঘ বিরহের পর পরম প্রিয়তমের সঙ্গে গাঢ়তম মিলনে এই অনুভূতির আভাস পাওয়া যায়। দুই আশ্রয় বিষয় তখন এক হইয়া যায়। আবার আস্বাদনের জন্য দুইই থাকে। এই কথাই শ্রীরামানন্দের মুখ দিয়া গৌরসুন্দর বাহির করাইয়াছেন—

ন সো রমণ ন হাম রমণী।
দুহু মন মনোভব পেশল জানি॥

মনোভব অর্থ সুনিবিড় সুগভীর প্রেম। সেই প্রেম দুইজনকে পিষিয়া এক বানাইয়া দিয়াছে। দিয়া আবার একের মধ্যে দুইয়ের রসবিচিত্রতার বিদ্যমানতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ—এইসব দার্শনিক মতবাদ মাত্র। একজনের বিচারের ফল অপর জন কর্তৃক খণ্ডিত হইতে পারে। অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ কিন্তু একটি দার্শনিক মতবাদমাত্র নহে। ইহা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরে চির জীবন্তরূপে প্রকটিত। মতবাদাতিত

মূর্তিমন্ত বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর মানব জাতির ইতিহাসে ইহা একটি অভিনব বার্তা। শ্রীমন্-মহাপ্রভু কোন গ্রন্থাদি লিখেন নাই। তাঁহার দর্শনতত্ত্ব তাঁহার লীলাময় সত্তার মধ্যে মূর্তিমন্ত হইয়া বিরাজমান আছে।

এই অচিন্ত্যভেদাভেদ রসরহস্যের মধ্যে জীবতত্ত্বের স্থান কোথায় তাহা পুনরায় বিবেচ্য। তটস্থাশক্তি জীব, শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করিতেছে। সাধুকৃপায়, শাস্ত্রকৃপায়, গুরুকৃপায় তাহার স্বকীয় স্বরূপ কৃষ্ণদাস্যের কথা মনে পড়িলেই দুঃখ চলিয়া যায়। জীব তখন সাধনপথে অগ্রসর হইতে হইতে অন্তরঙ্গা লীলা শক্তির কাছাকাছি পৌঁছিতে পারে। তখন প্রবল আর্তি জাগিলে রাধার সখীগণ তাহাকে আরও নিকটতম স্থানে লইয়া যাইতে পারেন।

শ্রীরাধার কৃপায় লীলরসমাধুর্য আস্বাদন করেন তাহার সখীগণ সর্বাধিক। সখীগণ হলাদিনী শক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গতুল্য। জীব যখন লীলারস আস্বাদনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয় তখন সখীগণ কৃপা করিয়া তাহার অন্তরে হলাদিনী শক্তির করুণা কণা সঞ্চার করাইয়া দেন। তখন জীব তাহার একটি গভীরতম স্বরূপ শ্রীরাধাদাস্য অনুভব করে। ঠিক রাধা-দাস্য নহে শ্রীরাধার দাসীর দাস্য অনুভব করে জীব নিজ সত্তার মধ্যে। এই দাস্যে স্থিত হইয়া জীব সর্বতোভাবে শ্রীরাধার সুখ বিধান করিতে পারে। শ্রীরাধার সুখ অর্থ শ্রীকৃষ্ণের সুখ। শ্রীকৃষ্ণসুখ ছাড়া শ্রীরাধার অন্তরে আর কোন সুখ কামনা নাই। তাই একটিমাত্র আরাধনা—

শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছাপূর্তি রূপ করে আরাধনে। সখীর আনুগত্যে শ্রীরাধাগোবিন্দের নিকুঞ্জ সেবা ইহা মহাপ্রভুর পার্ষদগণের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। ব্রজযুগল দর্শন আস্বাদন করিতে করিতে তাহারা মিলিত তনু শ্রীগৌরবর-সমাধুর্য সাগরে ডুবিয়া যান। ডুবিয়া গিয়া গৌর পার্ষদত্ব লাভ করে। একই কালে রাধাদাস্যও গৌর পার্ষদত্ব ভোগ করেন—ইহাও এক অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বের বিলাস। ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হইলেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং। নিতাই অনঙ্গ মঞ্জরীরূপে ব্রজ কুঞ্জ সেবারত আবার একইকালে—

নিতাই জপয় নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
স্বপ্নেও নিতাইর মুখে নাহি আর অন্য॥

শ্রীনিত্যানন্দের আনুগত্যে ব্রজ সেবা, ব্রজ রসের বিগ্রহ শ্রীগৌর সেবা ইহাই তটস্থ জীবশক্তির পরম ধন্য পরম প্রেয়ঃ চরম শ্রেয়ঃ। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী সাধকগণের ইহাই নিগূঢ় আস্বাদন।*

---

* ১৩৯০ বঙ্গাব্দে প্রদত্ত রাধাগোবিন্দনাথ স্মারক বক্তৃতা।

রামকিশোর শিরোমণির 'কালিকাসঙ্গীতামৃত'

শ্রীসুমঙ্গল রাণা

মধ্যযুগে রচিত কাব্য সাহিত্য যা পণ্ডিত সমাজে এ পর্যন্ত গোচরীভূত হয়েছে তার প্রায় সবই পুথির আধারে ; লিপিকরের নকল। কবি স্বয়ং রচনা করেছেন নিজের হাতে লিখে এমন পুথি সহসা মেলে না। দৈবাৎ পাওয়া গেলেও নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করা দুষ্কর হয়ে পড়ে উপযুক্ত তথ্যের অভাবে। কিন্তু সম্প্রতি এই রকম একটি পুথির সন্ধান পাওয়া গেছে যা লিপিকরের নকল নয় কবির নিজের হাতে প্রথম লেখা Autographic Text। কবির নাম শ্রীরামকিশোর শিরোমণি ; কাব্যের নাম 'কালিকাসঙ্গীতামৃত।'

সাহিত্যের ইতিহাসে রামকিশোরের যে পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে প্রসঙ্গত তা উদ্ধৃত করছি—

অষ্টাদশ শতাব্দের শেষ পাদে দক্ষিণ রাঢ়ের এক সাধক পণ্ডিত অনেকগুলি ছোটখাট নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। এ গুলিতে তান্ত্রিক শাক্তমতের সঙ্গে শৈব ও বৈষ্ণবমতের সমাবেশ দেখা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দে বাঙ্গালাদেশে যে এইরূপ ধর্মমতের খিচুড়ি পাকানো হইয়াছিল তাহার বিশিষ্ট প্রমান "সাধকেন্দ্র" রামকিশোর শিরোমণির রচনায়। ইহার নিবাস বর্ধমান জেলায় সমরশাহী পরগণার অন্তর্গত বুইনান (আধুনিক বৈনান) গ্রামে। ইহার সংস্কৃত রচনা হইতেছে 'সারাবলী সমুচ্চয়' এবং বাংলা নিবন্ধ 'হরিনামতত্ত্ব তরঙ্গিনী', 'কৃষ্ণতত্ত্ব তরঙ্গিনী', 'পাষণ্ড দমন', 'যোগতত্ত্ব তরঙ্গিনী' ইত্যাদি। শেষ নিবন্ধের রচনাকাল ১৬৯৫ শকাব্দ (১৭৭৩-৭৪)। রামকিশোরের নকল করা ভবদেব ভট্টের 'শালাকর্মের' পুথি পাওয়া গিয়াছে। ইহার লিপিকাল ১১৭৯ সাল (১৭৭২-৭৩)।[১]

'কালিকাসঙ্গীতামৃত' রামকিশোরের নবতম রচনা, তাঁর সাহিত্যকর্মের তালিকায় নূতন সংযোজন। বিশ্বভারতী সংগ্রহে কালিকাসঙ্গীতামৃতের একাধিক পুথি আছে।[২] আমাদের আলোচ্য পুথিটি খণ্ডিত ; পত্রসংখ্যা ৩-১০, ১২ ; আধার হস্তনির্মিত তুলট। রচনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইল—

[৫খ হরিনাম জ্ঞানযোগ আর জত উপভোগ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চয়।
অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি আয়ু, জস বলবুদ্ধি পায় পদ করিলে আশ্রয়॥
আপনে শিয়রে বসি সপনে কহিলে নিসি ভয় হল্য মুনিঞা ভাবিত।
দিলে আজ্ঞা গুরুভার অমৃত গানের সার রচ কাব্য নতুন সঙ্গীত॥
শিরোধার্য সেই বাক্য ধ্যান করি পদযোক্ষ্য সাহসেতে করিনু প্রবেস।
বুদ্ধিরূপা ভগবতি হৃৎপদ্মে কর্য্যা স্থিতি চিন্তা দেবি কর সবিশেষ॥
শ্রীকিশোর তব দাস মনে সদা করে আস স্থান চায় চরণ যুগলে।
কহি পুন স্তুতি মতে রক্ষ ভবানন্দ সুতে কালীদাস কনিষ্ঠ কমলে॥

উদ্ধৃত অংশ থেকে দেবতার স্বপ্নাদেশে কবির কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার সংবাদ মেলে, কবির ব্যক্তি পরিচয়ের ছিটে-ফোটা খবরও পাওয়া যায়। কবির পিতার নাম ভবানন্দ কালিদাস এবং কমল কবির ঘনিষ্ঠ পরিজন।

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড অপরার্ধ পৃ. ৫৯১
২। বিশ্বভারতী-পুথি-সংগ্রহ—১৯১১, ৬৫৭৮

কালিকাসঙ্গীতের প্রাপ্ত পুথিটি খণ্ডিত। রচনা বিভিন্ন দেব দেবীর বন্দনা বিষয়ক। কালীর বন্দনা দিয়েই গ্রন্থের সূচনা। 'অপিচ শ্রীমতি কালীর বন্দনা' শিরোনামায় বেশ বিস্তারিত করে কালীর বন্দনা বর্ণিত হয়েছে পয়ার ছন্দোবন্ধে। তারপর 'মহাকালের বন্দনা' ত্রিপদি। অতঃপর যথাক্রমে গঙ্গার বন্দনা ত্রিপদি ছন্দ। চৈতন্য-বন্দনা পয়ার। বিপ্রবন্দনা পয়ার। এবং সবশেষে দিগবন্দনা। এরপর মূল কাব্যাংশের আরম্ভ হয়েছে—'আরম্ভ কালিকাসঙ্গীতামৃত। তত্রাদৌ সৃষ্টি-পত্তনং।' ইত্যাদি।

পুথিতে দিগবন্দনা অংশটি বেশ বিস্তৃত এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বন্দনায় যে সকল দেবদেবীর নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে তাঁরা যথাক্রমে—গণপতি, গুরু, পঞ্চপ্রকৃতি (গণেশজননী দুর্গা বাণী লক্ষ্মী রাধা! সাবিত্রি সহিত এই প্রকৃতি পঞ্চধা॥), গৌরী আদি ষোড়শ মাতৃকা, ব্রহ্মানি সহ অষ্টধা নায়িকা, মহাবিদ্যাগণ, কালী, নীলসরস্বতী, দুর্গা, ছিন্নমস্তা, ভুবনেশ্বরী, ষোড়শী, ভৈরবী, মহাবীরা, প্রত্যঙ্গিরা, বৈরিবিঘাতিনী বামা, কামাখ্যা, বাসলি, মাতঙ্গী, বগলা, ত্রিকূটা, ধূমামর্দ্দিনী, কমলা, ব্রহ্মালোকে ব্রহ্মানী, বৈকুণ্ঠে সর্বমঙ্গলা, অমরাবতির পুলোমজা, বরুণ আলয়ে অম্বিকা অষ্টভুজা, যমলোকে কালরূপা, 'শুভাচণ্ডী বন্দিব কুবেরে জার কৃপা', অগ্নিলোকে মহানন্দা, কুরঙ্গ-বাহিনী তথা মারুত ভবনে, নৈঋতে রক্তদন্তিকাচরণ, ত্রিশূল ধারিনী বন্দ ইশানে আসন', বৈষ্ণবীরূপা সপ্তম পাতালে, সিংহল সহরের দেবতা মোহিনী, মনদ্বিপের দেবি সুরসা, লঙ্কাপুরের উগ্রকালী মুক্তকেশা, সেতুবন্দে রামের ইশ্বরী, পুরুষউত্তম ধামে বিমলাসুন্দরী, উড়িস দেশের বিরোজা, নীলাদ্রপর্বতে কামিনী, বঙ্গদেশ অধিষ্ঠাত্রী কালী, অযোধ্যায় মহেশ্বরী, বারানসে অন্নপূর্ণা, গয়ার গয়েশ্বরী, কুরুক্ষেত্রের ভদ্রকালী, ব্রজে কাত্যায়নী, দ্বারিকায় মহামায়া, মথুরা পাটের মহেশ্বরি, বিন্ধ্যাচলের হিঙ্গুলাজ, কালিঘাটের কালী, ক্ষীর গ্রামের জ্ঞানবাদিনী যুগাদ্যা, রামের স্থাপিত মহিরাবণ-নাসিনী, কিরীটকোনার কিরীটইশ্বরি, ঢাকায় ঢাকেশ্বরী, তমলোকের বর্গভীমা, ঘাটশিলার বাসুলী, সেয়াখালা গ্রামের উত্তর বাহিনী, বিক্রমপুর মৌলার রড়িকনী, তড়িয়ার জয়চণ্ডী', বর্ধমানে মঙ্গলার চরণ, রাজবলহাটে শ্রীরাজবল্লবি, লাউগ্রামে দণ্ডেশ্বরী, রাড়েশ্বরী, (বালিডাঙ্গা গ্রামেতে বন্দিব রাড়েশ্বরি। আমার প্রপিতামহ জাঁর আজ্ঞাকারি॥), পাড়ামায় পার্বতি কামারবুড়ি, কাইতির কালী, নেয়্যাড়ের নেয়্যাড়ি, আমতার মেলাইচণ্ডী, গোতানে বিশালা, সার্টিনন্দের লক্ষ্মী, নাড়িচার মঙ্গলা, পাঁচড়ার বাসুলি, গোগ্রামে ভগবতি, নিজগ্রামের (বুইনান) সিংহবাহিনী, কামিন্যা সহিত ধর্মদেবতা, দক্ষিনেশ্বরের শীতলা, আলয়ে আদ্যা বরদা দক্ষিণা, সিজুয়া শিখর, চাঁপাই নগর, হাসনহাটি, সালমুলাপুরি, নারিকেল ডাঙ্গায় বিসহরি, পদ্মিনী বিজয় জয়া যোগিনীর যূথ, সসাগরা ধরা জারা পঞ্চভূত, সুর তরঙ্গিনী সহ তীর্থবারা, মহাধাম কৈলাস, গোলক, হরিদ্বার কাশিপুর, পৈরাগ, সিন্ধুতটে জগন্নাথ, গয়াক্ষেত্রে গদাধর, হরিহর, বিরিঞ্চি, দশ অবতার, একাদশ রুদ্র, ইন্দ্র, আদিত্যাদি নবগ্রহ, বারানসে শিবলিঙ্গ, সেতুবন্দে রামেশ্বর, ব্রজে গোপেশ্বর, কাম্যলিঙ্গ, বৈদ্যনাথ, শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, সীতা, হনুমান, গোকুলে গোবিন্দ, বোড়োর বলাই, নারদ, বাল্মীকি, ব্যাস, শুক, মনু, ব্রহ্মচারি গিরি পুরি ভারথি সন্ন্যাসি, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর কলিযুগ, কূর্মানন্ত, উপান্ত, অনন্ত কৃটি নাগ, চারিবেদ, পুরাণ কাব্য, আগম, নিগম তন্ত্র, ষড়ধাতু, মাস, পক্ষ, যোগ, তিথি, ত্রিসন্ধ্যা, নক্ষত্র, চন্দ্র, দিবারাতি।

অবশেষে জনক, জননী, পঞ্চপিতা, সপ্তমাতা, তালপুরের শিশুরক্ষাকারী ষষ্ঠি, মেরুদণ্ডে ব্রহ্ম অণ্ডে যত দেবতা অবস্থান করেন। বন্দনা করতে বিস্মৃত হয়েছেন এমন দেবতাদের প্রতি প্রনতি জানিয়ে কবি বন্দনা-অংশ সমাপ্ত করেছেন।

কাব্যের সূচনায় দেবদেবীর দীর্ঘ নাম-তালিকা থেকে অনুমান করা যায় কাব্যটিও বিপুলায়তন ছিল কিন্তু আপাতত পুথির কয়েকটি পাতাই আমাদের সম্বল। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, পুথিটি কবির নিজের হাতের লেখা বলে আমাদের বিশ্বাস। এখন আমাদের বিশ্বাসটুকু তথ্য প্রমাণে বলবৎ করতে চাই।

প্রথম প্রমাণ, আলোচ্য পুথির লিপি খুব সুন্দর, সুরক্ষিত (Protected) যত্ন করে লেখা। এতটা যত্ন পেশাদার লিপিকরের কাছে কখনই প্রত্যাশিত নয়। নিজের সৃষ্টির প্রতি মমতাবশত কবি সযত্নে অক্ষরের পর অক্ষর সজ্জিত করেছেন। পুথির মধ্যে Haphazard Transmission বা অরক্ষিত প্রতিলিপির বিন্দুমাত্র চিহ্ন কোথাও নেই।

হাতের লেখা ভালো হলে লেখার হাত ভালো হয় না—কথাটা একালে খাটে কারণ লেখক জানেন তাঁর হস্তাক্ষর পাঠকের কাছ অবধি পৌঁছোবে না;পৌঁছোবে ছাপার অক্ষরে। তাই সঙ্গত কারণে হাতের লেখার প্রতি যত্ন নেওয়ার বিষয়টি একালে উপেক্ষিত হয়। কোনো ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় হাতের লেখা খারাপ করার প্রবণতা বেশী থাকে কারণ তার ফলে না হোক একটা Style-ও তৈরী হয়ে যেতে পারে এই ভরসায়। কিন্তু সেকালে কবিরা উপলব্ধি করতেন তাঁদের হাতের লেখা পাঠকের কাছ অবধি পৌঁছোবে তাই লেখার হাত সব কবির সমান না হলেও হাতের লেখাটুকু অন্তত সুন্দর করার দিকেই তাঁদের সযত্ন প্রয়াস নিবদ্ধ থাকতো। পণ্ডিত জনের হাতের লেখা সব কালেই কম-বেশী ভালো হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ জানিয়েছেন, শ্রীরূপগোস্বামীর হাতের লেখা মুক্তা পঙ্‌ক্তির মতো সুন্দর। পণ্ডিত রামকিশোর শিরোমনির কবিত্ব এবং হস্তাক্ষর দুই-ই উৎকৃষ্ট।

দ্বিতীয় প্রমাণ পুথি লেখার ক্ষেত্রে লেখকের মনোযোগ খুব গভীর। কালি কলম এবং মন নিবিড় ভাবে একাত্ম না হলে এমন নিখুঁত লেখা হতে পারে না। আলোচ্য পুথির মোট ৯টি পত্র পাওয়া গেছে। তারমধ্যে কাটাকাটি বা নকলকারের সংশোধন (Revised Transmission) কোথাও নেই। কেবলমাত্র দু'জায়গায় মূল লেখা কেটে ছোটোখাটো পরিবর্তন করা হয়েছে যা লেখার মান উন্নত করার জন্য কবির নিজের হাতের সংশোধন। এ সম্পর্কে দৃষ্টান্ত সহযোগে পরে আলোচনা করা হচ্ছে।

তৃতীয় প্রমাণ বানানের প্রতি লেখকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। লিপিকরের নকল করা মধ্যযুগের পুথিতে বানানের নৈরাজ্য সর্বজনবিদিত। আলোচ্য পুথিতে বানান সর্বত্র-ই নির্ভুল। এমনকি, 'ন' এবং 'ণ' এর পার্থক্যও অতিশয় স্পষ্ট। এরকম নির্ভুল বানান লিপিকরের নকল করা পুথিতে কদাচ মেলে না। অবশ্য জতেক, সুঙ্গবান, জশ, মোক্ষ্য, চিন্ত্য, হৃৎপদ্ম, প্রেচেত, বিবিসিকা প্রভৃতি বানানের ব্যবহার রয়েছে। এর কারণ আঞ্চলিক উচ্চারণপদ্ধতি লেখকের সংস্কার প্রভাবিত করেছিল। তাছাড়া, বিশুদ্ধ বানানপদ্ধতি সম্পর্কে সেকালে সর্বজনস্বীকৃত কোনো নিয়ম গড়ে ওঠে নি। তখনও সর্ববাদিসম্মত বাংলা ব্যাকরণ সৃষ্টি হয় নি। তাই বানানের ক্ষেত্রে স্থান এবং কালের ছাপ কবির লেখায় খুব স্পষ্ট হয়ে উঠতো। এক্ষেত্রে সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি।

এবার কবির হাতের সংশোধনগুলি বিচার করে দেখা যাক। ১০থ পাতায় "সেই শ্রমে ঘর্ম্মবিন্দু ক্ষরে নাসা হত্যো" কেটে করা হয়েছে "অতি শ্রমে ঘর্ম্মবিন্দু ক্ষরে অঙ্গ হত্যো।" এর ফলে সাধারণভাবে পাঠ উন্নততর হয়েছে বলে মনে হয়।

নিছক তৎসম শব্দের প্রতি অনুরাগবশত এই সংশোধন সাধিত হলে কবি 'ঘর্ম্মবিন্দু' বদলে 'স্বেদবিন্দু' করতে পারতেন স্বচ্ছন্দে। কিন্তু 'ঘর্ম্মবিন্দু' 'স্বেদবিন্দু' অপেক্ষা যুগ্ম-ধ্বনির সংঘাতে অধিকতর ধ্বনি ঝংকারময়। মধ্যযুগে রচিত গেয় কাব্যে সঙ্গীতগুণ সৃষ্টি

করার জন্য কবিকে সদা-সচেতন থাকতে হ'তো। কবির এই সচেতনতা এই জাতীয় সংশোধনের মধ্যে নিহিত আছে। আলোচ্য ছত্রের 'নাসা' শব্দটি বর্জন করে 'অঙ্গ' শব্দ বসানোর হেতু-ও এক-ই।

১০ক পাতায় "জনমিল বিরোজার রূপে বলবান" কেটে করা হয়েছে "বিরোজা ব্যাপিকা তথি অতি বলবান"। সংশোধিত ছত্রে 'তথি' এবং 'অতি' শব্দ দু'টি পাশাপাশি বসিয়ে ধ্বনিসাম্য সৃষ্টি করাই বোধ করি কবির উদ্দেশ্য ছিল।

১০ক পাতার শেষ এবং ১০খ পাতার আরম্ভে এই রকম একটি সংশোধন আছে। প্রথম রচনা—

সুন বন্ধু সভাজন আদি শৃষ্টি বিবরণ উৎপত্তি হইল যেই মতে।

সপ্তসিন্ধু ক্ষিতিখণ্ড না ছিল ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড মেরুদণ্ড আদি দিননাশে॥ সংশোধিত রচনা—

সুন বন্ধু সভাজন আদি শৃষ্টি বিবরণ উৎপত্তি হইল জার গুণে।

সপ্তসিন্ধু ক্ষিতিখণ্ড না ছিল ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড মেরুদণ্ড আদি ত্রিভুবনে॥

প্রথম রচনার অন্ত্যমিল অপেক্ষা সংশোধিত রচনার অন্ত্যমিল অধিকতর উৎকৃষ্ট। আদর্শ পুথি সামনে রেখে যিনি 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং' করেছেন তাঁর পক্ষে এই জাতীয় সংশোধন কখনই সম্ভব নয়। এ সংশোধন কবির স্বহস্তসাধিত।

এবার দেখা যাক কবির হাতের লেখা কাব্য লিপিকরের প্রতিলিপিতে পরিবর্তিত হয় কিভাবে।

কবির লেখা—

অবনত হাথে তালে বন্দিলাঙ মহাকালে অচিন্ত্য অব্যক্ত আত্মমূল।
চতুর্ভুজ মহাবল প্রকাশিত করতল শায়ক কর্পর দণ্ডশূল॥
অচিরাত অবতীর্ন অতিঘোর ধুম্রবর্ণ মহাশয় প্রলম্ব উদর।
ব্রাঘ্র জিন কটি বেড়া ধৃত রক্তবাস ধড়া ভীমমূখ বেস ভয়ঙ্কর॥

—৪খ-৫ক

লিপিকরের প্রতিলিপি—

অবনত হাথে-তালে মৃত্যুঞ্জয় মহাকালে বন্দ মহাশীব অন্তমূল।
চতুর্ভুজ মহাবল প্রকাশিত করল শায়ক কর্পর দণ্ডমূল॥
অচিত অবতিন্ন অতি ঘোর ধুর্মবর্ণ মহাকায় প্রলম্ব উদর।
বাঘছাল কটি কালিকাপুরাণে একং শীবং সাস্তমনন্তং ইত্যাদি।

লিপিকরের নকলে ছোটো খাটো ভুলচুক আছে যথেষ্ট ; সেদিকে তাঁর বিশেষ লক্ষ্য নেই অথচ কালিকাপুরাণ নামক কোনো অর্বাচীন পুরাণের বচন (সম্ভবতঃ লোকমুখে প্রচলিত) গেঁথে দিয়ে বৃথা পাণ্ডিত্যপ্রকাশের বাসনা বেশ প্রবল।

॥গঙ্গার বন্দনা॥ ত্রিপদি ছন্দ॥

বন্দ গঙ্গা তরঙ্গিনী সর্ব্বতীর্থ স্বরূপিনী সুর [ধু] নি সর্ব পাপহরা।
কৃষ্ণদেহ সমূৎপন্না শ্বেত চম্পকের বর্ন্না কৃষ্ণতুল্যা ধ্যান অগোচরা॥
গোলোকে শিবের গণ দেবসভা বিদ্যমাণ রাধাকৃষ্ণ বস্যা একাসনে।
গানে সমাহিত চিত প্রেমে অঙ্গ পুলোকিত আচম্বিত আত্র দুইজনে॥
দ্রবরূপে ধানধরা সবিস্ময় দেবতারা হাহাকার শব্দ সুরকূলে।
ব্রহ্মাসন্নিকটে ছিল অবিলম্বে ধায়্যা গেল আধান করিল কমণ্ডুলে॥

লিপিকরের নকল—

॥ গঙ্গার বন্দনা ॥ ত্রিপদি ছন্দ ॥

বন্দ গঙ্গা তরঙ্গীনি সর্ব্ব তির্থ স্বরূপিনি সুরধনি সর্ব্বপাপহরা।
কৃষ্ণদেহ সহমূৎপর্ন্না সেৎ চম্পকের বর্ন্না কৃষ্ণতুল্যা ধ্যান অগোচরা॥
গোলক সীবে গান দেবসভা বিদ্যমান রাধাকৃষ্ণ বস্যা একাসনে।
গানে সমহিত চিত প্রেমে অঙ্গ পুলকিত আচম্বীত আগু দুইজনে।
দ্রপরূপে ধান ধরা স্ববিস্ময় দেবতারা হাহাকার সব্ব সুরকূলে।
ব্রহ্মা সনিকটে ছিল অবিলম্বে ধায়ে গেল আরাধন করিল কমণ্ডুলে॥

বোধহয় আর তুলনা করার প্রয়োজন নেই; বিজ্ঞ পাঠক সহজেই কবির মূল রচনা এবং লিপিকরের নকলের মধ্যে পার্থক্য ধরে নিতে পারবেন বলে আশা করি॥

বালবলভীভূজঙ্গ ভট্ট ভবদেব

সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়

"এই পর্বে (সেন-বর্মন পর্ব) ধর্মশাস্ত্রের প্রসিদ্ধতম লেখক হইতেছেন বালবলভী ভুজঙ্গ, রাঢ়ান্তর্গত সিদ্ধল গ্রামবাসী, সামবেদীয় কৌথুমশাখাধ্যায়ী, সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। তাঁহার এক পূর্বপুরুষ জনৈক অনুল্লিখিত নাম গৌড়রাজের নিকট হইতে হস্তিনীভট্ট নামক গ্রাম শাসন স্বরূপ পাইয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহ আদিদেব জনৈক বঙ্গরাজের সন্ধিবিগ্রহিক ছিলেন; পিতার নাম ছিল গোবর্ধন; মাতা সাঙ্গোকা ছিলেন জনৈক বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণ কন্যা। তিনি নিজে বর্মনরাজ হরিবর্মা এবং সম্ভবত তাঁহার পুত্রেরও মহাসন্ধিবিগ্রহিক মন্ত্রী ছিলেন। শিক্ষিত অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বেরও অধিকারী হইয়াছিলেন; ধর্মাচারনোদ্দেশে অনেক দীঘি ও মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন কিন্তু তাহার চেয়েও উল্লেখযোগ্য এই যে, সমসাময়িক কালে তাঁহার চেয়ে যুগন্ধর শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আর কেহ ছিলেন না। তিনি ছিলেন ব্রহ্মাদ্বৈত দর্শনের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাতা, কুমারিল ভট্টের মীমাংসা বিষয়ক মতামতের সঙ্গে সুপরিচিত, বৌদ্ধদের পরম শত্রু এবং পাষণ্ডবৈতণ্ডিকদের তর্কখণ্ডনে পটু, অর্থশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, আয়ুর্বেদ-অস্ত্রবেদ-তন্ত্র-গণিত-সিদ্ধান্তে সুদক্ষ, জ্যোতিষে ফলসংহিতায় দ্বিতীয় বরাহ। তিনি হোরাশাস্ত্র এবং ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং ভট্টোক্ত (কুমারিল) নীতি অনুসরণ করিয়া এক সহস্র ন্যায় মীমাংসা সম্বন্ধীয় আরও একটি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন"—

"বাঙ্গালীর ইতিহাস"-কার ডঃ নীহাররঞ্জন রায় যে-প্রতিভার পরিচয় দিতে গিয়া উল্লিখিত গৌরব-বাক্য লিখিয়াছেন, তাঁহারই আবির্ভাব ঘটিয়াছিল বীরভূম জেলার লাভপুর থানার এক ঐতিহাসিক গ্রাম—সিদ্ধলে; সিদ্ধল গ্রাম অধুনা শীতলগ্রাম নামে পরিচিত।

এই প্রতিভা ভট্ট ভবদেব নামে খ্যাত। ইনি ছিলেন বঙ্গেশ্বর হরিবর্মার মহাসন্ধি-বিগ্রহিক অর্থাৎ Minister for war and peace, ভবদেবের আদিপুরুষ বেদগর্ভ ৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন ও তৎকালীন বঙ্গাধিপতি আদিশূরের নিকট হইতে বসবাস করিবার জন্য বটগ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বেদগর্ভের পুত্র বশিষ্ঠ বঙ্গেশ্বরের নিকট ঐতিহাসিক সিদ্ধল গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সিদ্ধল গ্রামেই এই শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ বংশ নানান দিক হইতে শ্রীসমৃদ্ধিময় হইয়া উঠিয়া বঙ্গের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছিল।

সিদ্ধল গ্রাম তৎকালে উত্তর রাঢ়ের সুপ্রসিদ্ধ গ্রাম ছিল। ভবদেব ভট্টের বন্ধু বাচস্পতি মিশ্র ভবদেবের কুলপ্রশস্তি রচনা করিতে গিয়া এই গ্রাম প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"আর্য্যাবর্তভুবাং বিভূষণমিহখ্যাতস্তু সর্বাগ্রিমো।
গ্রামঃ সিদ্ধল এব কেবলমলঙ্কারোঽস্তি রাঢ়াশ্রিয়।"

সিদ্ধলে বসবাসকারী সাবর্ণগোত্রোদ্ভব এই ব্রাহ্মণকুল বেদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া 'শ্রোত্রিয়' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। মহাভারত বনপর্বে যক্ষ-যুধিষ্ঠির সংবাদে এই 'শ্রোত্রিয়' শব্দের অর্থভেদ করা হইয়াছে। সেইস্থানে বকরূপী মহাজ্ঞানী যক্ষ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"কেন সচ্ছ্রোত্রিয়ো ভবতি"...।

ধর্মরাজ ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন—"শ্রুতেন শ্রোত্রিয় ভবতি......।" ভট্টভবদেব এই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পরিবারের সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন। ভবদেবের কুল পরিচয় পাওয়া গিয়াছে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে বিন্দুসরোবর তীরের অনন্তবাসুদেবের মন্দিরে উৎকীর্ণ বাচস্পতি সৃষ্ট প্রশস্তি-লিপি হইতে। এই প্রশস্তি লিপি হইতে ভবদেবভট্টের যে বংশ-পরিচয় পাওয়া যায় তাহা নিম্নরূপ—

—"সাবর্ণমুনি (তদ্বংশে) বেদগর্ভ বা পরাশরের আবির্ভাব। বেদগর্ভের পুত্রের নাম বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠের তিনপুত্র—মহাদেব, ভবদেব (প্রথম) ও অট্টহাস। প্রথম ভবদেবের আট পুত্র মধ্যে সর্বাগ্রজ রথাঙ্গ। রথাঙ্গের পুত্র অত্যঙ্গ. অত্যঙ্গের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র আদিদেব, আদিদেবের পুত্র গোবর্ধন। গোবর্ধনের পত্নী সাঙ্গোকা ও পুত্র ভট্টভবদেব।"

ধরাশূরের রাজত্বকালে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ দিগের মধ্যে সর্বপ্রথম (৯০৬—৯৩৫ খৃ:) কুলবিধির প্রবর্তন হয়। ইহার পূর্বে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ সকলেই শ্রোত্রিয় নামে অভিহিত হইতেন। ধরাশূর ব্রাহ্মণগণকে 'কুলীন' ও 'স্বচ্ছোত্রিয়' এই দুই অংশে বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে সিদ্ধল-গাঞি-'স্বচ্ছোত্রিয়' আখ্যাপ্রাপ্ত হন। সুতরাং ভট্টভবদেব যে-কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তখন তাহার পিতৃপুরুষগণ 'সচ্ছোত্রিয়' নামে আখ্যাত হইতেন।

ইহার পূর্বে ভবদেব বংশ রাঢ়ী নামে পরিচিত ছিল। ঐতিহাসিক প্রমাণ এইরূপ—যাহারা আদিশূরের পুত্র ভূশূরের সহিত রাঢ়দেশে আসিয়া বাস করেন, তাহারা রাঢ়ী নামে খ্যাত হইলেন। তাহাদের নামে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ, কাশ্যপগোত্রীয় দক্ষ, সাবর্ণ গোত্রীয় বেদগর্ভ, ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষ ও বাৎসগোত্রীয় ছান্দড়।

তুল্য:—শাণ্ডিল গোত্রজঃ শ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণ কবিঃ।
দক্ষোঽপি কাশ্যপ শ্রেষ্ঠঃ বাৎস্য শ্রেষ্ঠোঽপি ছান্দড় ॥
ভরদ্বাজক গোত্রে চ শ্রীহর্ষ হর্ষবর্ধনঃ।
বেদগর্ভোঽপি সাবর্ণে সর্ববেদ পরায়ণঃ ॥

ভবদেব ভট্ট সাবর্ণ গোত্রের শ্রেষ্ঠ পুরুষ হইলেও তাহাকে কোথাও প্রবর করা হয় নাই। প্রথম ভবদেবকে হরিবর্মার অগ্রজ রাঢ়দেশে অন্য শাসন গ্রাম 'হস্তিনী' দান করিয়াছিলেন। এই প্রথম ভবদেবের বৃদ্ধপ্রপৌত্র আদিদেব বঙ্গরাজের মহামন্ত্রী-মহাপাত্র-মহাসন্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। আদিদেবের পৌত্র 'বালবলভীভুজঙ্গ' উপাধিধারী ভট্টভবদেব দীর্ঘকাল হরিবর্মাদেবের মন্ত্রী ছিলেন এবং তাহার পরেও এই দীর্ঘায়ু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ তাঁহার পুত্রের উপদেশ দাতা ছিলেন। তাহার প্রশস্তি রচনায় বাচস্পতি লিখিয়াছেন,—

—"বৌদ্ধ ম্ভোনিধিকুম্ভসম্ভব মুনিঃ পাষণ্ডবৈতণ্ডিক প্রজ্ঞাখণ্ডন
পণ্ডিতেঽয়মবনৌ সর্বজ্ঞ লীলায়তে ॥
সিদ্ধান্ত-তন্ত্র গণিতার্ণব পারদৃশ্বাবিশ্বাদ্ভুত
প্রসবিতা ফলসংহিতাসু। কর্তা স্বয়ং প্রথয়িতা চ
নবীন হোরাশাস্ত্রস্য যঃ স্ফুটমভূদপরো বরাহঃ ॥
যো ধর্মশাস্ত্র পদবীষু জরন্নিবন্ধা নন্দীচকার রচিতোচিত সৎপ্রবন্ধ: ॥
সব্যাখ্যায়া বিশদয়ন্মুনি ধর্মগাথাঃ স্মার্তক্রিয়া বিষয়সংশয়মুন্মমার্জ ॥
মীমাংসামুপায়ঃ স খলু বিরচিতো যেন ভট্টোক্তনীত্যা যত্র ন্যায়াঃ সহস্রং
রবিকিরণসমা ন ক্ষমন্তে তমাংসি। কিং ভূম্না সীম্নি সাম্নাং সকল কবিকলা
স্বাগমেষত্র শাস্ত্রেষ্বায়ুর্বেদাস্ত্রবেদ প্রভৃতিষু কৃতধীর দ্বিতয়োঽয়মেব ॥
যস্য খলু বালবলভীভুজঙ্গ ইতি নাম নাদৃতং কেন।"

যে ভট্টভবদেব সম্পর্কে বঙ্গাধিপতি হরিবর্মা এইরূপ প্রশস্তি রচনা করাইয়াছিলেন, তাহার কুলপরিচয় তর্কাতীত নহে। কেন না জয়ন্ত বা আদিশূর নামীয় নৃপতির অস্তিত্ব বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ আজিও নিঃসন্দেহ নহেন। এমতাবস্থায় প্রামাণ্য শুধুমাত্র "শ্যামাদাসী ডাক" নামক একটি কুলজী পুস্তিকা। ইহাতে ভবদেবের পূর্বপুরুষগণের রাঢ় বা বঙ্গে আগমণ বিষয়ে এইরূপ উল্লেখ আছে—

রাঢ়দেশে মহারাজা আদিত্যশূর নাম।
গঙ্গার সমীপে বাস সিংহেশ্বর ধাম ॥
আদর করিয়া আনে ঋষি পঞ্চজন।
সেই সঙ্গে পঞ্চগোত্র করিল (আ) গমন ॥

আদিত্যশূর বা আদিশূর কোথা হইতে এই পঞ্চগোত্র (ব্রাহ্মণ) আনিয়াছিলেন সেই বিষয়েও দ্বিমত প্রচলিত। একদল বলেন পঞ্চগোত্র কনৌজ হইতে আসিয়াছিলেন, অপরদল পঞ্চগোত্রকে কোলাঞ্চ হইতে আনিবার পক্ষপাতী। বৌদ্ধবিদ্বেষী বঙ্গাধিপতি মহাশৈব শশংকে বুদ্ধগয়ার অক্ষয় বটবৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত করিয়াছিলেন—ইতিহাসে একথার উল্লেখ আছে। এই অপরাধে নাকি শশাংক মহাব্যাধিতে আক্রান্ত হন। তখন প্রায়শ্চিত্ত করণোদ্দেশে শশাংক কনৌজ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। শশাংক হইতে আদিশূর দুইশত বৎসরের ব্যবধান। ইতিমধ্যে শশাংক আনীত ব্রাহ্মণগণ পুনর্বার বেদবিস্মৃত হইলেন, বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড বৌদ্ধপ্রভাবে বিনষ্ট হইতে বসিল, তাই আদিশূর কনৌজ হইতে পঞ্চজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনিলেন। আদিশূর আনীত ব্রাহ্মণেরা বেদ-ভুলিয়াছিলেন এমন প্রমাণ না থাকিলেও পুনর্বার বল্লালসেন-কৃত বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে কনৌজ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণের যোগদানের খবর পাওয়া যায়। অবশ্য কনৌজ ও কোলাঞ্চ লইয়া পণ্ডিতগণ বিরোধ করিয়াছেন।

মহেশ্বরমিত্রের "নির্দোষকুলপঞ্জিকা" হইতে কোলাঞ্চ যে কান্যকুব্জ নহে তাহার আভাষ পাওয়া যায়। সাবর্ণ গোত্রজ সুবিখ্যাত বেদগর্ভের পুত্র বিষ্ণু, তৎপুত্র শরণি, তৎপুত্র কোল, কোলের দুইপুত্র—ধীর ও ধুরন্ধর। ধীর রাঢ়ীয় রহিলেন, ধুরন্ধর দাক্ষিনাত্য [কোলাঞ্চ-কলিঙ্গদেশ] হইলেন। বামন শিবরাম 'কোলাঞ্চ'কে কলিঙ্গ বলিয়াছেন। পরবর্তী পণ্ডিতগণ ইহাকে কান্যকুব্জ মনে করিয়াছেন। সুতরাং মহেশ্বর মিত্রের অনুমান অনুসারে ভবদেব ভট্ট হইলেন রাঢ়ীয় ধীরের বংশধর। ধীর হইতে কত প্রজন্ম পরে ভট্ট ভবদেবের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল তাহা মহেশ্বর কথিত-বংশলতিকায় নাই এবং ইহার পক্ষে ভুবনেশ্বরে প্রাপ্ত ভবদেব-প্রশস্তি লিপি হইতে কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না।

ভবদেবের বংশ লইয়া যেমন ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতগণ একমত নহেন, তেমনই ভবদেবের-ঔপাধিক 'বালবলভী' নগর বা রাজ্য লইয়াও বহুমত প্রচলিত আছে। হরিবর্মা একাধারে বঙ্গ-উৎকলের শাসনদণ্ড হাতে লইয়াছিলেন। "বাঙ্গালীর ইতিহাস"-কার ডঃ নীহার রঞ্জন রায় বলিয়াছেন বালবলভীরাজ্য হইল মেদিনীপুরের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগ। ইহা উৎকলসমীপবর্তী বলিয়া তিনি ঐরূপ অনুমান করিয়াছিলেন মনে হয়। অপরপক্ষে ডঃ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার "বাঙ্গালার ইতিহাস" (১ম খণ্ড) গ্রন্থে লিখিতেছেন—

'ভুবনেশ্বর-প্রশস্তি এবং 'রামচরিত' ব্যতীত ভবদেবভট্ট বিরচিত 'প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ', 'তন্ত্রবর্তিক টীকা' নামক গ্রন্থদ্বয়ে তাহার 'বালবলভীভূজঙ্গ' উপাধিতে বালবলভীর নাম পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে বর্তমানে 'দেবগ্রাম' নামে বহুগ্রাম আছে সুতরাং 'দেবগ্রাম' বা 'বালবলভী' যে নদীয়া জেলায় অবস্থিত ছিল একথা নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে না।"

ডঃ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্ধৃতি হইতে বুঝিতে পারা যায় অন্য কেহ বালবলভী নগর নদীয়ায় অবস্থিত এই কথা বলিয়াছেন। যাহাই হওউক বালবলভী রাজ্য বা নগর আজিও অনির্ণীতই রহিয়া গিয়াছে। ভবদেবের জন্মস্থল লইয়াও অন্ততঃ দুইটি মত পাইতেছি। তাবৎ ঐতিহাসিক হইতে আরম্ভ করিয়া বীরভূম রত্ন-পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন মহাশয় পর্যন্ত সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন ভবদেবের জন্মভূমি সিদ্ধল-গ্রাম হইল উত্তর রাঢ়ার বীরভূম জেলান্তর্গত শীতলগ্রাম। কিন্তু "হুগলী ও হাওড়ার

ইতিহাস" প্রণেতা বিধুভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয় হুগলী জেলার 'সিধ্‌লা' নামক একটি প্রাচীন গ্রামকে ঐতিহাসিক 'সিদ্ধল' গ্রাম বলিয়া মনে করিয়াছেন। হয়ত তিনি ভুবনেশ্বর-প্রশস্তির এই পঙ্‌ক্তিটি বিশেষভাবে অনুধাবন করেন নাই—

—'রাঢ়ায়ামজলাসু জাঙ্গলপথগ্রামোপকণ্ঠস্থলীসীমাসু
শ্রমমগ্নপান্থপরিষৎ প্রাণাশায় শ্রীমনঃ। যেনাকারি জলাশয়ঃ
পরিসরস্নাতাভিজাতাঙ্গনা বক্ত্রাব্জ প্রতিবিম্বমধুপীশূন্যাব্জিনীকাননঃ॥

এই পঙ্‌ক্তিতে রাঢ়ের 'অজলা, ভূখণ্ডে ভবদেবকৃত জলাশয়ের শোভা বর্ণনা করা হইয়াছে। অজলা কংকরাকীর্ণ প্রান্তর বীরভূমে যেরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়, হুগলীর শ্যামল অবয়বে সেইরূপ নহে।

ভবদেব ভট্টের আদিপুরুষ বেদগর্ভ পরাশর নামেও পরিচিত ছিলেন। তৎপুত্র বশিষ্ঠ হুগলীর আদিসপ্তগ্রাম বন্দর হইতে জল যানে মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়া ভোটদেশ গিয়াছিলেন বলিয়া হুগলীও 'হাওড়ার ইতিহাস' প্রণেতা উল্লেখ করিয়াছেন। ইনিই বীরভূমের তারাপীঠে তারাসাধনার বীজ বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। এঁরই নামানুসারে 'বশিষ্ঠ-কুণ্ড'র নামকরণ হইয়াছিল। বশিষ্ঠই সিদ্ধল গ্রামের শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকুলের আদি-পুরুষ। বশিষ্ঠ তনয় অট্টহাস লাভপুর সন্নিকট ফুল্লরাসতীপীঠের প্রবর্তা এবং সেইহেতু এই সতীপীঠ 'অট্টহাস' নামে প্রসিদ্ধ। অট্টহাস হইতে ষষ্ঠপুরুষ পরে ভবদেব ভট্ট সিদ্ধল-গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও পিতৃপুরুষদিগের স্মৃতির সম্মানার্থে ফুল্লরাপীঠের দক্ষিণে ঐতিহাসিক 'দেবীদহ' খনন করাইয়াছিলেন। পূর্বকালে দেবীদহ হইতে ভট্ট-বংশীয় সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিগণ নৌকাযোগে কোপাই নদীপথে পাড়ি জমাইতেন। আজিকে দহও নাই, সেই জলপথও নাই।

ভট্ট ভবদেব যে সকল গ্রন্থপ্রণয়ন করিয়াছিলেন সেইগুলি হইল—ব্যবহার তিলক, কর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি, প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ, সম্বন্ধ বিবেক, শবসূতকালাশৌচ-প্রকরণ, হোরা শাস্ত্র। কর্মনুষ্ঠান পদ্ধতি তিনভাগে বিভক্ত—(১) দশকর্ম পদ্ধতি (২) সংস্কারপদ্ধতি (৩) ছান্দোগপদ্ধতি। সম্বন্ধবিবেক গ্রন্থ মতে বিবাহে পাত্রপাত্রীর যোগ্যতা সম্বন্ধে বিচার করা হইয়া থাকে। শবসূতকালাশৌচপ্রকরণ—জাতকাশৌচ ও মৃতাশৌচ প্রভৃতির আলোচনা গ্রন্থ। ইহাদের মধ্যে 'ব্যবহার তিলক' গ্রন্থের কোন পুঁথি অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। তবে রঘুনন্দন, মিত্রমিশ্র এবং বর্ধমান প্রভৃতি পরবর্তী স্মৃতি কর্তারা এই গ্রন্থের নানা মতামত উদ্ধার করিয়াছেন তাঁহাদের রচনায়। 'প্রয়শ্চিত্ত-প্রকরণ' গ্রন্থে ভবদেব প্রায় ষাটজন পূর্বগামীদের মতামত উদ্ধার করিয়া ছয়প্রকারের অপরাধ ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ বাংলা ও বাংলার বাহিরে প্রভূতি প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিল। পরবর্তীকালে বেদাচার্য, নারায়ণ ভট্ট এবং গোবিন্দানন্দ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ধর্মশাস্ত্র রচয়িতারাও ভবদেবের মতামত উদ্ধার ও আলোচনা করিয়াছেন। "ছান্দোগ্য কর্মানুষ্ঠান" পদ্ধতি সামবেদীয় দ্বিজবর্ণের সংস্কার সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন হইতে আরম্ভ করিয়া ষোল-প্রকারের সংস্কারের আলোচনা এই গ্রন্থে আছে।

এই সংস্কারগুলি ভট্টভবদেবের ন্যায় অমিতযশা প্রবলপ্রতাপান্বিত পণ্ডিতকেও একপ্রকার লোকভয়ে দেশাচারকে প্রাধান্য দিবার জন্যই বেদাদি হইতে শ্লোকসংগ্রহ করিয়া তৈরী করিতে হইয়াছিল। ভবদেবভট্ট (১১ শতক) এবং পশুপতি (দ্বাদশ শতক)— এঁরা সামবেদ, যজুর্বেদ এবং ঋক্‌বেদ হইতে সুন্দর সুন্দর সূক্তগুলিকে উদ্ধৃত করিয়া যে-পদ্ধতি রচনা করিয়াছিলেন সেই হিসাবেই পরবর্তী পণ্ডিতগণ সমাজে দশকর্মক্রিয়া

করিলেও, কতকাল পূর্বে হইতেই অন্ততঃ পূর্বভারত তো বটেই আরও কিছু কিছু ভূখণ্ডের অধিবাসীগণ এই সব বেদ স্মৃতির স্মরণে দশকর্মের অনেক কাজকে গৌণই মনে করিতেন, তাহারা সকলের ঊর্দ্ধে দেশাচারকেই বড় করিয়াছিলেন। তাই বিবাহে সীমন্তোন্নয়ন অনুষ্ঠানে সিঁদুরকে আর্য আচারের জাতে তুলিতে ভবদেব ও পশুপতিকে কত না শ্রম করিতে হইয়াছিল। বৈদিক শব্দের শ্রুতি সাম্যে মিল হয় এবং শব্দ চয়নের মধ্যেও কিছুটা ঘেসিয়া থাকে এইরূপভাবে বেদস্মৃতিকে সংগ্রহ করিয়া তাহাদের পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। উভয়েই "শিষ্ট সমাচারাৎ" বলিয়া বর কর্তৃক বধূর সীমন্তে সিঁদুর দানের উপদেশ দিয়াছেন। নিরুপায় হইয়াই তাহারা এই কার্য করিয়াছিলেন, কারণ,—"উদর নিমিত্তং বহু কৃত বেশাঃ।"

এই দেশে বাস করিতে হইবে, অথচ এইদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর মধ্যে 'রমণী-পুরুষে'র ঘরসংসারে কুমারী, সধবা, বিধবা চিনিতে পারা যাইবে না—সে কেমন কথা? তাই দেশাচারকে মানিয়া লইয়াই "শিষ্টসমাচারাৎ" বলিয়া একটা কৈফিয়ৎ অবশ্যই টানিতে হইয়াছে। শিক্ষিত পুরোহিত এই প্রশ্নে চুপ করিয়া থাকেন, অশিক্ষিতের অন্য কথা।

ভট্টভবদেব ও পশুপতি বড় সুন্দর কৌশলে সিঁদুর দানের ব্যাপারটিকে বেদগন্ধী সংস্কৃতগন্ধী করিয়া নিজেদের পদ্ধতি রচনা করিয়াছেন। ঋক্‌বেদের ৪র্থ মণ্ডলের ৫৮ সূক্তে ৭ম মন্ত্র এবং যর্জুবেদের ১৭ অধ্যায়ের ৯৫ মন্ত্রে একত্রে এইরূপ গাঁথিয়াছেন—

সিন্ধোরিব প্রধ্বনে শূঘনাসো
বাত প্রমীয়ঃ পতয়ন্তি য হবাঃ
ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী
কাষ্ঠাভিন্দন্নুর্মিভিঃ পিন্বমানাঃ।

ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ :—"বেগবতী নদী যেমন উঁচু থেকে নীচুতে নামার সময় প্রবল হয়ে, তরঙ্গযুক্ত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার বেগ যেমন বায়ুর বেগকেও অতিক্রম করে, অথবা প্রবল গতি ও লোহিত বর্ণের অশ্ব যেমন হঠাৎ দৌড়বার সময় নিজের বেগে কাঠের বৃতি ভেদ করে, তেমনি মহাবেগে এই ঘৃতধারা জলন্ত আগুনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে।" বলা বাহুল্য উদ্ধৃত সূক্তনিচয় কোথাও সিঁদুর সাজের বিন্দুমাত্র আভাস নাই অথচ 'সিন্ধোরিব' শ্রুতি সাম্যে সিঁদুর হইয়াছে। ভুজঙ্গ হইয়াও ভবদেবকে দেশাচারকে বড় করিতে গিয়া ছলনাশ্রয়ী হইতে হইয়াছিল।

অথচ ভবদেবের জীবনীকারগণ বলিতেছেন—"তিনি ঋষিগণপ্রণীত ধর্মশাস্ত্রসকলের সংস্কার সাধন করিয়া স্মার্তক্রিয়া বিষয়ের সংশয় দূর করিয়াছিলেন।"

আর একস্থানে ভবদেব সম্পর্কে এইরূপ গৌরববাক্যে লিখিত আছে —"ভবদেব ও রাঢ়ান্তর্গত ভূরিশ্রেষ্ঠ-বাসী নৈয়ায়িক শ্রীধরাচার্যের ন্যায় বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া বৌদ্ধজলনিধির অগস্ত্য বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।" বস্তুতঃ বৌদ্ধগণের নিকটেই ভবদেবভট্ট 'ভুজঙ্গ' স্বরূপ ছিলেন, আর বেদচারী পণ্ডিতকুলে তিনি ছিলেন চানক্য প্রতিম।

বিজয় সেনের কালে এই শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ এতদূর বিত্তশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে,—"ব্রাহ্মণরমণীগণ মুক্তা, মরকত ও রত্নাদি অতিসুলভ জ্ঞান করিতেন।" পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন তাই ভবদেবকে "ভট্টরাজা" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। বীরভূম ভট্টভবদেবের জন্য গৌরব বোধ করিতে পারে—ভবদেব সমগ্র রাঢ়ভূখণ্ডের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। নিগ্রন্থগণকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিয়া বেদাচারের-পুর্ণ প্রবর্তন করিয়াছিবেন।

॥ জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় ঃ গ্রন্থাগার ॥

গণশিক্ষার অন্যতম প্রয়োজনীয় মাধ্যম গ্রন্থাগার। তাই বামফ্রন্ট সরকারের সামগ্রিক শিক্ষানীতিতে গ্রন্থাগার উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শুধু মুষ্টিমেয় মানুষের নান্দনিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য নয়—শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য জীবিকাশ্রয়ী মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকার গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সরকার সাহায্য করে আসছে।

গত ছ'বছরে পশ্চিমবঙ্গে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৭৬২ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৪১০টি। এই সময়ে রাজ্য বাজেটে গ্রন্থাগার উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে মোট প্রায় ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। জেলা, মহকুমা এবং গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির বার্ষিক অনুদান পাঁচ হাজার, তিন হাজার এবং ছয়শত টাকার পরিবর্তে বাড়িয়ে যথাক্রমে পঞ্চাশ হাজার, দশ হাজার এবং চার হাজার টাকা করা হয়েছে।

১৯৭৯ সালে প্রবর্তিত গ্রন্থাগার আইন এবং পরবর্তীকালে এই আইনের কয়েকটি সংশোধনের মাধ্যমে গ্রন্থাগারগুলির সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গঠিত হয়েছে পৃথক গ্রন্থাগার অধিকার এবং রাজ্য গ্রন্থাগার সংসদ।

রাজ্যের বিভিন্ন জেলার শিক্ষায় অনগ্রসর এলাকায় সাধারণ মানুষের জন্য গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুবিধা সম্প্রসারিত হয়েছে। পাঠক সাধারণের সামাজিক চেতনা, জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করেছে এই গ্রন্থাগারগুলি।

সর্বস্তরের মানুষের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান, জনগণের অফুরন্ত জিজ্ঞাসার জ্ঞান-ভাণ্ডার এই গ্রন্থাগার। অজানাকে জানার জন্য শিশুমনের অপরিসীম আগ্রহের কথা স্মরণ রেখে রাজ্য সরকার সম্প্রতি প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮৩৭ টি পাঠাগারে শিশুদের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছে। শিশুদের জন্য এরকম ব্যবস্থা ভারতবর্ষে অভিনব।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে সমাজসেবী মানুষের উপর এক গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে গ্রন্থাগারের সঠিক ব্যবহারের সাহায্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচনের সম্ভাবনাকে সার্থক করে তুলুন।

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥

বাংলার এক অনাবিষ্কৃত কবি : প্রাণরাম

পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহৃদয় সাহিত্যানুরাগী, গবেষক ও সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের প্রচুর শ্রম, কৌতূহল, উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় এ যাবৎ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বহু পুরোণো পুথি সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়েছে। তথাপি এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, বাংলাদেশের সুদূর গ্রামাঞ্চলে বহু প্রাচীন পুথি আজ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃতই রয়েছে। আর সে সব পুথি কালের করাল গ্রাসে আজ বিনষ্ট হতে চলেছে। যাঁরা এসব জিনিসের মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারেন না, তাঁরা পুথিপত্র অবহেলায় অনাদরে বস্তাবন্দী করে ফেলে রাখেন এবং এক সময় অনাবশ্যক বোঝা ভেবে জলাশয়ে বিসর্জিত করেন। সাহিত্যের ইতিহাসে এটা যে একটা বিরাট অপচয় এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বর্তমান প্রাবন্ধিক জগদ্রামী রামায়ণের মূল পুথি অন্বেষণকালে বাঁকুড়া জেলার মেজিয়া থানার অন্তর্গত কালিকাপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত ধর্মদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে এমন একটি শিবমঙ্গল পুথির সন্ধান পেয়েছেন যে পুথি এবং তার রচয়িতা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে (মধ্যযুগের) আজ পর্যন্ত অপরিজ্ঞাত। দুঃখের বিষয়, কবি প্রাণরাম রায়ের এই শিবমঙ্গল পুথিটি ছিন্ন, খণ্ডিত ও কীটদষ্ট সুতরাং সাহিত্যের ইতিহাসে পুথিটির বিশেষ গবেষণার কোনো অবকাশ নেই। পুথিটিতে প্রাপ্ত পৃষ্ঠা সংখ্যা— ১, ৩-১১, ১৮, ২০, ২৩-২৪। প্রথম পৃষ্ঠা ছাড়া অন্যান্য পৃষ্ঠায় দুদিকে লেখা রয়েছে। (উদ্ধৃতি আলোচনার সময় তাই পৃষ্ঠার প্রথমদিকের আলোচনায় আমরা 'ক' অংশ এবং শেষাংশের আলোচনায় 'খ' অংশ বলে উল্লেখ করবো।)

কবির ভাষায় কাব্যটির নাম—"শিবলীলা সিন্ধু"। কাব্যটিতে কবি বংশ-পরিচয় দেশ-পরিচয় গ্রাম-পরিচয়, পিতৃমাতৃ-পরিচয় সুষ্ঠুভাবে দিয়েছেন। পুথির শেষাংশ না পাওয়ায় পুথিটি মূল কিংবা নকল বোঝার উপায় নেই কারণ অনুলেখকেরা সাধারণতঃ পুথির শেষাংশে নিজেদের পরিচয় দিতেন। এছাড়া পুথি সমাপ্তির সাল তারিখও পাওয়া যায় নি। তাহলেও আমরা কবি ও তাঁর কাব্য রচনার একটা আনুমানিক কালসীমার পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো।

* * *

কবি প্রাণরামের প্রাপ্ত পুথিটির প্রথম ও নবম পৃষ্ঠায় কাব্য-পরিচয়বংশ-পরিচয়,দেশ ও গ্রাম পরিচয় রয়েছে। প্রথম পৃষ্ঠায় কাব্য পরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলেছেন :

"শিবলিলা সিন্ধু অতি অপার।

বর্ণিবারে মতি হছো আমার॥" (প্রাপ্ত পুথি-পৃষ্ঠা ১) এরপর কবি নিজের বংশ-পরিচয় প্রদান প্রসংগে প্রথম পৃষ্ঠাতেই বলেছেন :—

"পিতামহ মহাশয় নাম রঘুনাথ রায়
তাঁহার আত্মজ হয় ছয়।
যোেষ্ট শে কনিষ্ঠক্রম বলি তা শভার নাম
শভামধ্যে দিএ পরিচয়॥" (পৃষ্ঠা-১)

এবং শেষে বলেছেন : "জগদ্রাম শে পিতৃব্য অদ্ভুত কৱিলা কাব্য
সংজ্ঞা অদ্‌ভুত রামায়ণ।
তারপর দুর্গাপ্রাতে মনোহর শ্রবণেতে
দুর্গা পঞ্চরাত্রির বর্ণন॥" (পৃষ্ঠা-১)

রঘুনাথ রায় ছিলেন কবির পিতামহ। এই রঘুনাথের ছয় পুত্র। কবি রঘুনাথের চতুর্থপুত্র রাধাকান্তের পুত্র ও রামায়ণ রচয়িতা বিখ্যাত কবি জগত্রাম রায়ের (রঘুনাথের দ্বিতীয় পুত্রের) ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। রামায়ণ রচয়িতা প্রখ্যাত কবি জগত্রামের রামায়ণ ও দুর্গাপঞ্চরাত্রির উল্লেখ কবি প্রাণরাম এখানে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করে বলেছেন— কবি জগত্রামের জ্যেষ্ঠ পুত্র কবি রামপ্রসাদ পিতার আদেশেই রামায়ণ ও দুর্গাপঞ্চরাত্রি কাব্য পরিসমাপ্ত করেন।

* * *

কবি পুনরায় নিজের দেশ-গ্রাম বংশ-পরিচয় প্রসংগে নবম পৃষ্ঠায় বলেছেন :

"পঞ্চকুট রাজ্য ধরা পরগণে মহিসারা
উত্তরা সে দামোদর নদি।
ভুলুই গ্রামেতে গেহ মো জিহোঁ পিতামহ
রঘুনাথ রায়ের অবধি॥
রায় রাধাকান্ত তাত নিরন্তর সিতানাথ
স্বরূপ প্রকাশ জাঁর হ্রিদে।
দ্বিজ প্রাণরাম ভণে শিবের মঙ্গল গানে
য্যেষ্ঠ সুত শ্রীগুরু প্রশাদে॥" (পৃ. ৯ (খ))

পঞ্চ কোট রাজ্যের অধীন মহিসারা পরগণার ভুলুই গ্রামে কবির বাস। গ্রামটির উত্তরে দামোদর নদী প্রবাহিত। রঘুনাথ রায় তাঁর পিতামহ, যাঁর অন্তঃকরণ সর্বদা রাম নাম জপে তৎপর সেই রাধাকান্ত রায় তাঁর পিতা এবং গুরুপ্রসাদ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র।

আমরা পূর্বে-ই উল্লেখ করেছি, খণ্ডিত ও ছিন্ন পুথিটির দ্বিতীয় পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নি। তৃতীয় পৃষ্ঠায় গণেশ বন্দনা ও সরস্বতী বন্দনা রয়েছে। কবির গণেশ বন্দনা অংশটি সরস কবিত্বে উত্তীর্ণ হয়েছে :—

"বন্দো দেব লম্বোদর জার নামে বিঘ্ন দূর
বিনায়ক দেবের প্রধান।··· ·····" (পৃ. ৩ (ক))

শেষে কবি বলেছেন :

"পড়াশুনা নাই জানি তবে দেব গুণমণি
মোর মনে বড় হল নেসা।" (ঐ)
"তব তাত প্রীতে কাব্য হত্যে অতি সম্ভব্য
তুমার ও চরণ ভরসা॥" (পৃ. ৩ (খ))

কবি বৈষ্ণবসুলভ বিনয় বশতঃ নিজেকে এখানে মূর্খ বলে দীনতা প্রকাশ করলেও প্রাপ্ত পুথিতে তাঁর প্রচুর পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে।

অতঃপর কবি সরস্বতী বন্দনাংশটুকু ও মধুর কবিত্ব-মণ্ডিত করে রচনা করেছেন :

"বন্দো মাতা সরস্বতী ও পদে করি জে নতি
স্থন মাতা কমল আসনা।
অজোনি সম্ভবা মাতা বিষ্ণুবক্ষস্থল স্থিতা
দয়া করি পুরহ বাসনা॥"········· (পৃ. ৩ (খ))

চতুর্থ পৃষ্ঠায় শুরুতে কবি পিতৃ-মাতৃ বন্দনা করেছেন :

"বিমলা নির্মলা মাতা রায় রাধাকান্ত পিতা
দুহাঁ পদে অসংক্ষ প্রণতি।"········· (পৃ. ৪ (ক))

এরপর কবি নিজেকে চঞ্চলচিত্ত, পুণ্যহীন ও নরাধম বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি নিজেকে তীর্থ পর্যটনে অক্ষম এবং দারিদ্র্যবশত: দানধর্মে অপারগ বলেও উল্লেখ করেছেন :

"নাই মোর পুণ্যলেস　　ফিরিবারে দেসে দেস
সক্তিহিন তির্থ পর্জ্যোটনে।
ধনহিন দিতে দান　　তবে কিসে পরিত্রাণ
স্মন নিজ বলি বিবরণে॥"　　(পৃ. ৪ (ক))

আর তাই পাপক্ষয় মানসে কবি পিতা-মাতার আশীর্বাদ শিরোধার্য করে এই শিব-লীলা সিন্ধু কাব্য রচনারূপ পুণ্যকর্মে ব্রতী হয়েছেন। কারণ কবির মতে :

"সুরনদি গঙ্গা জেন　　শিবলিলামৃত তেন
অতিস্নিগ্ধ ত্রিতাপ নাসয়।"......... (পৃ. ৪ (খ))

অত:পর পুথিটির পঞ্চম পৃষ্ঠার সুরুতেই নারদ ও নারায়ণের কথোপকথনের মাধ্যমে কাব্যটির সূচনা করা হয়েছে। নারদ কলিযুগের দুষ্কর্ম ও দুরাচারের বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে নারায়ণের কাছে জানতে চেয়েছেন—এ থেকে সাধারণ মানুষ কিভাবে নিষ্কৃতি পাবেন ? (কবির এ অংশটি ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের ভাষ্যানুবাদ হলেও কবির মৌলিকত্বও কৃতিত্ব সমভাবে ধরা পড়ে।) নারদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান বললেন :

"নারদ কহিলা এ বিবরণে।
উত্তর তার দেন নারায়ণে॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের সূত্র লইয়া।
গান জে শিব মঙ্গল কহিয়া॥"　　(পৃ. ৫ (খ))

এরপর নারায়ণ ত্রিপুর দৈত্যের কাহিনীর উল্লেখ করেন। ত্রিপুর দৈত্য দেবরাজ ইন্দ্রের ঐশ্বর্যও পরাক্রম দর্শন করে পরশ্রীকাতরতাবশত: দৈত্যগুরু শুক্রের শরণাপন্ন হলে গুরু তাকে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে বলেন। কালক্রমে ত্রিপুর দৈত্য ইষ্টদেবের কাছে ত্রিপুরের (অর্থাৎ তিন ভুবনের) অধিপতি হবার বর লাভ করেন। তখন দৈত্যগুরু শুক্রের পরামর্শে মহাবলশালী দৈত্য দেবরাজ ইন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। কবি প্রাণরাম অপূর্ব কবিত্বে দিব্যঅস্ত্র, সৈন্য-সামন্ত, অশ্ব-হস্তী ইত্যাদি যুদ্ধোপকরণের বর্ণনা দিয়েছেন।

*　　*　　*

অত:পর দেবগণের সঙ্গে, বিশেষ করে দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে, ত্রিপুর-দৈত্যের বাছাই সৈন্যদের প্রচণ্ড সংগ্রামের চিত্র কবি প্রাণরাম প্রাণবন্ত ভাবেই এঁকেছেন। উভয় পক্ষেরই তুমুল সংগ্রামে দশম পৃষ্ঠাটি পরিপূর্ণ। অবশেষে :—

"ক্ষুধা ত্রিসা পরিহরি জতেক অমর।
দেবমানে বহুদিন করিলা সমর॥"　(পৃ. ১০ (খ))

কিন্তু : "ইষ্টবরে মহাসুর বলবান হল্য।"　ঐ

আর তাই সে—"সমরে অমর ভূপে পরাভব কল্য॥"　ঐ

দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করার সঙ্গে সঙ্গেই ত্রিপুর স্বর্গের অধিকার লাভ করলেন এবং অনায়াসেই অন্যান্য দুটি ভুবন অচিরেই নিজের দখলে এনে ত্রিপুরের অধিপতি হয়ে বসলেন।

এদিকে পরাজিত দেবরাজ ইন্দ্র অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে শেষ পর্যন্ত দেবগুরু বৃহস্পতির শরণাপন্ন হলেন এবং মহাবল ত্রিপুর দৈত্যের হাতে নিজেদের দুর্দশা ও শেষে পরাভবের কথা বর্ণনা করলেন।

একাদশ পৃষ্ঠায় শুরুতেই দেবগুরু বৃহস্পতি দেবতাগণকে আশস্ত করে দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হতে বলেছেন :

"পুনর্ব্বার বৃহস্পতি দেবগণে কন।
সমাদরে সেব স্থন দেব ত্রিলোচন॥" (পৃ. ১১ (ক))

অতঃপর দেবগুরু দেবতাদের কাছে দেবাদিদেব মহাদেবের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। বৃহস্পতি দেবতাদের বল্লেন—পূর্বে পক্ষীরাজ গরুড়ের ভয়ে ভীত নাগরাজ মহাদেবের শরণাপন্ন হলে মহাদেব তাঁকে অভয় দিয়ে নিজে অহিভূষণ হলেন। সুতরাং গরুড়ের গর্ব খর্ব হোল। আর তাই :

"সরণাগতের প্রতি করুণার সিন্ধু।
আসুতোস দেব ভোলা অতি দিনবন্ধু॥" (পৃ. ১১ (ক))

দেবগুরু পুনরায় দেবতাদের ব্যাধের কাহিনীটি বর্ণনা করেন। মহাদেবের আশীর্বাদে নীচাশয় পশুঘাতক ব্যাধ মৃত্যুর পর কেমন শিবলোকে প্রয়াণ করেছিল দেবগুরু বৃহস্পতি তার দীর্ঘ বিবরণ পেশ করেছেন। অতঃপর মহাদেব বন্দনান্তে দেবগুরু বলেন—দেবতাদের উচিত অবিলম্বে মহাদেবের শরণাপন্ন হওয়া। আর মহাদেবের হস্তেই যে ত্রিপুরদৈত্য ধ্বংস হবেন—সে নির্দেশ ও তিনি দিয়েছেন :

"সভে মেলি গমন সে করহ সত্তর।
তাঁরে সানুকুল করি মাগ্যে লাও বর॥
আমার এ উপদেস স্থন সব স্থর।
তাঁর করে ধ্বংস হবে ত্রিপুর অস্থর॥" (পৃ. ১১ (খ))

গুরুর আদেশে দেবতাগণ মহাদেবের উদ্দেশ্যে গমনকালে চিন্তা করলেন—পত্নী-বিরহে মহাদেব এখন উন্মনা :

"পথে জাত্যে অমরেতে করএ মন্ত্রণা।
দারার বিচ্ছেদে দেব আছেন উন্মনা॥" (পৃ. ১১ (খ))

—এর পর পুথি ছিন্ন হয়েছে—। অতঃপর অষ্টাদশ পৃষ্ঠার প্রায় সমগ্র অংশ জুড়ে হিমালয়ের দুর্গা প্রশস্তি এবং পরিশেষে হিমালয়ের স্তবে তুষ্টা দেবী দুর্গা হিমালয়কে কন্যা বর দান প্রসংগে বললেন :

"আতি জন্ম লিব তব জায়ার উদরে॥" (পৃ. ১৮ (খ))

কবি হিমালয়ের দুর্গা প্রশস্তি অংশটি প্রকৃত ভক্তের মর্যাদায় রচনা করেছেন বলে কাব্যাংশটি রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে। অতঃপর হিমালয় :

"দেবদত্ত দ্রব্য জত বশণ ভুশণে।
দিলেন সে নিমন্ত্রিত জতেক ব্রাহ্মণে॥" (পৃ. ১৮ (খ))

অতঃপর পুথি আবার ছিন্ন হয়েছে। এর পর ২০, ২৩ ও ২৪ পৃষ্ঠা শুধুমাত্র পৃষ্ঠা হিসেবেই পাওয়া গিয়েছে। অর্ধছিন্ন, কীটদষ্ট এ পৃষ্ঠা গুলির কোনো সারমর্ম উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কিছু কিছু ভাবণ উচ্চ কবিত্ব মণ্ডিত বলে ধরা পড়লেও আজ আর সেগুলির স্থান-কাল-পাত্র উদ্ধার করা সম্ভব নয়। আশা করা যায়, কবি প্রাণরাম তাঁর শিবলীলা সিন্ধু কাব্য সম্পূর্ণ করেছিলেন ; কিন্তু বহু অন্বেষণ করেও কবির কাব্যের অনাবিষ্কৃত পৃষ্ঠা-গুলির কোনো সন্ধান মেলেনি। সুতরাং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এক প্রতিভাবান কবির পরিচয় পেয়েও তাঁর কাব্যের ওপর কোনো গবেষণার সম্ভাবনা থাকল না। অথচ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শিবায়ণ শ্রেণীর কাব্য অতি অল্পই রচিত হয়েছে।

*　　*　　*

বাংলা সাহিত্যে শিবায়ণ শ্রেণীর কাব্য-গুলির সঙ্গে কবি প্রাণরামের শিবমঙ্গল সিন্ধু কাব্যের খণ্ডিত পুথিটির তুলনামূলক আলোচনা বাতুলতা মাত্র, কারণ পুথিটির মাত্র অল্প কয়েকটি পৃষ্ঠাই আবিষ্কৃত হয়েছে। তবুও যে কয়টি পৃষ্ঠা পাওয়া গিয়েছে সেগুলির মাধ্যমেই শিবায়ণ কাব্যধারার বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়েছে। যেমন—প্রথমে দেব-দেবী-বন্দনা ও কবির আত্মপরিচয়। শিবায়ণ কাব্য-গুলিতে এর পর 'মধু কৈটভ বধ-উপাখ্যান' বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু কবি প্রাণরাম এখানে ত্রিপুরদৈত্যের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এর পর শিবায়ণ কাব্যগুলিতে ইন্দ্র সভায় শিব কর্তৃক নমস্কৃত না হয়ে দক্ষ প্রজাপতির ক্ষোভ, শিবহীন দক্ষযজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, দক্ষের বিড়ম্বনা, গৌরী রূপে হিমালয়ের গৃহে সতীর পুনরায় জন্মগ্রহণ ইত্যাদি অংশ মনে হয় প্রাণরামের কাব্যে ঠিকই ছিল। ঠিকই ছিল বলছি এই কারণে যে প্রাপ্ত পুথির ১২ থেকে ১৭ পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি; ১৮ পৃষ্ঠায় গৌরী রূপে হিমালয় গৃহে সতীর পুনর্জন্মগ্রহণের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এর পর শিবায়ণ কাব্য-গুলিতে পার্বতীর সাধনা ও শিবকে পতিত্বে বরণ ইত্যাদি অংশের পর শিব ও পার্বতীর লৌকিক কাহিনী বিবৃত হয়েছে। প্রাণরামের প্রাপ্ত পুথিতে এর পর ২০, ২৩ ও ২৪ পৃষ্ঠায় ছিন্নাংশ দুষ্পাঠ্য হয়ে পুথি খণ্ডিত হয়েছে।

যাই হোক, শিবায়ণ কাব্য ধারায় কবি প্রাণরামের অনাবিষ্কৃত পৃষ্ঠাগুলির সামঞ্জস্য অনুমান করলেও ভ্রান্তি থাকতে পারে। পুথিটির ১১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আলোচনায় দেখা গেছে, দেবগুরুর পরামর্শে দেবতাগণ মহাদেব সমীপে গমনকালে চিন্তা করেছিলেন, সতীর দেহত্যাগে মহাদেবের মন এখন বিক্ষিপ্ত।

এর পর প্রাপ্ত পুথির ১৮ পৃষ্ঠায় সতীর হিমালয় কন্যারূপে জন্ম গ্রহণের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আশা করা যায়, এবার কবি শিব-পার্বতী মিলনের পর দেবতাদের মহাদেবের কাছে দরবার করতে এনেছিলেন এবং প্রীত মহাদেব দেব কার্যে ত্রিপুর দৈত্যকে বধ করে 'ত্রিপুরারি' হয়েছিলেন।

*　　*　　*

এবার কবি প্রাণরাম ও তাঁর কাব্যের কালবিষয়ক আলোচনা। পুথিটির শেষ পৃষ্ঠার সন্ধান মেলেনি বলে কালজ্ঞাপক কোনো সূত্রের সন্ধান মেলে নি। তাহলেও কবির বংশ পরিচয়ের সূত্র ধরে তাঁর কাল সম্বন্ধে একটা আনুমানিক ধারণা করা যায়। কবি রামপ্রসাদ রায় (কবি জগন্নামের জ্যেষ্ঠ-পুত্র) দুর্গা পঞ্চরাত্রি কাব্যের সমাপ্তি সূচক শ্লোকে বলেছেন—দুর্গা পঞ্চরাত্রি কাব্য ১৭৭০ খৃঃ *তে শেষ হয়। এ সময় তাঁর বয়স ছিল বাইশ বছর।** সুতরাং কবি রামপ্রসাদের জন্ম ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে। কবি প্রাণরাম রামপ্রসাদের পিতৃব্য-পুত্র বিধায় রামপ্রসাদের সমসাময়িক কিংবা ২।৫ বছরের কনিষ্ঠ হতে পারেন। সুতরাং আনুমানিক বিচারে ১৭৫০ থেকে ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রাণরাম জন্মগ্রহণ করেন। কবি প্রাণরাম তাঁর কাব্যে কবি জগন্নাম রামপ্রসাদে দুর্গা পঞ্চরাত্রি ও রামায়ণে ১৭১২ শকাব্দ বা ১৭৯০-৯১ খৃঃ এর পর চিত হয়।*** তাই কবি প্রাণরামের শিবলীলাসিন্ধু নিঃসন্দেহে ১৭৯১ খৃঃ এর পর রচিত হয়েছিল। সুতরাং কবি প্রাণরামের শিবলীলা সিন্ধু কাব্যটি অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে রচিত হয়েছিল বলে ধরা যেতে পারে।

---

*"ভুজরন্ধ্র রসচন্দ্র সক পরিমাণে।
মাধব মাসেতে সুক্ল পক্ষ শুভদিনে॥

... ...

কাব্য দুর্গা পঞ্চরাত্রি গ্রন্থ সাঙ্গ হল্য।

সভাজনে সান্ত মনে হরি হরি বল ॥"—অনুলেখক : রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সন ১২৬০ সাল ১৯ আশ্বিন।

ভুজরন্ধ্ররসচন্দ্র=২৯৬১ অঙ্কস্য বামাগতি বলে ১৬৯২ শকাব্দ=১৭৭০ খৃষ্টাব্দ।

**"দ্বাবিংশতি বর্ষ মোর বয়ক্রম জবে।

এ কাব্য রচিল পিতার আজ্ঞা পায়্যা তবে ॥"—অনুলেখক ও সন তারিখ পূর্ব্ববৎ।

***"সপ্তদশ শতাব্দ দ্বাদশযুক্ত তাথে।

ফাল্গুনের শুক্ল পক্ষ তিথি পঞ্চমীতে ॥

... ...

দ্বিজ জগদ্রাম কাব্য করিল সম্পূর্ণ।

রামধ্বনি কর পাপ তাপ হোক শীর্ণ ॥—১৭১২ শকাব্দ=১৭৯০ খৃঃ।

—মুদ্রিত সংস্করণ রামপ্রসাদী জগদ্রামী রামায়ণ।

সম্পাদনা—অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

মানা মানা মানভূম ও ভূমযুক্ত অঞ্চল

তরুণদেব ভট্টাচার্য

অঙ্গ বঙ্গা মুদ্‌গরকাঃ অন্তর্গিরিবহির্গিরি।
তথা প্রবঙ্গ—বাঙ্গেয়া মানদা মানবর্ত্তিকাঃ ॥[১]

—মার্কেণ্ডেয় পুরাণ

হাজারিবাগ জেলায় দুধপানি পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে সংস্কৃত পদ্যে একটি লিপি খোদাই করা আছে। লিপিটি ছোট গল্পের মত। উদয়মান, ধৌতমানও অজিতমান, তিনভাই একসময় অযোধ্যা থেকে তাম্রলিপ্তে গিয়েছিলেন বাণিজ্য করতে।[২] বাণিজ্যে অনেক ধনসম্পত্তি উপার্জিত হয়েছিল। ফিরে চলেছিলেন দেশে। পথে ভ্রমরশাল্মলি নামে গ্রামে তারা বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। মগধের রাজা, আদিসিংহ তখন হাতি শিকারে বেরিয়েছিলেন। গ্রামবাসীদের কাছে তিনি অভলগক বা অভলগন নামে জিনিষ চেয়েছিলেন। জিনিষটি কি, বুঝতে পারছিলেন না গ্রামবাসীরা। উদয়মান সেটি এনে দিলে খুশী হয়ে উঠেছিলেন রাজা উদয়মানকে সেই অঞ্চলে একটি গ্রাম দান করেছিলেন। গ্রামবাসীরাও সানন্দে তাঁকে তাদের রাজা বলে মেনে নিয়েছিলেন।[৩] অপর দুই ভাইকেও দুটি গ্রাম দেওয়া হয়েছিল।

উদয়মানের বংশধরেরা কাহিনীটা পাহাড়ের গায়ে খোদাই করিয়ে রেখেছিলেন। ড. কীলহর্ণের মতে খোদাই করা হয়েছিল আট শতকে। যদিও ঘটনাটা ঘটেছিল আরও অনেক আগে।

চারশো বছর পরেও যে মানবংশের বিলুপ্তি ঘটেনি, আর একটা পাথরের লিপিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেটা পাওয়া গিয়েছিল গয়া জেলার গোবিন্দপুর গ্রামে। নওয়াদা মহকুমার ভেতর গোবিন্দপুর ছোট গ্রাম। লিপিটা ছিল নরসিংহ মালির বাড়ি। কানিংহাম সাহেব রাবিং সংগ্রহ করে ড. ফ্লিটের কাছে পাঠিয়েছিলেন। পাঠোদ্ধারের জন্য ড. ফ্লিট পাঠিয়েছিলেন অধ্যাপক কীলহর্ণের কাছে।[৪]

লিপির ভাষা ছিল সংস্কৃত। অক্ষর অদ্ভুত ধরণের মাগধী। লিপিকাল ১০৫৯ শক বা ১১৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দ। রচয়িতা ছিলেন কবি গঙ্গাধর। আরও ছ'জন মগ ব্রাহ্মণ কবির কথা লিপিটাতে উল্লেখ করা হয়েছিল। তাদের হদিস পাওয়া যায় 'সদুক্তি কর্ণামৃত' গ্রন্থে। ড কীলহর্ণ 'সদুক্তি কর্ণামৃতের' শ্রীধর দাসের সঙ্গে গঙ্গাধরকে সনাক্ত করেছিলেন।

গঙ্গাধর ছিলেন মানবংশের রাজা রুদ্রমানের মন্ত্রী ও বন্ধু। এগারো শতকের শেষ ও বারো শতকের প্রথম দিকে মগধের রাজা ছিলেন বর্ণমান ও তার পুত্র রুদ্রমান। এ পর্যন্ত এ তথ্য অজানা ছিল। বর্ণমানের পরে কোন এক সময়ে সম্ভবত মগধ থেকে মানবংশের শাসন উচ্ছিন্ন হয়েছিল। কারণ গঙ্গাধর লিখেছেন, এসময় মানবংশের চন্দ্র, রাজা রুদ্রমানের জন্ম হয়েছিল। তিনি বরাহ-অবতারের মত বিপদসঙ্কুল সমুদ্রের মধ্য থেকে নিজ রাজ্য উদ্ধার করেছিলেন।[৫]

দুধপানি পাহাড়ের গায়ে লেখা অজিতমান ও তার দুই ভাইয়ের সঙ্গে মগধের রাজ বর্ণমান ও রুদ্রমানের সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে।[৬] মানভূম, সিংভূম উড়িষ্যার সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে মানরাজাদের শাসন যে খ্রীষ্টীয় ছয় শতকে বিস্তীর্ণ ছিল সে বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ছয় শতকের শেষ ও সাত শতকের প্রথম দিকে উত্তর ও দক্ষিণ

তোষলীতে অধীশ্বর ছিলেন মহারাজা শম্ভুযশ। তিনি ছিলেন মানবংশের সন্তান, গোত্র মুদ্গল বা মৌদগল্য। উত্তর তোষলীতে তাঁর সামন্ত রাজা ছিলেন সোমদত্ত।[৭] দক্ষিণ তোষলীতে শিবরাজা।[৮]

মেদিনীপুরের একাংশ, মানভূম, সিংভূম ও বালেশ্বর অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল উত্তর তোষলী। কেউ কেউ অনুমান করেছেন উত্তর তোষলীই ছিল প্রাচীন উৎকল রাজ্য। খ্রীষ্টীয় ৫৭৯ অব্দে মানবংশের মহারাজা পরম ভট্টারক শম্ভুযশ ছিলেন সেখানকার রাজা। ছ'শো দুই খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ তোষলীও তাঁর রাজ্যভুক্ত হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[৯] সম্ভবত কটক, পুরী, গঞ্জাম এলাকা নিয়ে গঠিত ছিল দক্ষিণ তোষলী।

ঘটনাবলী থেকে মনে হয় ছয় শতকের শেষ দিকে উড়িষ্যার উপকূলভাগের ওপর আধিপত্য নিয়ে বিগ্রহ ও মানবংশের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হয়েছিল। বিগ্রহ বংশ প্রথমে উত্তর তোষলী ও পরে দক্ষিণ তোষলী থেকে মানদের কর্তৃত্ব উচ্ছিন্ন করেছিলেন।

গৌড়ে শশাঙ্কের অভ্যুদয় ঘটেছিল সাত শতকের প্রথম দিকে। তিনিই প্রথম মানদের আঘাত করেছিলেন।[১০] কারণ তাঁর রাজ্য পুরী ও গঞ্জাম জেলার মাঝামাঝি সীমানা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়েছিল। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর কঙ্গোদের শৈলোদ্ভব সামন্ত রাজারা স্বাধীন হয়ে উঠেছিলেন। বালেশ্বর কটক অঞ্চলে আধাস্বাধীন হয়ে উঠেছিলেন দত্ত-সামন্তেরা। শশাঙ্কের আঘাত মানদের আধিপত্যে যে ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল, পরবর্তীকালেও তাঁরা আর তা থেকে নিরাময় হয়ে, হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করতে পারেননি। এবং সেই বিধ্বংসের ওপরেই শৈলোদ্ভব, বিগ্রহ ও দত্ত-সামন্তেরা তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন।

ভাগ্য বিপর্যয় ও রাজ্যহীনতার দুর্ভাগ্য মানদের আচ্ছন্ন করলেও, প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত রাজবংশ হিসেবে গুরুত্ব কম ছিল না। বাংলা ও উড়িষ্যার নতুন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী শাসক বংশগুলো তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে পরবর্তী সময়েও দীর্ঘকাল ধরে আগ্রহী ছিলেন। দশম শতকের মাঝামাঝি ভৌমকর বংশের রাজা দ্বিতীয় শান্তিকর মানবংশের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। সে কন্যা ছিলেন রাজা সিংহমানের মেয়ে হীরামহাদেবী।[১১]

পুরুলিয়া জেলার পূর্বনাম মানভূম। পুরুলিয়া জেলায় ও সংলগ্ন অঞ্চলে মান নামাঙ্কিত একাধিক স্থান ও জনগোষ্ঠী নির্দেশ করে একসময় প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত মানজনগোষ্ঠীর আবাসস্থল ছিল মানভূম। তারা কোথা থেকে এসেছিলেন, কতদিন এ অঞ্চলে আধিপত্য করেছিলেন, পরবর্তীকালে কোন্ কোন্ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলেন, সেসব বিষয়ের সুস্পষ্ট সূত্র পাওয়া যায় না।

কেউ কেউ অনুমান করেছেন 'মান' একটি রাজবংশের নাম।[১২] রাজবংশটি একসময় মানভূম ও তৎসংলগ্ন উড়িষ্যা অঞ্চলে রাজত্ব করতেন।[১৩] তাদের নাম অনুসারেই সম্ভবত এ অঞ্চলের নাম হয়েছিল মানভূমি বা মানভূম[১৪] অর্থাৎ মান ও মানভূম নাম ছয় ও সাত শতকের সময়েই প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। ওড্র জাতির একটি শাখা হিসেবেও মানবংশ অনুমিত হয়েছিল। তাদের আদি বাসভূমি ছিল মানভূম-ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে। এ অনুমান যথার্থ বলে গ্রহণ করলে উড়িষ্যার উপকূল অঞ্চলে ছয় সাত শতকে ওড্র জাতির জনপ্রিয়তার বিষয়টাও সঠিকভাবে ব্যাখ্যাত হতে পারে বলে মন্তব্য করা হয়েছে।[১৫]

প্রকৃতপক্ষে মান নাম, মানজাতি ও তাদের উৎপত্তিক্ষেত্র সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ বিদ্যমান। অধ্যাপক মিরাশি অনুমান করেছিলেন 'মান' পদবীযুক্ত

রাজারা ছিলেন রাষ্ট্রকূট বংশের একটা শাখা। তাঁরা চার থেকে ছয় শতকের মধ্যে মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলার কিছু অংশ শাসন করতেন।[১৬] আদি পুরুষ ছিলেন মানাঙ্ক। তাঁদের তিনটি তাম্রপট্ট আবিষ্কৃত হয়েছে।[১৭] মানাঙ্কের রাজত্বকাল ছিল চার শতকের শেষ দিকে।

প্রায় এক শতাব্দী পরে তাঁর প্রপৌত্র অভিমন্যু সেখানে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। রাজধানীর নাম ছিল মানপুর বা মনপুর। অভিমন্যু প্রপিতামহের নাম অনুসারে সম্ভবত রাজধানী নামকরণ করেছিলেন। মানপুর সাতারা জেলায় মান মহকুমায় অবস্থিত। এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ভীম নদীর শাখার নাম মানগঙ্গা।

বংশটি সাতারা জেলায় প্রায় আড়াইশো বছর রাজত্ব করেছিলেন। মানাঙ্কের পুত্রের নাম ছিল দেবরাজা। দেবরাজার তিন ছেলে ছিল। তাদের মধ্যে বড় ছেলের নাম জানা যায় না। শ্রীদীক্ষিত অনুমান করেছিলেন তার নাম ছিল মানরাজা।[১৮] কারণ দেবরাজার পত্নী ও রানী ছিলেন স্বাভঙ্গীল মহাদেবী। তিনি ছিলেন মানরাজার মা।

মানাঙ্ক বিদর্ভ, অশ্মক ও কুন্তল রাজ্য জয় করেছিলেন।[১৯] অর্থাৎ উত্তর কানাড়া জেলা, মহীশূর, বেলগাঁও ও ধারওয়ারের কিছু অংশ তাঁর অধিকারভুক্ত হয়েছিল। মানপুর নগর কেন্দ্র করে মানাঙ্ক যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, মধ্যযুগের প্রথমদিকে সেটা মানদেশ নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিল।[২০] মানদের আধিপত্য সম্ভবত মানভূম, সিংভূম ও উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়েছিল। ময়ূরভঞ্জ জেলার উত্তরাংশে খিচিংয়ে অধিষ্ঠিত ছিল তাদের শাসনকেন্দ্র।

বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা ও পুরুলিয়া জেলায় মান আধিপত্যের নানা চিহ্ন আজও বিদ্যমান। এক পুরুলিয়া জেলাতেই মানপুর নামে সাতটা গ্রাম আছে।[২১] বারো শতকের শেষ দিকে বীরভূম জেলায় মানপতি নামে এক রাজাকে পরাজিত ক'রে সে অঞ্চলে মুসলমান আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল বলে প্রবাদ আছে।[২২] বাঁকুড়া জেলার রায়পুর অঞ্চলে মান ছত্রী নামে জনগোষ্ঠী আজও বসবাস করেন।[২৩] মেদিনীপুর জেলায় চন্দ্রকোনার প্রাচীন নাম ছিল মানা।[২৪] যে চব্বিশটা পরগণা নিয়ে চব্বিশ পরগণা জেলা গঠিত, তাদের মধ্যে একটার নাম ছিল মানপুর।[২৫] বর্ধমান জেলার মানকরের কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

পুরুলিয়া জেলার মানবাজার ও পুঞ্চা থানা এবং বাঁকুড়া জেলার খাতড়া থানার বহু গ্রামে মানা-বাউরি নামে এক প্রাচীন জনগোষ্ঠী বসবাস করেন।[২৬] বুধপুর, টুংশামা, পাকবিড়রা ঘিরে একসময় তাদের ঘন সন্নিবেশ ছিল। এই সমস্ত অঞ্চলে মন্দির, মূর্তি ও অসংখ্য পুরাকীর্তির বিস্তীর্ণ ধ্বংসচিহ্ন আজও ছড়িয়ে আছে। উনিশ শতকের শেষদিকেও মানবাজারের রাজারা 'মানাবনীনাথ' বলে পরিচয় দিতেন।[২৭]

উত্তরে বীরভূম, দক্ষিণে উড়িষ্যা রাজ্যের ভঞ্জভূম বা ময়ূরগঞ্জ, পূবে বাঁকুড়া জেলার মধ্যে অধিষ্ঠিত মল্লভূম এবং পশ্চিমে বিহার রাজ্যভুক্ত সিংভূম ও নাগভূমের মধ্যবর্তী অরণ্য প্রদেশ ভূমযুক্ত অনেকগুলো ছোট ছোট অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। অঞ্চলগুলোর অধিবাসীরা ছিলেন ছোট ছোট পৃথক জনগোষ্ঠীতে বিভক্ত। তাদের নামের সঙ্গে 'ভূম' যুক্ত হয়ে সেসব অঞ্চল পরিচিত হয়ে উঠেছিল।

তিনটি রাজ্যের সীমান্ত দিয়ে ঘেরা এই বিস্তীর্ণ অরণ্য অঞ্চলে এতগুলো ভূমযুক্ত অঞ্চল উদ্ভূত হবার কারণ কি? যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলো এখানকার অধিবাসী তাদের উদ্ভব হয়েছিল কখন? কিভাবে তারা এখানে এভাবে সন্নিবেশিত হয়েছিল? এরা কি একদা কোন বৃহৎ সমৃদ্ধ একাধিক জনগোষ্ঠীর বিলুপ্তপ্রায় বংশধর? রাজাহীন হবার পর পলাতক

ও আত্মগোপনকারী রাজবংশের শাখা? দীর্ঘকাল ধরে বন্য জীবনযাপন করার ফলে অধঃপতিত? প্রাচীন ও বৃহৎ আদিমতম অধিবাসীদের সেইসব সচেতন ও অহংকৃত বংশধর যারা তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও জীবনযাপনের বৈশিষ্ট্য টিকিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর হয়ে এসে এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন?— এসব নিয়ে ব্যাপক ও গভীর অনুসন্ধান আজও পর্যন্ত অনুপস্থিত।২৮

পশ্চিমবাংলার উত্তর পশ্চিমে বীরভূম। বর্তমান বীরভূম জেলা। বীরভূম জেলায় প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে 'বীরভূম' নামটা উদ্ভূত হয়েছিল 'বীর' পদবীযুক্ত প্রাচীন হিন্দু রাজার বংশ অনুসারে। যেমন উদ্ভূত হয়েছিল মানভূম, সিংভূম, ধলভূম ইত্যাদি নাম। মুণ্ডারি ভাষায় 'বির্' শব্দের অর্থ জঙ্গল। ব্লকম্যান অনুমান করেছিলেন 'বিরভূম' অর্থে বীরভূমের বনাঞ্চলকে চিহ্নিত করত।২৯ রাজমহল পাহাড়ের দক্ষিণাঞ্চলে 'বিরহড়' নামে একটা উপজাতি আজও বসবাস করেন। তাদের নাম অনুসারেও স্থানটা এক সময় পরিচিত হয়ে উঠতে পারে।

বীরভূমের পাশে ছিল সেনভূম। বীরভূম ও সেনভূম দুটো অঞ্চলের অবস্থিতিই অজয়নদের বামতীরে। বাংলায় সেনরাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয় সেনের পিতামহ সামন্ত সেন কর্ণাট থেকে প্রথম এসেছিলেন বাংলায়। শেষ বয়সে তিনি গঙ্গাতীরে হোমধূম সুগন্ধী ঋষিদের বাসস্থানে বিচরণ করে বেড়াতেন।৩০ সামন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন বর্ধমানভুক্তির কোন এক জায়গায় স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। সেনভূমিই ছিল সম্ভবত বিজয় সেন প্রতিষ্ঠিত সেই রাজ্য। সেনদের নামে অঞ্চলটা সেনভূম নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিল।

পাল সম্রাট রামপালের সময় তৈলকম্প বা তেলকুপির রাজা ছিলেন রুদ্রশিখর। দামোদরের তীরে তেলকুপির অবস্থিতি বর্তমান পুরুলিয়া জেলায়। শিখরভূম নামে এ অঞ্চল পরিচিত ছিল। এক সময় শিখরভূমের ব্যাপ্তি ছিল বহুদূর জুড়ে। পরবর্তীকালে সঙ্কুচিত অঞ্চল হিসাবে শিখরভূম বর্ধমানের পশ্চিমদিকে দামোদর ও অজয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে কোণাকুণিভাবে বিস্তীর্ণ ছিল। ব্লকম্যান শেরগড়ের সঙ্গে শিখরভূমকে সনাক্ত করেছিলেন। শেরগড়ের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত ছিল এখনকার রাণীগঞ্জ এলাকা।৩১

অজয়নদের বামতীরে যেমন ছিল সেনভূম, দক্ষিণতীরে তেমনি ছিল গোপভূম বা গোপীভূম। মধ্যযুগের ধর্মমঙ্গল কাব্যে গোপ রাজা ইচ্ছাই ঘোষের সঙ্গে লাউসেনের যুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।৩২রামগঞ্জ তাম্রপট্টে ঈশ্বর ঘোষ নামে এক সামন্ত রাজার কথা পাওয়া যায়। তার সময়কাল এগারো শতক বলে অনুমিত হয়েছিল। গোপভূম বলতে বর্ধমান জেলার আউসগ্রাম থানা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল আজও চিহ্নিত করে। ইচ্ছাই ঘোষের দেউল নামে একটি মন্দির বর্ধমান জেলার গৌরাঙ্গপুরে আজও দাঁড়িয়ে আছে।৩৩

বাঁকুড়া জেলার উত্তর পশ্চিমে ক্ষুদ্র ও প্রাচীন রাজ্য ছিল সামন্তভূম। পরবর্তীকালে শিখরভূমের অন্তর্গত ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল এটা। বাঁকুড়া জেলার ছাতনা অঞ্চল ও মেদিনীপুর জেলার শিলদা পর্যন্ত এলাকা এক সময় ছিল সামন্ত ভূমের অন্তর্গত। পুরনো দলিল দস্তাবেজে এই এলাকা এখনও সামন্তভূম নামে চিহ্নিত হয়ে আছে।৩৪

সামন্তভূমের দক্ষিণপূর্বে ছিল মল্লভূম। বাংলার পশ্চিম সীমান্তে প্রাচীন ও ক্ষুদ্র রাজ্য। রাজধানী ছিল বিষ্ণুপুর। ইংরেজ আমলের প্রথমদিকে মল্লভূম বলতে বোঝাত ছাতনা বাদে বাঁকুড়া, ওঁদা, বিষ্ণুপুর, কোটালপুর ও ইন্দাস থানা এলাকা। ষোল শতকের শেষ ও সতের শতকের প্রথম দিকে মল্লভূম বা মল্লরাজ্যের সীমানা ছিল বহু বিস্তৃত। আকবরের সেনাপতি মানসিংহের সহযোগিতায় মল্লরাজা হাম্বির মল্লভূমের আয়তন অনেক বাড়িয়ে

নিয়েছিলেন। সাঁওতাল পরগণার দামিন-ই কোহ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল উত্তরসীমা, দক্ষিণসীমা পরিব্যাপ্ত ছিল বর্তমান মেদিনীপুর জেলার উত্তর, উত্তর পশ্চিমাংশ পর্যন্ত, পূর্বে বর্ধমানের কিছুটা অংশ, পশ্চিমে ছোটনাগপুর সন্নিবিষ্ট পাঁচেট রাজ্য।[৩৫]

মল্লভূমের দক্ষিণপূর্বে ছিল ব্রাহ্মণভূম। একে বলা হত আরাঢ়া বা আড়ঢ়া ব্রাহ্মণভূম। সম্ভবত রাঢ়দেশের বহির্ভূত ছিল এই অঞ্চল। ১৮০১ সালের পূর্ব পর্যন্ত ব্রাহ্মণভূম ছিল বর্ধমান জেলার ভেতর। পরে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কুলাখ্যান পত্র অনুসারে উমাপতি ভট্টাচার্য নামে এক ব্রাহ্মণ নবম শতকের মাঝামাঝি সময়ে এখানে এসে বসবাস সুরু করেছিলেন। এই বংশের ত্রিলোচনদেব ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণভূম রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ব্রাহ্মণভূমের অন্যতম রাজা ছিলেন রঘুনাথ দেব। কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ছিলেন তার অধ্যাপক। রঘুনাথদেবের পিতা রাজা বাঁকুড়া রায়ের সময় 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচিত হয়েছিল।[৩৬]

রাঢ় দেশের পূর্বান্তে ছিল শূরভূম রাজ্য। আইন-ই-আকবরীতে বলা হয়েছে, দওয়ার সোরভূম, সরকার জলেশ্বরের অন্তর্গত। শূরভূমের কথা অপর তিনটি উৎস থেকেও পাওয়া যায়। রণশূরের কথা পাওয়া যায় রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপিতে। সন্ধ্যাকর নন্দীর রাম-চরিতম্‌-এ পাওয়া যায় লক্ষ্মীশূরের কথা, দামশূরের কথা পাওয়া যায় তার লিপিতে। লিপি অনুসারে অনুমিত হয় হুগলী জেলার বিশেষত বর্তমান আরামবাগ মহকুমা জুড়ে বিস্তীর্ণ ছিল শূরভূম রাজ্য।[৩৭]

আইন-ই-আকবরীতে সরকার মান্দারণের অন্তর্গত ভাওয়ালভূমের উল্লেখ পাওয়া যায়। স্টারলিং বিষ্ণুপুরের অধীন বালভূম বলে উল্লেখ করেছেন। ভূমযুক্ত এই অঞ্চলটার অবস্থিতি এখনও পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে সনাক্ত করা যায়নি।

সিংভূম জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিপূর্বে ছিল ধবলভূম রাজ্য। রাজ্যটির মোট আয়তন ছিল এক হাজার একশো সাতাশি বর্গমাইল। তার ভেতর প্রায় তের বর্গমাইল এলাকা ছিল বর্তমান মেদিনীপুর জেলার ভেতর। বারোটা তরফে বিভক্ত ছিল রাজ্যটা। রাজধানী ছিল প্রথমে ঘাটশীলা, পরে স্থানান্তরিত হয়েছিল নরসিংহগড়ে। রাজ্যের উত্তরে ছিল মানভূম, দক্ষিণে ময়ূরভঞ্জ, পূবে মেদিনীপুর জেলা ও পশ্চিমে সরাইকেলা রাজ্য। এখানকার রাজারা ছিলেন ধবল বা ধোপা জাতীয়। ডালটন অনুমান করেছিলেন এরা ভূমিজ। ধলভূম বা ধবলভূম পরবর্তীকালে সম্ভবত পঞ্চকোটের সামন্তরাজ্যে পরিণত হয়েছিল।

ইংরেজ আমলের প্রথমদিকে (১৭৬৭ খ্রী) ধলভূমের বিরুদ্ধে যে সামরিক অভিযান প্রেরিত হয়েছিল, ধলভূমের রাজা জগন্নাথ ধল তা সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করেছিলেন। ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত ধলভূম ছিল মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত। পরে মানভূম জেলা গঠিত হলে মানভূমের অন্তর্গত হয়েছিল। ১৮৪৫ সালে ধলভূমকে সিংভূম জেলার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছিল।

ধলভূম রাজ্যের যে অংশ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ছিল, তা জামবনী রাজবংশ নামে পরিচিত। এদের রাজধানী চিল্‌কিগড়ে।[৩৮]

মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমসীমান্ত এবং পুরুলিয়া জেলার পূর্বান্ত জড়িয়ে একসময় তুঙ্গভূম নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। রোহিতগিরির তুঙ্গদের কোন এক শাখা সম্ভবত এখানে এসে একটা ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তুঙ্গদের কয়েকটি তাম্রপত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।[৩৯]

মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণে ভূমযুক্ত আরও দুটি অঞ্চলের কথা পাওয়া যায়। একটি

আদিত্যভূম অপরটি বাগভূম বা বাঘভূম। ইংরেজদের পুরানো নথিপত্রে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত জঙ্গলমহলের একাংশকে আদিতভূম বলে উল্লেখ করা হত যা সম্ভবত আদিত্যভূমেরই অপভ্রংশ। পরমানন্দ আচার্য অনুমান করেছিলেন।[৪০] পাতকুমের রাজ-পরিবারের এক শাখা এখানে রাজত্ব করতেন। কারণ পাতকুমের 'আদিত্য' পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিক্রম। আদিত্য পরিবারের পদবী অনুসারে অঞ্চলটি আদিত্যভূম নামে পরিচিত হয়ে উঠতে পারে।

বাঘভূম বা ব্যাঘ্রভূমিও সঠিকভাবে সনাক্ত করা যায়নি। কেউ কেউ অনুমান করেছেন [৪১] বাঘভূমির অবস্থিতি ছিল মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চলে। সমুদ্রগুপ্তের লিপিতে উল্লিখিত ব্যাঘ্ররাজের সঙ্গে ব্যাঘ্রভূমির সম্পর্ক ছিল বলেও অনুমান করা হয়েছে।

পুরুলিয়া জেলার পুরনো নাম ছিল মানভূম। মান[৪২] নামটি প্রাচীন মান রাজবংশের নাম থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল। মহারাষ্ট্রের মানঅধিকৃত অঞ্চলের নাম যেমন হয়ে উঠেছিল মানদেশ, এখানেও তেমনি মানদের অধিষ্ঠান ক্ষেত্রের নাম হয়েছিল মানবাজার ও মানপুর। ইংরেজ আমলে একদা মান আধিপত্যে সমগ্র অঞ্চলটা মানভূম নামে অধিকতর পরিচিতি লাভ করেছিল।

মানবাজারের দক্ষিণ পশ্চিমে ছিল বরাহভূম রাজ্য। সাম্প্রতিক বরাভূম পরগণা। বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথের আসানসোল সিনি শাখার বরাভূম রেলস্টেশন থেকে বারো মাইল দক্ষিণ পূর্বে বরাবাজার। পাতকুম রাজবংশের শাখা সম্ভবত ছিলেন বরাভূম পরগণার অধীশ্বর। তাদের অধিষ্ঠানক্ষেত্র ছিল বরাবাজারে। পরবর্তীকালে বরাভূম পরগণা পঞ্চকোট রাজার অধীনস্থ জমিদারীতে পরিণত হয়েছিল।

মানভূম বা পুরুলিয়া জেলার দক্ষিণে সিংহভূম বা সিংভূমি। সম্ভবত পোড়াহাটের সিংহ রাজাদের পদবী অনুসারে তাদের অধীনস্থ অঞ্চল সিংভূম নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। পোড়াহাট, সরাইকেলা ও খারসওয়াঁর রাজারা সকলেই ছিলেন একই বংশোদ্ভূত। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে (১৮২০খ্রী) পোড়াহাটের রাজা ইংরেজদের অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন, ফলে সিংভূম কোম্পানির রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

পুরুলিয়া জেলার পশ্চিমে ছিল নাগভূম। নাগভূম প্রকৃতপক্ষে ছিল ছোটনাগপুরের নাগবংশীয় রাজাদের প্রশাসন ক্ষেত্র। কেউ কেউ নাগভূমের সঙ্গে বিহার রাজ্যের বর্তমান রাঁচি জেলাকে সনাক্ত করে থাকেন।[৪৩]

ভূমযুক্ত অঞ্চলগুলোর সর্বোত্তরে যেমন ছিল বীরভূম, সর্ব দক্ষিণে তেমনি ছিল ভঞ্জভূম বা ময়ূরভঞ্জ।

উড়িষ্যা প্রদেশে দেশীয় রাজ্যগুলোর মধ্যে ময়ূরভঞ্জ ছিল বৃহত্তম। ইংরেজ আমলে আয়তন সঙ্কুচিত হয়ে এলেও মোট এলাকা ছিল চার হাজার দুশো তেতাল্লিশ বর্গমাইল। উত্তরে মেদিনীপুর ও সিংভূম জেলা, পূর্বে মেদিনীপুর ও বালেশ্বর, দক্ষিণে বালেশ্বর জেলা ও নীলগিরি এবং কেওঞ্জর রাজ্য, পশ্চিমে কেওঞ্জর ও সিংভূম জেলা।[৪৪]

ময়ূরভঞ্জ যা ভঞ্জভূম নামেও কখনও কখনও পরিচিত হয়ে উঠেছিল, উহা ছিল প্রাচীন রাজ্য। শিলালেখে ভঞ্জবংশের হদিস পাওয়া যায় চার পাঁচ শতকে। জনশ্রুতি অনুসারে ভঞ্জবংশ ময়ূর রাজ্য জয় করে নিলে ময়ূরভঞ্জ নাম ও রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল। ময়ূর রাজ্যের প্রতীক ছিল ময়ূর। ভঞ্জদের শীলমোহরে ষাঁড়, বরাহ ও ময়ূর প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত থাকত।

উত্তরে বীরভূম থেকে দক্ষিণে ভঞ্জভূম পর্যন্ত, একদা বিস্তীর্ণ অরণ্য এলাকায় 'ভূমযুক্ত'

এই আঠারোটা ক্ষুদ্র বৃহৎ অঞ্চলের হদিস পাওয়া যায়। অঞ্চলগুলো ছিল আদিবাসী ও উপজাতি কোমদের আবাসস্থল। তাদের মধ্যে পলাতক রাজবংশের বংশধরেরাও থাকতে পারেন। বিভিন্ন সময়ে পার্শ্ববর্তী শক্তিশালী রাজ্যের নামেমাত্র অধীনতায় থাকত অঞ্চলগুলো। তাম্রপট্ট ও প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে এ অনুমান সমর্থিত হয়।

দ্বিতীয় বিনীত তুঙ্গের তাম্রপট্টে দেখা যায়, তিনি ছিলেন মহারাজা, রাণক ও গোণ্ডাধিপতি বা আঠারোটা গোণ্ড বা উপজাতির অধীশ্বর।[১৫] সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতম্'-এ লক্ষীশূরকে অটবী বা অরণ্যপ্রদেশের সামন্তচক্রের চূড়ামণি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৬] যদিও সেখানে সামন্তদের সংখ্যা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

বাংলার পশ্চিম সীমান্তবর্তী জেলাগুলো বিশেষত বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর ও বর্ধমানের উত্তর পশ্চিমাংশের অধিবাসীদের বসতি, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও দৈনন্দিন জীবনযাপনের ধারা যথাযথভাবে বুঝতে গেলে ভূমযুক্ত এই অঞ্চলগুলোর অধিবাসীদের স্বরূপও গভীরভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। কারণ এদের মিলনমিশ্রণ ও সাংস্কৃতিক বিনিময় ও সমন্বয়ের মধ্যেই বর্তমান অধিবাসীদের আচার আচরণ, ধর্ম ও সংস্কার, আহার ও পোশাক পরিচ্ছদের মূল সূত্রগুলো নিহিত রয়েছে। এবং যেহেতু পুরুলিয়া জেলা সীমান্তের সবচেয়ে সমীপবর্তী, জেলাসদর ছাড়া শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনুপ্রবেশ অভ্যন্তরীণ অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে অনুপস্থিত ছিল, এখানে এই সূত্রগুলো এখনও অনেক অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান।

পাদটীকা

১। অঙ্গ—পূর্ব বিহার। বঙ্গ—দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ। মুদগরকা—বর্তমান মুঙ্গের, উৎকীর্ণ লিপিতে মোদাগিরি।

কোন কোন পুরাণে শেষ শব্দ দুটি আছে মালদা 'মল্লবর্তকা।' ডঃ ডি. সি. সরকার অনুমান করেছেন মার্কণ্ডেয় পুরাণের শেষ শব্দ দুটি প্রক্ষিপ্ত। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, মান রাজাদের রাজ্য মানভূম, সিংভূম ও উড়িষ্যা অঞ্চলে বিস্তীর্ণ ছিল। আরও স্মরণীয়, অধুনালুপ্ত ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে মানদা নামে একটি প্রাচীন স্থান আছে এবং সেখান থেকে রাস্তা তৈরির সময় বহু প্রাগৈতিহাসিক অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়েছিল। দ্রষ্টব্য, History of Orissa, vol. I, R. D. Banerji, pp. 34-35

২। অথ কস্মিশ্চি(ন্ন)ময়ে বাণিজ্যে ভ্রাতরস্ত্রয়ঃ।

তাম্রলিপ্তি (ম) যোধ্যায়া যয়ু পূর্বর্বনিজ্জয়া॥—Dudhpani Rock Inscription of Udayamana by Prof. F. Kielhorn, Epigraphia Indica, vol. II, pp. 343-47,

৩। দ্রষ্টব্য ২।

৪। Sir A. Cunningham লিপিটির rubbing সংগ্রহ করেছিলেন অক্টোবর ১৮৮৩ সালে।

পাঠোদ্ধার করে Prof. Keilhorn লিপিবদ্ধ করেছিলেন ১৮৯৪ সালে। দ্রষ্টব্য, E. I. vol. II, pp. 330-342.

৫। তদন্তরে মাননরেন্দ্রচন্দ্রমাঃ স রুদ্রমানোজনি যেন ভূভুজা। স্বমেদিনীমণ্ডলমাদিকীলবহ (হ্ব) দাদমিত্রাগুনিধেং সমদ্ধৃতং ॥ ২৪। দ্রষ্টব্য, পাদটিকা ৪।

৬। "Unfortunately there is no other reference to this family of rulers, though it is possible to imagine some connections with Mana brothers who had come much earlier to the Court of Adisinha, the king of Magadha and were granted three villages,in Hazaribagh district"— The Comprehensive History of Bihar, vol. I, pp. 271-72, by K. P. Jaiswal.

৭। Four Copper Plates from SORO—N. G. Majumdar, E. I. vol. XXII. ডঃ ডি. সি. সরকারের মতে শম্ভুযশের পট্টটির সময়কাল ৫৭৯ খ্রী। ডঃ এন. জি. মজুমদারের অভিমত ছিল ৫০৮-৯ খ্রীষ্টাব্দ।

৮। Epigraphia Indica, vol. IX.

৯। Studies in the Geography of Ancient and Medieval India—Dr. D. C. Sircar, Calcutta, 1960, p. 176, এবং History of Orissa—RDB. vol. I, p. 118.

১০। "He (Sasanka) extended his authority over Magadha. He defeated the Mana ruler and made himself master over Dandabhukti, Utkala and Kongoda, corresponding roughly to Midnapore, and northern and southern Orissa."— The Comp. History of Bihar, vol. I, Pt. II.

১১। Dr. D. C. Sircar—Studies etc. p. 176.

১২। ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার, সাক্ষাৎকারে বিবৃত, কলকাতা ২৯. ৮. ১৯৮২। মানভূম বা পুরুলিয়া নিয়ে এ পর্যন্ত আলোচনা হয়েছে খুব কম। প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে সামান্য আলোচনা করেছেন ডঃ সরকার ও শ্রীসুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

১৩। "The Manas appear to have been ruling over the present Manbhum-Singbhum region together with the adjacent areas of Orissa,—Studies etc, 176.

১৪। "The name of the present Manbhum or Manbhumi seems to have been derived from the rulers of this Mana family, also known from a few other records,"—Studies etc. অন্যদিকে মি. নন্দলাল দে অনুমান করেছেন, "Manbhum is evidently derived its name from Mahavira who was called the "Venerable Ascetic Mahavira"—Indian Historical Qtrly, vol. IV, p. 45.

১৫। "If those Manas be regarded as belonging to the Udra clan, we may explain the popularity of the name Udra in the sense of the whole coastal Orissa from the sixth or seventh century."—Studies etc.

১৬। The Rastrakutas of Manpura—Prof. V. V. Mirashi, Baroda Oriental Research Institute, vol XXV, pp. 36-50, মানদের রাজত্বকাল ছিল আ ৩৭৫ খ্রী থেকে ৫৫০ খ্রী। ডঃ ডি সি. সরকার অবশ্য এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন।

১৭। তাম্রপট্টগুলি (১) Undikavalika grant—JBBRAS, vol. XVI (২) Pandurangpalli Plate—Mysore A. R. 1929 ও (৩) Gokak Plate—E. I. vol. XXI.

১৮। Hingi Berdi Plates of Rashtrakuta Vibhuraja—M. G. Dikshit, E-1 vol. XXIX.

১৯। A. B. O. R. I. vol. XXV. p. 36 & also Studies p. 153 ডঃ সরকার মানাঙ্কের সময় অনুমান করেছেন ৫ম শতকের শেষদিকে।

২০। 'মানদেশ-সংবদ্ধ-ভেলাপুর, মানদেশ-সংবদ্ধ সর্বাধিকারী ব্রহ্মদেব রানা' —ভেলাপুর লিপি (১৩০০-১৩০৫ খ্রী)—ডঃ ডি. সি. সরকার কর্তৃক উদ্ধৃত। Studies, p. 159

২১। নেতুড়িয়া থানা (জে. এল. নং ৩১৭); সাঁতুড়ি থানা (জে. এল. ৩৮২); কাশীপুর থানা (জে.এল. ৫২); হুড়া থানা (জে এল. ৪৮৯); মানবাজার (জে.এল.৩১১); বরাবাজার (জে.এল. ৪৪); আড়ষা থানা (জে. এল. ১৫৯)—সবকটি গ্রামের নাম মানপুর। এছাড়া আছে মানটাঁড়, মানজুড়ি, মানগ্রাম, মানকিয়ারি, মানঝোপড়, মানএড়া ইত্যাদি।

২২। বীরভূম জেলার রামপুরহাট থানার অন্তর্গত মাড়গ্রাম অঞ্চলে মানপতির আধিপত্য ছিল বলে কথিত হয়।

২৩। 'বাঁকুড়া'—তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃ. ২১৭-২২০।

২৪। 'মেদিনীপুর'—তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃ. ১৬১।

২৫। ১৭৫৭ সালে মীরজাফর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে কলকাতা বা ২৪ পরগণার যে জমিদারী দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে একটি পরগণার নাম ছিল মানপুর—Gazetteers 24 pgs., p. 44.

২৬। মানা-বাউরিদের বসবাস প্রধানত ট্যাশামা, বনগ্রাম, বুধপুর, মানপুর বনমোহড়া, গুড়তুপা, ধাধাকিড়ি, রাজাবাগান, মহিষমোড়া, মাধবপুর, উদয়পুর, বাসুচি, পলমি, সেলিডি, দুর্গাপুর, বিসপুরিয়া, জবলা, সিন্দুরপুর ইত্যাদি গ্রামে। বাঁকুড়া জেলার খাতড়া থানার ভেলাইডিহা, দুবরাজপুর, বাসবি প্রভৃতি গ্রামে। মানা-বাউরিদের বহু পরিবার এ অঞ্চল থেকে বাস উঠিয়ে বর্ধমান, হুগলী ও চব্বিশ পরগণা জেলায় চলে গেছেন। —সাক্ষাৎকার, অম্বুজ সিং সর্দার, বয়স ৬২, ট্যাশামা, পুরুলিয়া, তাং ১৪ এপ্রিল ১৯৮২।

২৭। দ্রষ্টব্য, 'শ্লোকার্থ বোধিকা' গ্রন্থের টাইটেল পেজ। প্রকাশিত হয়েছিল, (চিৎপুর, কলকাতা) ১৭৯২ শকে বা ১৮৭০ খ্রী।

২৮। একমাত্র পরমানন্দ আচার্য তাঁর "A Note on the 'Bhum' Countries in Eastern India"—প্রবন্ধে Indian Culture, vol. XII pp. 37-40 কিছুটা আলোচনা করেছিলেন।

২৯। Ain I-Akbari, vol. I, p. 554.

৩০। বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃ ৮৪-৮৫।

৩১। Contributions to the Geography and History of Bengal—H Blochmann, p. 16.

৩২। গোপভূম সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য—বর্ধমান, তরুণদেব ভট্টাচার্য।

৩৩। দ্রষ্টব্য, পাদটীকা ৩১।

৩৪। সামন্তভূম সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃ. ৯৯-১০১ ও ৩৭৮-৭৯।

৩৫। দ্রষ্টব্য, বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য।

৩৬। ব্রাহ্মণভূম সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, মেদিনীপুর—তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃ. ১৯১-৯২।

৩৭। শূরভূম সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, হুগলী—তরুণদেব ভট্টাচার্য।

৩৮। জামবনী রাজবংশ ও ধলভূম জমিদারী সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য, মেদিনীপুর—তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃ. ২০০-২০১।

৩৯। তুঙ্গভূম সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য, বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃ. ৩৭৯-৮০।

৪০। Indian Culture, vol. XII.

৪১। মেদিনীপুরের ইতিহাস—যোগেশচন্দ্র বসু, পৃ. ১১০-১১।

৪২। তেলেগুলিপি অনুসারে 'মান'—ভূমি মাপের একক।

৪৩। পরমানন্দ আচার্য, দ্রষ্টব্য পাদটীকা ৪০।

৪৪। Foudatory States of Orissa—L. E. B. Cobden Ramsay, 1910 Re. p 1982.

৪৫। Two Copper plates from the State of Bonai—Mm. Haraprasad Sastri JB & ORS vol. VI, Pp. 236-45,

'কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু'র রচনাকাল

আলোচনা :

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা আশ্বিন ১৩৯০ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু'র কাল সম্পর্কে আলোচনাটি পড়লাম। তর্কের শেষ নেই। তাই অদ্যকার বক্তব্যই আমার শেষ বক্তব্য। রামপ্রসাদ রায় পিতা জগৎরামের সঙ্গে 'দুর্গা পঞ্চরাত্রি' রচনা করেন 'ভুজ রন্ধ্র রস চন্দ্র' শকে 'মাধব *মাসে' অর্থাৎ ১৬৯২ শক বা ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে। তখন তাঁর বয়স ২২ বৎসর (পুঁথি-পরিচয় ৪র্থ খণ্ড ১৯৮০ পৃ. ২১৬)। পিতার আদেশে তাঁর 'অদ্ভুত রামায়ণে'র লঙ্কা ও উত্তর কাণ্ডের বিস্তারিত রূপ দেন তিনি ১৭১২ শকাব্দের ফাল্গুন মাসে অর্থাৎ ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড অপরার্ধ ১৯৭৫ পৃ. ৪৩১)। 'কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু' তিনি রচনা করে 'রামভুজ মুনি চন্দ্র' শকে মাঘ মাসে। শকাঙ্কের নিয়ম অনুসারে ১৭২৩ শকাব্দ বা ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে এবং সেটা আদৌ অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তখন কবির বয়স ৫৪ বৎসর। উনিশ শতকেও ভাগবতের অনুবাদ বা কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য রচিত হতে দেখা যায়।

এখন প্রশ্ন 'রামে'-র সংখ্যা নিয়ে। পণ্ডিতগণ 'রামে'-র সংখ্যা তিন (৩) গণনা করেন। বরাহ-মিহির-কৃত 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা', শতানন্দের 'ভাস্বতী' চন্দ্রশেখরের 'সিদ্ধান্ত দর্পণ' প্রভৃতি গ্রন্থে 'রামে'-র অঙ্ক তিন (৩) পাওয়া যায়। রাঢ়দেশে রচিত 'জাতকার্ণব' প্রভৃতি গ্রন্থেও ঐ একই সংখ্যা (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩৩৬ 'আঙ্কিক শব্দ') বিদ্যাপতির ছাত্র রূপধরের অনুলিপিকৃত পুথিতে 'রাম' এবং ৩ সংখ্যা একই সঙ্গে আমরা দেখেছি। বাংলা পুথিতেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত আমরা পেয়েছি। তিন (৩) ছাড়া 'রামে'-র আর কোন বিকল্প সংখ্যা আমাদের নজরে পড়েনি। 'রামে'-র অঙ্ক কোথায় এক (১) গণনা করা হয়েছে, বিশ্ববাবু আমাদের দেখান। নচেৎ রামপ্রসাদকে অষ্টাদশ শতকের সীমানার মধ্যে রাখবার তাগিদে 'রামে'-র সংখ্যা এক (১) গণনায় আমরা অক্ষম।

মূল প্রবন্ধে (১৩৮৭ বৈশাখ আষাঢ়) শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—"কৃষ্ণলীলামৃত-সিন্ধু'র এ পর্যন্ত দুখানি পুথি দেখেছি। একটি পুরুলিয়ার পুথি, ডঃ ক্ষুদিরাম দাসের সংগ্রহ, অপরটি প্রবন্ধলেখকের নিজস্ব সংগ্রহ। ঐ প্রবন্ধেরই পাদটীকায় বলা হয়েছে—"বর্তমান লেখক-রচিত এতৎসম্পর্কিত ভূমিকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গবেষণাপত্র রূপে গৃহীত হয়েছে।"—রামপ্রসাদ রায়ের 'কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু' পুথি নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক কাজ করলেন, অথচ কলকাতারই এক নামকরা পুথিশালায় বসন্তরঞ্জন রায়-সংগৃহীত 'কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু-আদিলীলা' পুথিখানার উল্লেখমাত্র না দেখে আমি স্বভাবতঃই বিস্ময় প্রকাশ করি (১৩৮৭ কার্তিক-পৌষ)। উত্তরে ১৩৮৮ মাঘ-চৈত্রে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, বসন্তরঞ্জনের পুথিটি "সব চেয়ে নিকৃষ্ট" এবং "ভুলে ভরা"—যার জন্য তিনি এর উল্লেখ করেননি। অথচ মূল প্রবন্ধ লেখার সময় তিনি মাত্র 'দুখানি পুথি' দেখেছেন—তিনখানি নয়। কাজেই তখন বসন্তবাবুর পুথির কথা আসে কি করে—উত্তর দেবার সময় যতখানা পুথিই তিনি দেখুন না কেন; সম্প্রতি (আশ্বিন ১৩৯০) শ্রীযুক্ত

*'মাধব মাস'কে কেহ কেহ 'চৈত্র মাস বা বৈশাখ মাস' ধরেন কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতে 'মাঘ মাস'—মাধব মাস বলে খ্যাত। তা হলে কাব্যের রচনা কাল আরও এক বৎসর বেড়ে যাবে অর্থাৎ ১৭৭১ খৃঃ হবে। শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী।

বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—"আমি সম্পূর্ণ পুথি আবিষ্কারের সময়ও এর [বসন্তরঞ্জনের পুথির] কথা জানতাম না। পরে জেনেছি।"—এটাই সত্য কথা।

শেষোক্ত উত্তরে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—"অন্যান্য অনেক পুথির মতো 'কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু'র ক্ষেত্রেও বসন্তরঞ্জনই মূল আবিষ্কর্তা।…এ বিষয়ে আমার বা সুনীতবাবুর কারোরই প্রথম আবিষ্কারের দাবী নেই।"—শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই স্বীকারোক্তিতে আমি সত্যই সুখী হয়েছি।

সুনীতকুমার রায়কে আমি শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বসূরী বা উত্তরসূরী কিছুই বলিনি। তিনিও 'কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু' নিয়ে কাজ করেছেন, এইমাত্র বলেছি। আমি তাঁর কাজের কিছুই জানিনা। আমার জানতে কৌতূহল হয়, তিনি 'কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু'র রচনাকাল পেয়েছেন কিনা এবং পেলে 'রামে'-র অঙ্ক কত ধরেছেন।

অক্ষয়কুমার কয়াল।

পরিষৎ-সংবাদ

১৩৯০ বঙ্গাব্দের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৩য় সংখ্যা অগ্রহায়ণ-পৌষ নানা কারণে যথাসময়ে প্রকাশ করা সম্ভব হইল না সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছি।

শোক সংবাদ :—আলোচ্য কালসীমার মধ্যে বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনীর সভাপতি সুরেন নিয়োগী ও কল্লোল যুগের লেখিকা সুনীতি দেবীর জীবনাবসান হইয়াছে। সংহতি পত্রিকার সম্পাদক সুরেন নিয়োগী বাংলা সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে একটি অবিস্মরণীয় নাম। তাঁহার ও সুনীতি দেবীর প্রয়াণে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্য নিবাহক সমিতি গত ৮ই পৌষ, ১৩৯০ তারিখের অধিবেশনে যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া শোকজ্ঞাপন করিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগীর স্মরণসভা :

গত ২৯ শে, পৌষ ১৩৯০ ইংরেজী ১৪ই জানুয়ারী,১৯৮৪ শনিবার অপরাহ্নে বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাহিত্যসাধক ও রাজনীতিবিদ সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগীর মৃত্যুতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বহু জনসমাগম হইয়াছিল। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত। প্রয়াত সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগীর জীবন ও সাহিত্যসাধনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য, সর্বশ্রী দেবনারায়ণ গুপ্ত, জীবনতারা হালদার, রনজিৎকুমার সেন, সুধীর বসু, শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আলোচনা করেন এবং সুরেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

রাধারাণী দেবীর সম্বর্ধনা :

গত ২৪ শে অগ্রহায়ণ, ১৩৯০ ইংরেজী ১১ ডিসেম্বর, ১৯৮৩ রবিবার অপরাহ্নে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে শ্রীমতি রাধারাণী দেবীর অশীতি বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ অশীতিপর সাহিত্যিকগণকে সম্বর্ধনা জানানোর সিদ্ধান্ত পূর্বেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কয়েক জন সাহিত্যিককে পূর্বেই সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

আজীবন সদস্য :

গত ২৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৯০ শনিবার অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে ৫৯ ডি পারমার রোড, ভদ্রকালী, হুগলী নিবাসী শ্রীইন্দু দা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাক্তন কর্মী শ্রীঅনাদিভূষণ দাস; ৫২ বি, বালি-গঞ্জ সার্কুলার রোড,কলিকাতা-১৯ নিবাসী শ্রীদীপালি রায় এবং ২এফ, ক্যামাক স্ট্রীট কলিকাতা-১৬ নিবাসী শ্রীশঙ্কর ঘোষের আজীবন সদস্যপদ অনুমোদন করা হয়।

ছুটির তালিকা সংশোধন :

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কার্যনিবাহক সমিতি কর্তৃক গঠিত ছুটি বিষয়ক উপ-সমিতির সুপারিশ অনুযায়ী পরিষদের সাধারণ ছুটির তালিকায় ইদুজ্জোহা ও ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া দুই দিন বৃদ্ধি করিবার সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়।

R. N. 41097/81

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন
বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত
মূল্য—ত্রিশ টাকা

সংবাদপত্রে সেকালের কথা
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১ম খণ্ড : টা: ২০.০০
২য় খণ্ড : টা: ৩০.০০

বাংলা সাময়িক পত্র
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১ম খণ্ড : টা: ১১.০০
২য় খণ্ড : টা: ৯.০০

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস
(১৭৯৫-১৮৭৬)
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ডঃ সুশীলকুমার দে লিখিত ভূমিকা
পঞ্চম সংস্করণ। মূল্য—৩০.০০

বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক
(মধ্যযুগ)
ডঃ জগদীশনারায়ণ সরকার
মূল্য—১০.০০

সাহিত্য সাধক-চরিতমালা
১ম হইতে ১৪শ খণ্ড। মূল্য—২৩০.০০
বাংলার সাহিত্যিকগণের প্রামাণ্য জীবনী ও গ্রন্থসূচী
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক শ্রীকানাইচন্দ্র পাল পি. এইচ্. ডি. (লণ্ডন) ব্যারিস্টার-এট্-ল, কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীহরি প্রিণ্টার্স, ১২২/৩ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট কলিকাতা-৪ হইতে শ্রীমতী রেখা দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য : চার টাকা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

৯০ বর্ষ ॥ চতুর্থ সংখ্যা ॥

চৈত্র

১৩৯০

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসরোজমোহন মিত্র

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,

কলিকাতা-৭০০০০৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

৯০ বর্ষ ॥ চতুর্থ সংখ্যা ॥

চৈত্র

১৩৯০

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসরোজমোহন মিত্র

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,

কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচীপত্র

সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়ক বিবৃতি—

(৮নং ধারা অনুযায়ী ৪নং ফরম)

১। **প্রকাশের স্থান—**
২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০০০০৬

২। **প্রকাশের কাল পর্যায়—**
ত্রৈমাসিক : আষাঢ়, আশ্বিন, পৌষ এবং চৈত্র

৩। **মুদ্রকের নাম—**
শ্রীমতী রেখা দে, শ্রীহরি প্রিণ্টার্স ১২২/৩, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

৪। **প্রকাশকের নাম—**
ডঃ কানাইচন্দ্র পাল, সম্পাদক ; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। জাতি— ভারতীয়। ২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০০০০৬

৫। **সম্পাদকের নাম**—ডঃ সরোজমোহন মিত্র, জাতি—ভারতীয়। ২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০০০০৬

৬। **পত্রিকার মালিক**—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০০০০৬

আমি এতদ্বারা জানাইতেছি যে উপরোক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাঃ ডঃ কানাইচন্দ্র পাল

প্রকাশক

ভারতীয় দর্শনে বাগর্থবিচার

শ্রীশ্রীমোহন তর্কবেদান্ততীর্থ ভট্টাচার্য

তন্ত্রশাস্ত্রে বাগ্‌দেবীর যে ধ্যানমন্ত্র আছে তাহাতে তাঁহাকে পঞ্চাশদ্‌ বর্ণময়ী বলা হইয়াছে। তাঁহার শরীর ৫০টি বর্ণে গঠিত, বাঙ্ময় জগৎ এই কয়টি বর্ণের দ্বারা ব্যাপ্ত। ইহাদের বিশিষ্ট সংযোগের ফলে গঠিত হয় অনন্ত পদ এবং পদঘটিত বাক্য। নানা প্রকার বাগ্‌ভঙ্গীর সাহায্যে অগণিত কাব্য নাটক প্রবন্ধাদি রচিত হইতেছে এবং হইবে, এই বর্ণকে অতিক্রম করিয়া নূতন কিছু সংযোজনার উপায় নাই। জাগতিক সূক্ষ্ম ব্যবহিত নানা বাহ্য বস্তু ও আন্তর জগতের বিচিত্র সুখ দুঃখাদি বৃত্তিকে এবং অন্তের মধ্যে নিজকে প্রকাশ করিবার এমন মাধ্যম আর দ্বিতীয় নাই। আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক নিখিল বস্তু ও ভাবের জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন—এই বাগদেবতা। তন্ত্রের মতে তিনিই সাধ্য এবং তিনিই সাধন। বীজ বা বাক্‌রূপে তিনি সাধন, অর্থরূপে তিনি সাধ্য। তন্ত্রের এই রহস্যময় দুর্গম তত্ত্ব আমাদের আলোচ্য নহে।

নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালংকার তাঁহার বিখ্যাতগ্রন্থ 'শব্দশক্তিপ্রকাশিকা'তে প্রথমেই বাগ্‌দেবীকে স্মরণ করিয়াছেন এবং তাহাতে বলিয়াছেন যে, বাগ্‌দেবী সম্যক্ উপাসিতা হইলে সদ্যই প্রত্যক্ষীভূতা হন এবং অভীষ্ট ফল প্রদান করেন। (১) যথাযথ বাক্যের প্রয়োগই বাগ্‌দেবীর উপাসনা, এই উপাসনার ফল—বক্তার অভিপ্রেত বাক্যার্থবোধ বা শাব্দবোধ। এই ফল অবিলম্বেই পাওয়া যায়। আচার্য দণ্ডীও কাব্যাদর্শে বলিয়াছেন—

'গৌ গৌঃ কামদুঘা সম্যক্ প্রযুক্তা স্মর্যতে বুধৈঃ'। (২) 'সম্যক্ প্রয়োগ' বলিতে আকাঙ্ক্ষা-যোগ্যতা-আসত্তিযুক্ত পদসমূহের যথাযথ প্রয়োগ। 'বাক্' বলিতে বর্ণ, পদ ও বাক্য এই তিনটিই বুঝায়, কিন্তু আলোচ্য 'বাগর্থ' 'কথাটির মধ্যে যে বাক্‌শব্দ আছে তাহার অর্থপদ ও বাক্য, যেহেতু, আপাততঃ আমাদের কাছে বর্ণের স্বতন্ত্রভাবে কোন অর্থ নাই। পদের অর্থ আছে এবং বিভিন্ন পদের অর্থই পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হইলে বাক্যার্থ হয়, অতএব পদই আমাদের প্রধান আলোচ্য।

বিশিষ্ট আনুপূর্বী বা সন্নিবেশ যুক্ত বর্ণ সমষ্টিকে বলা হয় পদ। ইহা সকলেরই অনুভব সিদ্ধ যে, বিশেষ বিশেষ পদ শ্রবণ করিলে বিশেষ বিশেষ অর্থের বোধ হয়, এই জন্যই পদকে বলা হয় বাচক শব্দ এবং অর্থকে বলা হয় পদের বাচ্য। এই যে বাক্ বা বাচক পদ তাহার স্বরূপ কি তাহাই প্রথমতঃ বিবেচ্য। আমরা জানি যে, বর্ণসমূহ অর্থাৎ কতকগুলি বর্ণের সমষ্টিই পদ এবং পদসমূহই বাক্য, কিন্তু ইহার মধ্যে যে অসঙ্গতি আছে তাহা সাধারণতঃ লক্ষ্য করা হয় না। আপাততঃ লিপিকে বর্ণ মনে করিলে কোন সংশয়ের উদয় না হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু লিপি তো বর্ণ নহে, তাহা দণ্ডাবর্ত বিন্দু সমন্বিত চিত্রমাত্র। যাহাকে লিপিবদ্ধ করি সেই শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বাগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে উচ্চারিত বর্ণের সমষ্টিই পদ। কিন্তু বর্ণের ক্রমিক মিলনের ফলেই সমষ্টির সৃষ্টি হইতে পারে, এই বিষয়ে নানা প্রশ্নের অবকাশ আছে।

১. অনুভবহেতুঃ সকলে সদ্যঃ সমুপাসিতা মনুজে।
   সাকাঙ্ক্ষাসন্না চ স্বার্থে যোগ্যা সরস্বতীদেবী॥ (শব্দশক্তি প্র. ১১)

২. কাব্যাদর্শ। শ্লোঃ ৬

দার্শনিকগণ এই সম্বন্ধে যে সমীক্ষা করিয়াছেন তাহাতে দুইটি মতবাদের উৎপত্তি হইয়াছে—একটি বর্ণবাদ এবং অপরটি স্ফোটবাদ।

মীমাংসকমতে বর্ণাত্মক শব্দ নিত্য, উচ্চারণের দ্বারা বর্ণের অভিব্যক্তি হয়, উৎপত্তি হয় না। নৈয়ায়িকগণের মতে ধ্বন্যাত্মক শব্দের ন্যায় বর্ণাত্মক শব্দও অনিত্য, কণ্ঠ তালু প্রভৃতির অভিঘাতাখ্য সংযোগ হইতে বর্ণের উৎপত্তি হয়। যাহারা বর্ণকে নিত্য বলেন তাহাদের মতে প্রত্যেকটি বর্ণ সমকালীন হওয়ায় তাহাদের ক্রম অর্থাৎ পৌর্বাপর্য সম্ভব নহে। আর—যাহারা বর্ণকে অনিত্য বলেন অর্থাৎ নৈয়ায়িক প্রভৃতি—তাহাদের মতে তাহা দ্বিক্ষণমাত্রস্থায়ী, অতএব উত্তরোত্তর বর্ণের উৎপত্তিকালে পূর্ব পূর্ব বর্ণের ধ্বংস হওয়ায় তাহাদের পৌর্বাপর্য সম্ভব হইলেও পূর্ব পূর্ব বর্ণের সহিত অন্তিম বর্ণের মিলন সম্ভব না হওয়ায় পদের সম্ভাবনা কোথায়? বৃক্ষসমুদায়কে 'বন' বলিতে পারি, যেহেতু তাহারা সমকালবর্তী হওয়ায় তাহাদের সমুদিতভাব বা সাহিত্য সম্ভব, ভিন্নকালবর্তী বর্ণ সমুদায়কে ঐ ভাবে পদ বলা যায় না। যেমন বিভিন্ন উপকরণের সংযোগে গৃহনির্মাণ সম্ভব, কেননা প্রত্যেকটি উপকরণ স্থায়ী মূর্ত বস্তু, কোনও চেতন প্রযত্নবশে তাহার মিলন ঘটাইতে পারে কিন্তু বর্ণের ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব হইতে পারে না, অতএব বর্ণকে পদের ঘটক অর্থাৎ অবয়ব বলা যায় না। যে শব্দ শ্রবণ করিয়া পদার্থের উপস্থিতি হয় তাহা পদের অন্তর্গত চরম বর্ণমাত্র, চরমবর্ণকে পদ বলা যায় না, তাহা হইলে সেই একটিমাত্র চরমবর্ণ উচ্চারণ করিলেই অর্থবোধ হইত। এইভাবে পদের অন্তর্গত কোন একটি বর্ণই অর্থবোধক হইতে পারে না, তাহা হইলে অন্যবর্ণের উচ্চারণ ব্যর্থ হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব পূর্ব বর্ণগুলি উচ্চারণের পর পর বিধ্বস্ত হওয়ায় তাহারা চরমবর্ণকে সাহায্য করিতে পারে না, অথচ অসহায় কেবল চরমবর্ণকে অর্থের প্রত্যায়ক বলা যায় না।(৩) ইহার উত্তরে বর্ণবাদী বলেন যে, যেমন দর্শপূর্ণমাসযাগ আগ্নেয়াদি ছয়টি যাগের সমষ্টি, তাহারা ক্রমে অনুষ্ঠিত হইলেও মিলিতভাবে স্বর্গাদি ফলের জনক হয়, একটি বাক্যের অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃপুনঃ উচ্চারণ ক্রমিক হইলেও তাহার ফলে বাক্যটি কণ্ঠস্থ হইয়া যায়; প্রত্যেকটি পদক্ষেপ অর্থাৎ গমনক্রিয়া ক্রমে উৎপন্ন হইলে মিলিতভাবে গ্রামাদিদেশপ্রাপ্তিরূপ ফলের জনক হয়, [সেই সেই স্থলে একটি ক্রিয়া দ্বারা বা যুগপদনুষ্ঠিত ক্রিয়া দ্বারা বা অযথাক্রমে অনুষ্ঠিত ক্রিয়াদ্বারা অথবা বিভিন্ন কর্তৃক ক্রিয়া দ্বারা ফল উৎপন্ন হয় না], তেমনি, যথাক্রমে একব্যক্তিকর্তৃক উচ্চারিত বর্ণসমূহের দ্বারা অর্থ-প্রতীতি হইবে না কেন?

ইহাতে বিরুদ্ধবাদী (স্ফোটবাদী) বলেন যে, বর্ণবাদীর ঐ যুক্তি গ্রহণ করা যায় না। যে যে দৃষ্টান্তের দ্বারা বর্ণবাদ সমর্থন করা হইতেছে তাহার সহিত প্রকৃতস্থলের বৈষম্য রহিয়াছে। দর্শপূর্ণমাসাদি স্থলে কোন যাগই সাক্ষাৎভাবে স্বর্গাদি ফলের সাধন হয় না, অথচ বেদবিধি দ্বারা তাহার স্বর্গসাধনতা অবগত হওয়ায় অর্থাপত্তি প্রমাণ বলে তত্তৎ যাগ জন্য অদৃষ্ট কল্পনা করা হয়, ফলনাশ্য ঐরূপ স্থায়ী পূর্ব পূর্ব অদৃষ্টের দ্বারা উপকৃত প্রধানাপূর্ব-রূপ ব্যাপারের মাধ্যমে তত্তৎকর্ম ফল জন্মাইতে পারে। পাঠাভ্যাসাদি স্থলেও পূর্ব পূর্ব পাঠাদি জনিত সংস্কার সহকারে পর পরবর্তি পাঠাদিসংস্কার ফল জন্মাইতে পারে। গ্রামাদি প্রাপ্তিস্থলে পূর্ব পূর্বগমন ক্রিয়া জনিত পূর্ব পূর্ব দেশাতিক্রম সহকারে উত্তর ক্রিয়া দেশান্তর প্রাপ্তিরূপ ফলের জনক হয়। কিন্তু বর্ণস্থলে তাহা সম্ভব নহে।

৩. প্রত্যেক ম প্রত্যায়কত্বাৎ সাহিত্যাভাবাৎ নিয়তক্রমবর্তিনাময়ৌগপদ্যেনৈ সম্ভূয় কারিত্বানুপপত্তেঃ। নানাবক্তৃ প্রযুক্তেভ্যশ্চ প্রত্যয়াদর্শনাৎ ক্রমবিপর্যয়ে যৌগপদ্যে চ। (স্ফোটসিদ্ধি ৩)

বর্ণবাদী বলেন—কেন সম্ভব নহে ? পূর্ব পূর্ব বর্ণসমূহ অনুভব জনিত সংস্কাররূপ ব্যাপারের দ্বারা চরম বর্ণের সহিত বাচ্যার্থের বোধ জন্মাইবে (৪)। ইহাতে স্ফোট বাদী বলেন যে, এইরূপ সমাধান সঙ্গতনহে, যেহেতু বেদে স্থানক্রম পাঠক্রম আর্থক্রম ইত্যাদি নানাবিধ ক্রমের নিয়ামক থাকায় অক্রমে অনুষ্ঠিত কর্ম হইতে অদৃষ্ট এবং ফল উৎপন্ন হয় না, কিন্তু বর্ণস্থলে ক্রমের কোন নিয়ামক না থাকায় অক্রমে উচ্চারিত বর্ণসমূহ হইতে অর্থ-বোধের আপত্তি হইবে, ফলতঃ কপি ও পিক উভয় শব্দ হইতেই বানর বা কোকিলের বোধ হইবে। অক্রমে উচ্চারিত তত্তৎ বর্ণের উপলব্ধি হইলে কোন সংস্কার উৎপন্ন হয় না—ইহা বলা যায় না। পূর্ব পূর্ব বর্ণের অনুভবজনিত সংস্কার সহকারে অন্ত্যবর্ণ যদি অর্থের বোধক হয় তাহা হইলে 'গৌঃ' এই পদ স্থলে গকার ঔকার ও বিসর্গ এই তিনটির মধ্যে কেবল বিসর্গকেই বাচক বলিতে হয়, গকার ও ঔকার তাহার সহকারি মাত্র। তাহা হইলে' গৌ': এই পদের বাচকতা সম্ভব হয় না। (৫) 'গৌরিত্যেকং পদম্' এইরূপ ব্যবহারেরও উপপাদন করা যায় না।

আরও বক্তব্য এই যে, কোনো বস্তুবিষয়ক উপলব্ধি হইতে যে সংস্কার জন্মে তাহা তদ্‌বস্তুবিষয়ক স্মৃতিকে জন্মায় ইহাই নিয়ম, স্মৃতির নির্বাহের জন্যই সংস্কার কল্পনা। অতএব তত্তৎ বর্ণের উপলব্ধি হইতে যে তত্তদ্ বর্ণবিষয়ক সংস্কার জন্মে তাহা হইতে তত্তৎবর্ণ বিষয়ক সংস্কার জন্মে তাহা হইতে তত্তংবর্ণবিষয়ক স্মৃতিই উৎপন্ন হইতে পারে, বাচ্যার্থের বোধ হইতে পারে না। সংস্কারের সামর্থ্য স্মৃতিতেই উপক্ষীণ (৬)। তত্তৎসংস্কার সহিত অন্ত্যবর্ণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেও সংস্কার অতীন্দ্রিয় হওয়ায় বর্ণের বিশেষণ হইতে পারে না।

অতএব বর্ণসমূহকে পদ বা বাচক শব্দ বলা যায় না। গৌঃ অশ্বঃ মনুষ্যঃ ইত্যাদিকে একটি পদ বলা হয়, অথচ তাহার অন্তর্গত বর্ণসমূহ নানা। যেমন অনেক অবয়বের সংযোগে একটি অবয়বীর সৃষ্টি হয়, তেমনি সকল বর্ণ মিলিয়া একটি পদের সৃষ্টি করে—ইহা বলা যায় না, যেহেতু তাহাদের সমকালে উপস্থিতি অসম্ভব, বর্ণনিত্যতাবাদীর মতে তাহা সম্ভব হইলেও তাহাদের ক্রমিকতা সম্ভব নহে।

তাহা হইলে সর্বলোকাসিদ্ধ 'পদ'ব্যবহার কাহাতে হইবে ? তাহার সমাধানে স্ফোটবাদী বলেন যে—বর্ণসমূহ ক্রমে উচ্চারিত হইলে তাহার দ্বারা এক একটি অখণ্ড (অনবয়ব) শব্দের অভিব্যক্তি হয় তাবদ্ বর্ণাভিব্যক্ত এই শব্দই স্ফোট। স্ফোটই পদ এবং অর্থের বাচক। অভিব্যঞ্জক বর্ণসমূহের ভেদ থাকিলেও তাহা অখণ্ড এক। এই স্ফোটাত্মক শব্দের সহিতই অর্থের বাচ্য বাচকভাব সম্বন্ধ (৭)।

যেমন ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ থাকিলেও দূর হইতে কোন বস্তু অস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় এবং ক্রমে তাহা স্পষ্ট হয়। অথবা রত্নতত্ত্ব পরীক্ষা স্থলে পরীক্ষক রত্নকে পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিলে অবশেষে তাহার প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয় সেইরূপ এক একটি বর্ণের উচ্চারণের দ্বারা প্রথমতঃ অস্পষ্ট এবং ক্রমে স্পষ্টতর হইয়া স্ফোটের অভিব্যক্তি হয়। (৮) প্রশ্ন হইতে

৪. পূর্ববর্ণজনিত সংস্কার সহিতোঽন্ত্যো বর্ণ : প্রত্যায়কং ইত্যদোষ : (শাবরভাষ্য ১। ১।৫)

৫. ন চান্ত্যবর্ণমাত্রস্য পুরঃ সাবন্ধবেদনম্ (স্ফোটসিদ্ধি ১৩)

৬. সংস্কারাঃ খলু যদ্ বস্তুরূপ প্রখ্যা প্রভাবিতাঃ ।
বিজ্ঞান হেতুবস্তত্র ততোঽর্থে ধীর্ণ কল্পতে॥ (স্ফোটসিদ্ধি ৬)
অন্যোপলব্ধি প্রতিলব্ধ জন্মনো ভাবনায়া অন্যত্র জ্ঞানহেতুত্বাযোগাৎ। (ঐ ১০)

৭. নাপি সংস্কার বিশেষণং তস্যাতিতেন্দ্রিয়বিষয়সীম্নঃ সাক্ষাদবেদনাৎ ॥ (ঐ ১৩)

৮. চয়স্ত্বিষামিত্যবধারিতং পুরা ততঃ শরীরীতি বিভাবিতাকৃতিঃ।
বপুর্বিভক্তাবয়বং পুমানিতি ক্রমাদমুং নারদ ইত্যবোধি সঃ॥ (শিশুপালবধ)

পারে যে, এইভাবে স্ফোটের অর্থাৎ পদের অভিব্যক্তি স্বীকার না করিয়া তত্তৎবর্ণ হইতেই অস্পষ্ট ঈষৎ স্পষ্ট ইত্যাদিরূপে অর্থের অভিব্যক্তি হয় ইহা স্বীকার করিলে ক্ষতি কি ? ইহার উত্তরে স্ফোটবাদী বলেন—একমাত্র প্রত্যক্ষ স্থলেই ক্রমে অস্পষ্ট ইত্যাদি ভাবে প্রকাশ হইতে পারে, দূরবর্তীর প্রত্যক্ষস্থলে এবং রত্ন পরীক্ষাদি স্থলেই তাহা দেখা যায়। অনুমান বা শব্দ প্রমাণের সেই সামর্থ্য নাই, তাহারা নির্দিষ্টরূপেই বস্তুর অনুমিতি বা শাব্দবোধ জন্মায় অথবা জন্মায় না (৯)। প্রকৃত স্থলে বর্ণ হইতে যে অর্থবোধ হইবে তাহা প্রত্যক্ষাত্মক নহে, তাহা শাব্দবোধ, অতএব তাহার প্রকাশের মধ্যে পার্থক্য থাকিতে পারে না। স্ফোট প্রত্যক্ষসিদ্ধ হওয়ায় তাহার ক্রমে উপলব্ধির স্বচ্ছতা সম্ভব। নৈয়ায়িকগণ পূর্ব পূর্ব বর্ণানুভব জনিত সংস্কার সহকারে অন্ত্যবর্ণ জ্ঞানকে অর্থবোধের জনক বলেন।

মীমাংসাদর্শনের প্রাচীন বৃত্তিকার উপবর্ষের মতে—তাবৎ বর্ণের অনুভব জনিত সংস্কার তাবৎ বর্ণবিষয়ক স্মৃতিকে জন্মায়, এই স্মৃতিতে উপারূঢ় বর্ণসমূহই অর্থের বোধক। ইনি বর্ণাত্মক পদকেই অর্থের বাচক বলিয়াছেন অতিরিক্ত স্ফোট স্বীকার করেন নাই। এইজন্যই শাবর ভাষ্যে "অথ গৌরিত্যত্রকঃ শব্দঃ ? এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া "গকারৌকার বিসর্জনীয়াঃ ইতি ভগবানুপবর্ষঃ"-এইভাবে স্বসিদ্ধান্ত সমর্থনে বর্ণবাদী পূর্বাচার্য উপবর্ষের উল্লেখ করিয়াছেন। শঙ্করাচার্যও "শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভাবৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম" (ব্রহ্ম সূঃ ১।৩।।২৮) এই সূত্রের ভাষ্যে কমাত্মকং পুনঃ শব্দমভিপ্রেত্যেদং শব্দপ্রভবত্ব মুচ্যতে ? স্ফোটমিত্যাহ'—এইভাবে প্রথমে স্ফোটবাদী বৈয়াকরণ সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়া, পরে 'বর্ণা এবং তু শব্দ ইতি—ভগবানুপবর্ষঃ এইভাবে বর্ণবাদী উপবর্ষের মত প্রদর্শন করিয়াছেন।

বর্ণাতিরিক্ত স্ফোটকল্পনা লোকানুভববিরুদ্ধ। এই জন্যই নৈয়ায়িক প্রভৃতি অধিকাংশ দার্শনিক তাহা স্বীকার করেন নাই।

আচার্য মণ্ডণ মিশ্র 'স্ফোট সিদ্ধি' গ্রন্থে বর্ণাতিরিক্ত স্ফোটের পক্ষে বহু যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি শাবরভাষ্য এবং কুমারিলভট্টের মত খণ্ডন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। অনেকেই অনুমান করেন যে মণ্ডন মিশ্র ভর্তৃহরির মতানুগামী শব্দাদ্বৈতবাদী, অতএব তাঁহার পক্ষে স্ফোটবাদ সমর্থন করাই স্বাভাবিক।

ন্যায়দর্শনের মত ॥ ন্যায়শাস্ত্র প্রমাণ নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া প্রসঙ্গতঃ বাক্যার্থের নিরূপণ করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চতুর্বিধ প্রমাণের মধ্যে শব্দ অন্যতম। শব্দ প্রমাণের ফল—শাব্দবোধ। শাব্দবোধ বলিতে এক পদার্থে অপরপদার্থের অন্বয়-বোধ বা বাক্যার্থবোধকে বুঝায়। এই শব্দ অর্থাৎ পদ বাক্যের অন্তর্গত হইয়াই শাব্দবোধকে জন্মায়, বিচ্ছিন্নভাবে জন্মায় না। যেমন—'গচ্ছতি' এই বাক্যের অন্তর্গত গম্ ও তি এই দুইটি পদ বাক্যার্থের বোধক হইলেও স্বতন্ত্রভাবে গম্ বা তি উচ্চারণ করিলে তাহার দ্বারা অর্থবোধ হইবে না (১০)। বাক্যের অন্তর্গত এই পদ বা শব্দগুলিকে সার্থক শব্দ বলা হয়। যাহা শব্দান্তর নিরপেক্ষভাবে স্বার্থ বোধ জন্মাইতে পারে না তাহাই সার্থক শব্দ (১১)। যথা—প্রকৃতিও প্রত্যয়। প্রকৃতি প্রত্যয়যুক্ত না হইয়া এবং প্রত্যয় প্রকৃতিযুক্ত না হইয়া স্বার্থবিষয়ক বোধ জন্মায় না।

৯. অর্থাবসায় প্রসবনিমিত্তং শব্দ ইষ্যতে। (স্ফোটসিদ্ধি ৩)

১০. লিঙ্গ শব্দাদয়স্তু নিশ্চিতাত্মানং প্রত্যয় মুপজনয়ন্ত্যেকরূপং নৈব বা, ন তত্র ব্যক্তাব্যক্ত গ্রহণ বুদ্ধিভেদঃ। (স্ফোটসিদ্ধি ২৩)

১১. বাক্যভাবসবাপ্তস্ত সার্থকস্তাববোধতঃ। সম্পদ্যতে শাব্দবোধো ন তন্মাত্রস্ত বোধতঃ ॥ (শব্দশক্তি প্রকাশিকা)

বাক্যার্থবোধের পদ্ধতি ॥ প্রথমতঃ—একটি বাক্যে যতগুলি পদ আছে তাহাদের জ্ঞান আবশ্যক। ইহাই পদজ্ঞান এবং শাব্দবোধের করণ বা প্রমাণ। পদজ্ঞান না থাকিলে বাক্য শ্রবণ করিলেও অর্থবোধ হইবে না। যেমন, রামঃ গ্রামং গচ্ছতি এই বাক্যে রাম, সু, গ্রাম, অম্, গম্ ও তি ; এই ছয়টি পদ (বাচক শব্দ) আছে। দ্বিতীয়তঃ—প্রত্যেকটি পদের অর্থের জ্ঞান (পদজ্ঞান জনিত পদার্থোপস্থিতি) আবশ্যক। এই জ্ঞান স্মৃত্যাত্মক, ইহা প্রত্যেক পদের শক্তিজ্ঞান থাকিলেই হইতে পারে। 'পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত সম্বন্ধিরূপে জ্ঞাত) দুইটি পদার্থের মধ্যে এক সম্বন্ধীর জ্ঞান অপর সম্বন্ধীর স্মারক হয়' এই নিয়ম অনুসারে পদ ও অর্থ এই দুইটির মধ্যে বাচ্যবাচকভাব সম্বন্ধ থাকায় পদের (বাচক শব্দের) জ্ঞান হইলে পদার্থের (বাচ্য অর্থের) স্মরণ হয় এবং পদার্থের জ্ঞান হইলে পদের স্মরণ হয়। পূর্বে পদ-পদার্থের বাচ্যবাচকভাব অর্থাৎ শক্তির জ্ঞান না থাকিলে তাহা হইতে পারে না। এইজন্যই বলা হয়—'শক্তিধীঃ সহকারিণী' অর্থাৎ পদ ও পদার্থের শক্তিজ্ঞান শাব্দবোধে সহকারি কারণ।

তৃতীয়তঃ—শক্তি বা লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা উপস্থিত (স্মৃত) পদার্থ সমূহের বিশেষ্য বিশেষণভাবে অন্বয় বা সম্বন্ধের বোধ হয়। ইহাই শাব্দবোধ বা অন্বয়বোধ বা বাক্যার্থবোধ। ইহা অপূর্ব অর্থাৎ অভিনব। বাক্য শ্রবণের পূর্বে এই বাক্যার্থবোধ থাকে না, পদার্থের জ্ঞান পূর্বে (শক্তিগ্রহণকালে) থাকিলেও বাক্যার্থজ্ঞান অভিনব।

এই স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, শাব্দবোধীয়বিষয়তা অবশ্যই বৃত্তিপ্রযোজ্য, যে অর্থে যে পদের শক্তি বা লক্ষণাবৃত্তি অবগত, সেই অর্থ ই সেই পদজন্য শাব্দবোধের বিষয় হয়, ইহাই নিয়ম। কিন্তু শাব্দবোধের মুখ্যবিষয় যে পদার্থান্বয় অর্থাৎ এক পদার্থে অপর পদার্থের সম্বন্ধ, যেমন 'ঘটম্ আনয়' এইস্থলে আধেয়তা, নিরূপকত্ব, অনুকূলত্ব ও সমবায় ; (ঘটনিষ্ঠ কর্মতা নিরূপক আনয়নানুকূলকৃতিমান্) ইহারা শব্দবোধের বিষয় কিভাবে হইবে ? যেহেতু ঘট, অম্, আ-নী, তি—এই সকল পদের শক্তি ঐরূপ সম্বন্ধে নাই।

ইহার উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেন—পদার্থগত শাব্দবোধীয়বিষয়তা তত্তৎ পদের বৃত্তি প্রযোজ্য হইলেও সম্বন্ধনিষ্ঠবিষয়তা বৃত্তিপ্রযোজ্য নহে, পরন্তু আকাঙ্ক্ষা প্রযোজ্য।

প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে শব্দের তাৎপর্য নামক একটি অতিরিক্ত বৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন, তাহাদের মতে সম্বন্ধনিষ্ঠবিষয়তা তাৎপর্যবৃত্তি প্রযোজ্য। প্রভাকর সম্প্রদায় বলেন যে, অন্বিতস্বার্থে পদের শক্তি, অতএব অন্বয় অর্থাৎ সম্বন্ধও সম্বন্ধি পদার্থের ন্যায় শক্তিভাস্য। প্রাচীন নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্টের মতে পদের দ্বিবিধ শক্তি স্বীকার করা হয়, অভিধাত্রী শক্তি ও তাৎপর্য শক্তি। পদের অভিধাত্রী শক্তি শুদ্ধ পদার্থ বিষয়ক এবং বাক্য-ঘটক পদের তাৎপর্যশক্তি অন্বিতার্থ বিষয়ক (১২)

প্রয়োগ পদ্ধতির বৈচিত্র্যবশতঃ বাক্যের তিন প্রকার ভেদ দেখা যায়—কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্য। যে বাক্যেকর্তাই মুখ্যবিশেষ্যরূপে (১৩) প্রতিপাদ্য তাহা কর্তৃবাচ্য। এইরূপ বাক্যেক র্তারই প্রাধান্য, অবশিষ্ট সকল পদার্থই তাহার বিশেষণ। যেমন—রামঃ গ্রামং গচ্ছতি এইবাক্যে রামই প্রধান। তাহার বিশেষণ আখ্যাতার্থ কৃতি, তাহার বিশেষণ-ধাত্বর্থ-গমন, তাহার বিশেষণ-দ্বিতীয়া বিভক্ত্যর্থ কর্মতা, তাহার বিশেষণ-গ্রাম ('তি' এই আখ্যাতের অর্থ—তিনটি, কৃতি, বর্তমান কাল ও একত্ব সংখ্যা। তাহার মধ্যে কৃতি

১২. শব্দান্তরমপেক্ষ্যৈব সার্থকঃ স্বার্থবোধকৃৎ। প্রকৃতিঃ প্রত্যয়শ্চৈব নিপাতশ্চেতি স ত্রিধা।

১৩. অভিধাত্রী মতা শক্তিঃ পদানাং স্বার্থনিষ্ঠতা। তেষাং তাৎপর্যশক্তিস্তু সংসর্গাবগমাবধিঃ ॥ (ন্যায় মঞ্জরী)

ও সংখ্যার অন্বয় কর্তাতে এবং কালের অন্বয় কৃতিতে হয়) অতএব এইবাক্যের অর্থ—গ্রাম-নিষ্ঠ কর্মতার নিরূপক যে গমন, সেই গমনের অনুকূল যে বর্তমান-কালীন কৃতি, সেই কৃতিমান্ ও একত্ববান্ রাম। যে বাক্যে কর্মই বাচ্য অর্থাৎ মুখ্যবিশেষ্যরূপে প্রতিপাদ্য, তাহা কর্মবাচ্য। যেমন—রামেণ গ্রামঃ গম্যতে। এইবাক্যে গ্রামই প্রধান বা মুখ্যবিশেষ্য, অন্যান্য পদার্থ তাহার বিশেষণ। অতএব এই বাক্যের অর্থ হইবে—রাম-কর্তৃক গমনজন্য সংযোগেরআশ্রয় গ্রাম।

যে বাক্যে ভাব অর্থাৎ ক্রিয়াই মুখ্যবিশেষ্য, তাহা ভাববাচ্য। যেমন—'ময়া সুপ্যতে' —মৎকর্তৃক শয়ন।

বাক্যার্থে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নৈয়ায়িকগণ কতকগুলি নিয়ম বা ব্যুৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন।

নামের উত্তর যে বিভক্তি হয়—যাহাকে সুপ্ বিভক্তি বলা হয়—তাহা দুই প্রকার, কারক বিভক্তি ও অকারক বিভক্তি। কারক বিভক্তির সহিত ক্রিয়ার অন্বয় হয় এবং অকারক বিভক্তির সহিত অপর নামার্থের অন্বয় হয়। প্রথমা বিভক্তি কারক বিভক্তি হয় না, তাহা অকারক, অতএব তাহা কখনো ক্রিয়াতে অন্বিত হয় না।
অন্য বিভক্তি কারক বা অকারক হইতে পারে। কর্তৃত্ব, কর্মত্ব, করণত্ব, সম্প্রদানত্ব, অপাদানত্ব অধিকরণত্ব; ইহাদের মধ্যে যে কোনো অর্থ প্রকাশ করিলে তাহা অকারক বিভক্তি হইবে। যেমন, তৃতীয়া বিভক্তি কর্তৃত্ব বা করণত্ব অর্থ বুঝাইলে কারক বিভক্তি হইবে, সহার্থে তৃতীয়া বিভক্তি হইলে তাহা অকারক বিভক্তি হইবে। সম্বন্ধে ষষ্ঠী হইলে সেই ষষ্ঠী অকারক, কিন্তু কৃদ্‌যোগে কর্তা বা কর্মে ষষ্ঠী হইলে তাহা কারক ষষ্ঠী হইবে এবং ক্রিয়ার সহিত তাহার অন্বয় হইবে।

এইভাবে বহু নিয়মের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন পদের শক্তি বিচার পূর্বক শাব্দবোধের যে সুশৃঙ্খল পদ্ধতি ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে বাগর্থবিষয়ে নৈয়ায়িকগণের গভীর অনুশীলনের পরিচয় পাওয়া যায়।

বাক্ ও অর্থের সম্বন্ধ। যেহেতু পদ শ্রবণ করিলে তাহার দ্বারা অর্থের বোধ হয়, অতএব পদের সহিত অর্থের একটি বিশেষ সম্বন্ধ আছে। 'এক সম্বন্ধীর জ্ঞান অপর সম্বন্ধীর স্মারক হয়'। যেমন—হাতিকে দেখিলে মাহুতের এবং মাহুতকে দেখিলে হাতির স্মরণ হয়। পদ ও অর্থের যে সম্বন্ধ, তাহাকে বাচ্যবাচক ভাব বা শক্তি বলা হয়। এই শক্তি মীমাংসকমতে একটি পৃথক্ পদার্থ। নৈয়ায়িকাদির মতে তাহা ঈশ্বরেচ্ছা স্বরূপ। অতএব উভয়মতেই সেই সম্বন্ধ নিত্য। মীমাংসক মতে শব্দ নিত্য এবং তাহার অর্থ আকৃতি বা জাতিও নিত্য। ন্যায়মতে শব্দ অনিত্য এবং তাহার অর্থ নিত্য ও অনিত্য দুই প্রকার। কিন্তু তাহাদের শক্তিরূপ সম্বন্ধ ঈশ্বরেচ্ছারূপ হওয়ায় সমবায় সম্বন্ধের ন্যায় নিত্য।

সংস্কৃত ভাষায় যে যে শব্দের অনাদিকাল হইতে যে যে অর্থে স্বাভাবিক প্রয়োগ হইয়া আসিতেছে, সেই অর্থে পদের শক্তি বা নিত্যসঙ্কেত স্বীকার করা হয়। পিত্রাদি কৃত যে পুত্রাদির নাম এবং বিভিন্ন শাস্ত্রকার কল্পিত যে সংজ্ঞা, (১৮) তাহাতে নিত্যসঙ্কেত

১৪. প্রকারতানবচ্ছিন্ন বিশেষ্যত্বং মুখ্যবিশেষ্যত্বম্। যাহা অন্যের বিশেষণরূপে জ্ঞাত না হইয়া কেবল বিশেষ্যরূপেই জ্ঞানের বিষয় হয় তাহাকে 'মুখ্যবিশেষ্য' বলা হয়।

না থাকিলেও আধুনিকসঙ্কেত আছে (১৫) কেহ কেহ আধুনিক সঙ্কেতকেও শক্তিরূপে স্বীকার করিয়াছেন (১৬) অপভ্রংশশব্দ—যেমন-গাছ মাছ গরু ঘোড়া ইত্যাদি শব্দ হইতেও অর্থবোধ হয়, ইহা সকলেরই স্বীকার্য। অতএব সাধুশব্দের ন্যায় অপভ্রংশ শব্দের তত্তৎ অর্থে শক্তি স্বীকার্য কিনা ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় যে, একটি মূল শব্দ দেশভেদে উচ্চারণের দোষে নানা 'বিকৃত রূপে পরিবর্তিত হয়। সেই নানা অপভ্রংশশব্দের নানা শক্তি স্বীকার করা অপেক্ষা একটি মূল শব্দের শক্তি স্বীকার করাই সঙ্গত। অপভ্রংশ শব্দের বাচকতা শক্তি না থাকিলেও তাহার দ্বারা মূলশব্দের স্মরণ হইয়া অর্থবোধ হয়। যেমন—শিশুদের মুখে বিকৃত বা অব্যক্তশব্দ শুনিয়া তাহা দ্বারা অবিকৃত শুদ্ধ শব্দের স্মরণ হয় এবং তাহা দ্বারা অর্থবোধ হয় (১৭)। কিন্তু দীর্ঘকাল কেবল অপভ্রংশশব্দ ব্যবহারের ফলে যাহাদের মূলীভূত শুদ্ধ রূপের জ্ঞান নাই, তাহাদের পক্ষে শক্তি ভ্রমাধীন শাব্দবোধ স্বীকার করা হয় (১৮)। কেহ কেহ সাধুশব্দের ন্যায় অপভ্রংশশব্দেরও বাচকতা শক্তি স্বীকার করিয়াছেন। (১৯)

অন্বিতাভিধানবাদী প্রভাকরের মত। সর্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রভাকর মীমাংসকের মতে, পদের মধ্যে যে অর্থবোধানুকূল শক্তি আছে, সেই অর্থটি কি তাহা বিচার করিলে দেখা যায় যে, সামান্যতঃ কার্যান্বিত স্বার্থই পদের বাচ্য অর্থ। পদের শক্তিজ্ঞান যে প্রথমতঃ বৃদ্ধ ব্যবহারদর্শন হইতেই হয় তাহা সর্বসম্মত (২০)। গাম্ আনয় অশ্বং বধান অশ্বমানয় গাং বধান ইত্যাদি উত্তমবৃদ্ধের বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং মধ্যমবৃদ্ধের তন্মূলক গবানয়নাদি কার্য দর্শন করিয়া পার্শ্বস্থ বালক কার্যান্বিত গোত্বাদি অর্থে গবাদিপদের শক্তি অবধারণ করে। অতএব প্রাথমিক শক্তিগ্রহ অনুসারে সর্বত্র কার্যান্বিত স্বার্থই পদের অর্থ, এবং লিঙ্ লোট্ ইত্যাদি বিভক্তিযুক্ত কার্যবোধক বাক্যই প্রমাণ, যেহেতু যাহা শাব্দানুভবরূপ প্রমার করণ হইবে তাহাই প্রমাণ হইতে পারে। সিদ্ধার্থবোধক (রামঃ গচ্ছতি ইত্যাদি) বাক্যের প্রামাণ্য নাই। কার্যান্বিত স্বার্থের বোধক না হওয়ায় তাহা শাব্দানুভবের জনক নহে। ঐ রূপ বাক্য হইতে তত্তৎ পদার্থের স্মৃতি হইয়া তাহাদের অসংসর্গের অগ্রহ মাত্র হইয়া থাকে

---

১৫. যেমন, ন্যায়বৈশেষিকমতে 'গুণ' শব্দটি রূপ রসাদি ২৪টি পদার্থে, সাংখ্যমতে সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিনটিতে, মীমাংসকমতে প্রধানের উদ্দেশ্যে বিহিত দ্রব্য দেবতাদি অপ্রধান অর্থে, বৈয়াকরণমতে 'অদেঙ্ গুণঃ' এই সূত্রোক্ত বিশেষ অর্থে, আলঙ্কারিকগণের মতে মাধুর্য, ওজঃ ও প্রসাদ এই তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১৬ আজানিক শ্চাধুনিক : সঙ্কেতো দ্বিবিধো মতঃ।
নিত্য আজানিকস্তত্র যা শক্তিরিতি গীয়তে।
কাদাচিৎকস্ত্বাধুনিকঃ শাস্ত্রকারাদিভিঃ কৃতঃ॥ (শব্দশক্তি প্রঃ)

১৭. নব্যাস্তু ঈশ্বরেচ্ছা ন শক্তিঃ কিন্তু ইচ্ছৈব, তেনাধুনিকসঙ্কেতিতেঽপি শক্তিরস্ত্যেবেত্যাহুঃ।
(সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী)

১৮. অম্বাম্বেতি যথা বালঃ শিক্ষমাণঃ প্রভাষতে।
অব্যক্তং তদ্বিদাং তেন ব্যক্তে ভবতি নিশ্চয়ঃ॥
এবং সাধৌ প্রযোক্তব্যে যোঽপভ্রংশঃ প্রযুজ্যতে।
তেন সাধুব্যবহিতঃ কশ্চিদর্থোঽভিধীয়তে॥ (বাক্যপদীয় ১।১৫২, ১৫৩।)

১৯. পারম্পর্যাদপভ্রংশা বিগুণেষ্বভিধাতৃষু।
প্রসিদ্ধিমাগতা তেষু যেষাং সাধুরবাচকঃ। (বাক্যপদীয় ১/১৫৪)

২০. সা চ শক্তিঃ সাধুম্বিবাপভ্রংশেম্বপি শক্তিগ্রাহক শিরোমণের্ব্যবহারস্ত তুল্যত্বাৎ।
(বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত মঞ্জুষা, পৃ. ৬১)

ইহা সর্বসম্মত যে, পদ কেবল স্বার্থবিষয়ক শাব্দবোধ জন্মায় না। বাক্যের অন্তর্গত হইলেই পদ অর্থবোধক হয়, বাক্যবহির্ভূত পদের প্রয়োগ নিষ্ফল এবং ঐ রূপ পদ বাচক নহে ধ্বন্যাত্মক। অতএব দেখা যায় যে, একটি পদ যে কোন বাক্যের অন্তর্গত হউক তাহা কোন না কোন পদার্থের সহিত অন্বিত স্বার্থবোধকেই জন্মায়, অতএব কেবল স্বার্থে পদের শক্তি স্বীকার করা যায় না। শাব্দবোধের জনক যে কোন বাক্যে বিভিন্ন পদের পরিবর্তন হইলেও কার্যতাবোধক লিঙ্ লোট্ তব্যাদি যে কোন একটি পদ থাকিবেই, অতএব বৃদ্ধ ব্যবহার মূলক আদ্য ব্যুৎপত্তি অনুসারে সাক্ষাৎ পরম্পরা সাধারণ কার্যত্বান্বিত স্বার্থেই পদের শক্তি স্বীকার করা উচিত। ইহাই কার্যান্বিত স্বার্থবাদ। এই কার্যান্বিত স্বার্থবাদই মুখ্য প্রভাকর সিদ্ধান্ত। পরবর্তিকালে 'সিদ্ধার্থবোধক বাক্য হইতেও শাব্দবোধ হয়' এই বহু বাদিসম্মত সিদ্ধান্ত। উপেক্ষা করিতে না পারিয়া নব্য প্রাভাকর সম্প্রদায় কার্যতা অংশ পরিত্যাগ পূর্বক ইতরান্বিত স্বার্থে পদের শক্তি স্বীকার করিয়াছেন।

অভিহিতান্বয়বাদী ভট্টমীমাংসকের মত। 'অর্থস্য তন্নিমিত্তত্বাৎ' এই জৈমিনি সূত্র এবং "পদানি স্বং স্বমর্থমভিধায় নিবৃত্তব্যাপারাণি অথেদানীং পদার্থা অবগতাঃ সন্তো বাক্যার্থমবগময়ন্তি" এই শাবরভাষ্য অনুসারে কুমারিল ভট্ট অভিহিতান্বয়বাদ স্বীকার করিয়াছেন। পদের দ্বারা অভিহিত পদার্থই অন্বয়বোধের জনক হয়, ইহাই তাহাদের মত (২১)। পদ অভিধা শক্তি দ্বারা পদার্থমাত্রের অভিধান বা উপস্থাপন করিয়াই বিরত ব্যাপার হওয়ায় বাক্যার্থবোধে তাহার ব্যাপার থাকিতে পারে না, যেহেতু "শব্দবুদ্ধিকর্মাণং বিরম্য ব্যাপারাভাবঃ"। পদ জন্য যে পদার্থের উপস্থিতি (অভিধান) হয়, তাহা স্মৃত্যাত্মক অথবা স্মৃত্যনুভব বিলক্ষণ, (২২) এই দুইটি মত পাওয়া যায়। 'তত্ত্ববিন্দু' গ্রন্থে বাচস্পতি মিশ্র দুইটি মতেরই আলোচনা করিয়াছেন।

পদার্থ যে বাক্যার্থবোধের করণ, ইহা অন্বয়ব্যতিরেক সিদ্ধ। যেহেতু পদার্থের জ্ঞান ব্যতীত বাক্যার্থের বোধ হয় না এবং তাহা থাকিলেই বাক্যার্থবোধ হয়। পদকে বাক্যার্থবোধের করণ বলা যায় না, যেহেতু পদজ্ঞান থাকিলেও পদার্থের উপস্থিতি না হইলে অন্বয়বোধ হয় না (২৩) এবং পদ জ্ঞান না থাকিলেও পদার্থের উপস্থিতি দ্বারা অন্বয়বোধ হইতে দেখা যায়। যেমন—

> পশ্যতঃ শ্বেতমারূপং হ্রেষাশব্দং চ শৃণ্বতঃ।
> খুরনিক্ষেপ শব্দং চ শ্বেতোঽশ্বো ধাবতীতি ধীঃ।
> দৃষ্টা বাক্য বিনির্মুক্তা ন পদার্থৈর্বিনা ক্বচিৎ॥ (শ্লোকবার্তিক পৃ. ৬৬৭)

যাহাতে গো অশ্বাদি বিশেষরূপ অব্যক্ত এইভাবে একটি শ্বেতরূপযুক্ত বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিলে এবং হ্রেষাধ্বনি শ্রবণ করিয়া অশ্বের অনুমান করিলে ও খুর নিক্ষেপধ্বনি শ্রবণ করিয়া ধাবন-ক্রিয়ার অনুমান করিলে পর এই অবগত শ্বেতপদার্থ, অশ্বপদার্থ ও ধাবন ক্রিয়ারূপ পদার্থ 'শ্বেতঃ অশ্বঃ ধাবতি' এইরূপ অন্বয়বোধ জন্মায়। এইরূপস্থলে পদ না থাকিলেও উপস্থিত পদার্থই যে অন্বয়বোধের হেতু, তাহা অবশ্য স্বীকার্য।

পদার্থ পদের শক্য বা বাচ্য, এবং বাক্যার্থ পদার্থের লক্ষ্য। ইহাদের মতে পদের দ্বারা যাহা বোধিত হয় তাহা শক্য এবং পদার্থের দ্বারা যাহা বোধিত হয় তাহা লক্ষ্য।

---

২১. সঙ্কেতস্য গ্রহঃ পূর্বং বৃদ্ধস্য ব্যবহারতঃ। পশ্চাদেবোপমানাদ্যৈঃ শক্তি-ীপূর্বকৈরসৌ॥ (শব্দ. শ. প্র. ২০)

২২. 'পদৈরভিহিতাঃ পদার্থা এব বাক্যার্থং প্রতিপাদয়ন্তীত্যাচার্যাঃ' (ন্যায়রত্ন মালা)

২৩. পদজন্য স্মৃত্যনুভববিলক্ষণ জ্ঞান বিষয়ীভূতাঃ পদার্থা অভিহিতা ইত্যুচ্যন্তে তাশদৃশ্চ আকাঙ্ক্ষাদ্যনুসারেণ স্বান্বয়মনুভাবয়ন্তীতি বাক্যার্থো লক্ষ্য ইত্যুচ্যতে (অদ্বৈতসিদ্ধি পৃঃ ৭০১

যদিও 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' ইত্যাদি স্থলে তীরাদিতে যে লক্ষ্যতা আছে তাহা পদাভিহিত পদার্থের দ্বারা স্মারিতত্ব, এবং বাক্যর্থে যে লক্ষ্যতা আছে তাহা পদাভিহিত পদার্থের দ্বারা অনুভাব্যত্ব। এইভাবে কিছু পার্থক্য থাকিলেও পদার্থবোধ্যত্ব উভয় স্থলে তুল্য। এইজন্যই পদার্থের দ্বারা পদার্থের লক্ষণাস্থলে পূর্ব সম্বন্ধ জ্ঞানকে অপেক্ষা করে, যেহেতু তাহা স্মারিত। এক সম্বন্ধীর জ্ঞান অপর সম্বন্ধীর স্মারক হয়। কিন্তু, পদার্থের দ্বারা বাক্যার্থের লক্ষণাস্থলে পূর্বসম্বন্ধ জ্ঞানের অপেক্ষা নাই, পরন্তু আকাঙ্ক্ষাদিজ্ঞানের অপেক্ষা আছে। যেহেতু বাক্যার্থ-মাত্রই অপূর্ব (পূর্বে অনধিগত), অতএব তাহাতে শক্যসম্বন্ধিতাজ্ঞান সম্ভবও নহে।

বেদান্তদর্শনের মত॥ পূর্বমীমাংসাদর্শন যেরূপ কর্মকাণ্ডীয় বেদবাক্যার্থ নিরূপণে প্রবৃত্ত, সেইরূপ উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শন বেদের জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ উপনিষদের অন্তর্গত বাক্যের অর্থনির্ণয়ে প্রবৃত্ত। বাক্যার্থ বিচার ব্যতীত বাক্যের তাৎপর্য অবধারণ সম্ভব নহে। শুদ্ধ ব্রহ্মেই যে বেদান্তের তাৎপর্য, তাহার নিরূপণ বেদান্তবাক্যের অর্থবিচারকে অপেক্ষা করে। এই জন্যই 'শ্রোতব্যঃ' এই শ্রুতিবাক্যের এবং 'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা' এই ব্রহ্মসূত্রের 'ব্রহ্মজ্ঞানানুকূল বেদান্তবাক্যার্থবিচারঃ কর্তব্যঃ' এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে।

বেদান্তিগণ বাগর্থবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া অন্বিতাভিধানবাদ ও অভিহিতান্বয়বাদ এই দুইটি মীমাংসকধারার মধ্যে কোন একটিকে অবলম্বন করিয়াছেন। যদিও "ব্যবহারে ভাট্টনয়ঃ" অর্থাৎ ব্যবহারিক প্রমাণ প্রমেয় নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া বেদান্তিগণ আপাততঃ ভট্ট মতকেই গ্রহণ করিয়াছেন—এইরূপ বলা হয় (যেমন প্রমাণ ষড়বিধ, অভাব নিত্যপরোক্ষ, ইত্যাদি), তথাপি বাক্যার্থ নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া অদ্বৈতবেদান্তের বিখ্যাত বিবরণ সম্প্রদায় অন্বিতাভিধানকে আশ্রয় করিয়াছেন। অবশ্য বাচস্পতিমিশ্র, চিৎসুখাচার্য প্রভৃতি ভট্টসম্মত অভিহিতান্বয়বাদকেই গ্রহণ করিয়াছেন (২৪)। সংক্ষেপশারীরককার সর্বজ্ঞাত্মমুনি অপক্ষপাতে দুইটি মতেই বেদান্তবাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন (২৫)।

অন্য কোন বাক্যের অর্থবিচারে বেদান্তিগণের প্রয়োজন নাই, তাঁহারা জীববোধক, ঈশ্বরবোধক এবং জীবেশ্বরের ঐক্যবোধক বেদান্তবাক্যের অর্থবিচারে প্রবৃত্ত। অন্বিতা-ভিধানবাদ স্বীকার করিলেও তাঁহারা ইহা স্বীকার করেন না যে, সকল বাক্যই ইতরপদার্থ সংসর্গযুক্ত স্বার্থের বোধক হইবে। 'যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ' এই ন্যায় অনুসারে তাৎপর্যভূত অর্থেই শব্দের প্রামাণ্য। অতএব তাৎপর্যের অনুপপত্তি বশতঃ কোন কোন স্থলে পদ অন্বয়ের বোধক না হইয়া অখণ্ড স্বার্থমাত্রের বোধক হইবে। কোন বাক্য যে অখণ্ডার্থের বোধক হইতে পারে, তাহা অন্য কোন দর্শনে স্বীকৃত হয় নাই, একমাত্র অদ্বৈতবেদান্তেই স্বীকৃত। তাঁহারা জীবব্রহ্মের ঐক্যবোধক 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্যকে অখণ্ডার্থবোধক বলিয়াছেন। সন্দর্ভের উপক্রম-উপ-সংহারাদি পর্যালোচনা করিয়া 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্যের অখণ্ড শুদ্ধচৈতন্যমাত্রে তাৎপর্য, তাহা জানা যায়।

বাক্য যে অখণ্ডার্থক অর্থাৎ শুদ্ধবস্তুমাত্রবোধক হইতে পারে তাহা অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, সাধারণতঃ বাক্যমাত্রই একপদার্থে অপর পদার্থের অন্বয়বোধক হইলেও কোন কোন স্থলে লৌকিক ও বৈদিক উভয়প্রকার বাক্যই একটিমাত্র বস্তুর বোধ জন্মাইয়া থাকে। যেমন,—লোকস্থলে

---

২৪. তস্মাদভিহিতান্বয়বাদ এব শ্রেয়ানিতি কেচিদাচার্যাঃ। (আচার্যাঃ-বাচস্পতিমিশ্রাদয়ঃ) (চিৎসুখী)

২৫. অভিহিত ঘটনা যদা তদানীং স্মৃতিসম বুদ্ধিযুগং পদে বিধত্তঃ।
পরদৃশি পুনরন্বিতাভিধানে পদযুগলং স্মৃতিযুগ্মমেব তাবৎ॥ (সংক্ষেপ শারীরক)

॥ আপনার পারিবারিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন প্রয়োজন ॥

পরিবারে প্রত্যেকটি বিবাহ অবশ্যই রেজিস্ট্রী করান দরকার। কারণ অধুনা ব্যবহারিক জীবনের প্রতিক্ষেত্রে বিবাহ প্রমাণপত্র একান্ত প্রয়োজন।

আপনাকে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন কিভাবে সাহায্য করতে পারে তা দেখুন:

(১) বর্তমান দুর্মূল্যের দিনে রেজিস্ট্রী বিবাহে খরচ অতি সামান্য।

(২) ইহা চিরাচরিত হীন পন-প্রথা নিবারণে সাহায্য করে।

(৩) সম্পত্তি সংক্রান্ত দাবী নিষ্পত্তিকরণে বিবাহ সার্টিফিকেট এক অতি মূল্যবান দলিল।

(৪) পাশপোর্ট সংক্রান্ত ব্যাপারে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

(৫) বহুবিবাহ এবং শিশু-বিবাহের মত প্রাচীন সামাজিক কু-প্রথা দূরীকরণে রেজিস্ট্রী বিবাহের গুরুত্ব অপরিসীম।

(৬) রেজিস্ট্রী বিবাহ দাম্পত্য জীবনে অধিক নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়।

এ ব্যাপারে বিশদ বিবরণের জন্য নিকটস্থ সাবরেজিস্ট্রী অফিসে অথবা কলিকাতায় মহাকরণের ৫নং ব্লকের নীচতলায়, রেজিস্ট্রার জেনারেল অফ্ বার্থস, ডেথস্ এ্যাণ্ড ম্যারেজেসের অফিসে যোগাযোগ করুন।

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥

'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' 'প্রকৃষ্ট প্রকাশশ্চন্দ্র' : 'অপ্রাপ্তয়োঃ প্রাপ্তিঃ সংযোগঃ 'ইত্যাদি বাক্য। বেদস্থলে তত্ত্বমসি ইত্যাদি বাক্য।

কোঽয়ং ? এই প্রশ্নের উত্তরে 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' এই বাক্য, অস্মিন নক্ষোমণ্ডলে কশ্চন্দ্রঃ ? এই প্রশ্নের উত্তরে 'প্রকৃষ্ট প্রকাশশ্চন্দ্রঃ' এই বাক্য এবং 'কঃ সংযোগঃ' এই প্রশ্নের উত্তরে 'অপ্রাপ্তয়োঃ প্রাপ্তিঃ সংযোগঃ' এই বাক্যের প্রয়োগ করা হয়। ঐরূপ উত্তর বাক্যের কোন্ অর্থে তাৎপর্য তাহা নিরূপণ করিতে গিয়া অদ্বৈত বেদান্তিগণ বলেন যে, যদ্‌বিষয়ক প্রশ্ন, উত্তরও তদ্‌বিষয়কই হওয়া উচিত, নতুবা তাহা অসম্বদ্ধ প্রলাপ হইবে। সম্মুখস্থ ব্যক্তিটি কে ? এই প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলা হইবে তাহা ব্যক্তির স্বরূপ পরিচায়কই হইবে, সেই ব্যক্তির স্বরূপকে বুঝাইতে গিয়া যত কথাই বলা হউক (যত পদের উচ্চারণ করা হউক) তাহার তাৎপর্য সেই ব্যক্তিস্বরূপেই, অন্য ক্রিয়া কারকাদি সংসর্গে তাহার তাৎপর্য থাকিতে পারে না, যেহেতু তাহা অজিজ্ঞাসিত।

[বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ৩-৪ ভাদ্র ১৩৯০ / ইং ২০-২১ আগষ্ট তারিখে প্রদত্ত রামলাল হালদার হরিপ্রিয়া দেবী স্মারক বক্তৃতা ১৩৮৯]

'কায়স্থ' শব্দের প্রাচীন উল্লেখ

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

'প্রজাপীড়ক রাজকর্মচারী' অর্থে 'কায়স্থ' শব্দের ব্যবহার গুপ্তযুগে রচিত যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে (১।৩৩৬) এবং ১১৫০ খ্রীস্টাব্দে লিখিত কাশ্মীরীয় পণ্ডিত কল্‌হণের 'রাজতরঙ্গিণী'তে (৪।৯০, ৬২১, ৬২৯ ইত্যাদি) দেখা যায়, একথা বহুদিন থেকে জানা ছিল। অবশ্য কল্‌হণ অষ্টম শতাব্দীর সূচনায় কাশ্মীরপতি চন্দ্রাপীড়ের প্রসঙ্গে শব্দটির প্রথম উল্লেখ করেছেন ; কিন্তু ঐ সময়ের পর থেকেই উত্তর-ভারতের কোনো-কোনো অঞ্চলে কায়স্থদের সম্প্রদায় গড়ে উঠছিল (যেমন নবম শতাব্দীর সঞ্জান তাম্রশাসনে উল্লিখিত বালভ-কায়স্থ এবং পরবর্তী-কালের মাথুর-কায়স্থেরা যথাক্রমে বলভী ও মথুরা-বাসী সম্প্রদায়), যদিও গোড়ায় কায়স্থ কর্মচারীদের মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যাধিক্য ছিল বলে বোধ হয়।

লেখমালায় 'অধিকরণ' কিংবা দলিলপত্র বোঝাতে 'করণ' শব্দ ব্যবহৃত দেখা যায়। দলিলপত্রের লেখক অর্থেও কারণিক বা করণিকের সঙ্গে 'করণ' শব্দের ব্যবহার পাই। এই অর্থে 'করণ-কায়স্থ' শব্দও ব্যবহৃত হত। জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষ বোঝাতে 'করণ' শব্দটি চলিত হয়েছিল এবং অভিধানে 'কায়স্থ' ও 'করণ' সমার্থক দেখা যায়। আমার Indian Epigraphical Glossaryতে এই সম্পর্কে লেখমালার সাক্ষ্য বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে।

যাহোক, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির রচনাকাল খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী ধরা হয়। বর্তমান শতকের সূচনার দিকে যেসব গুপ্ত আমলের তাম্রশাসন বঙ্গদেশে পাওয়া গিয়েছিল, তার মধ্যে ৪৪৩ খ্রীস্টাব্দে প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে প্রদত্ত দামোদরপুর তাম্রশাসনে সর্বপ্রথম নগর-শ্রেষ্ঠীর পরিচালনাধীন প্রথম-কায়স্থ প্রভৃতির দ্বারা গঠিত স্থানীয় পঞ্চায়েত সভার উল্লেখ দেখি। এই প্রতিষ্ঠান মধ্যযুগীয় রাজস্থানের চৌথিয়ার ন্যায়, যা নগরশেঠের পরিচালনাধীন ছিল এবং পটেল (গ্রামপ্রধান) ও পাটোয়ারী (কায়স্থের ন্যায় লেখক, গণক ও দলিলপত্র-রক্ষক কর্মচারী) প্রমুখ দ্বারা গঠিত হত। তাম্রশাসনে ব্যবহৃত 'প্রথম-কায়স্থ' (কখনো বা 'জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ') সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায়, এই ব্যক্তি কায়স্থশ্রেণী থেকে নির্বাচিত হয়েছিল। নগরশ্রেষ্ঠীও অবশ্যই নির্বাচনের ভিত্তিতে নিযুক্ত হতেন। এই সভার কার্যের মধ্যে একটি ছিল সরকারী জমিতে প্রজাপত্তনের ব্যবস্থা করা। বিশেষ করে সরকারী পতিত জমি বড় বড় খণ্ডে বিক্রয় করে লাখেরাজ দানের ব্যবস্থা করা হত। অনেক সময় বলা হয়েছে, ভূমিক্রেতার দানপুণ্যের এক ষষ্ঠাংশ ভূমীশ্বর রাজার প্রাপ্য ছিল বলেই এরূপ করা হত। কিন্তু বৃহৎ একখণ্ড ভূমি লাখেরাজ পেয়ে যিনি জমিদার সেজে বসতেন, তাঁর চেষ্টা ছিল জমিতে প্রজাপত্তন ও ভূকর্ষণ দ্বারা শস্যোৎপাদন, হাট-বাজার বসানো, গ্রামনগর ও দেবালয়াদি প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী ও প্রণালী খনন প্রভৃতি দ্বারা আয়ের ব্যবস্থা করা। এইভাবে জমির উন্নতির যতো বৃদ্ধি হত, ততোই সরকারের পক্ষে ঐ জমিদারীর চার পার্শ্বের ভূমিতে বেশীদামে প্রজাপত্তন সহজ হত। এই লাভ ছাড়াও কোনো-কোনো ক্ষেত্রে লাখেরাজ জমিদারীর অধিকারী অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হলে কিংবা রাজদ্রোহের ন্যায় কোনো গুরুতর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে, জমিদারী সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়ে যেত।

সংস্কৃত 'কায়স্থ' শব্দের স্বাভাবিক অর্থ 'শরীরস্থ' বা 'শরীরে অবস্থিত' অর্থাৎ যেন শরীরে সংলগ্ন বা শরীরের অংশবিশেষ। ক্ষুদ্র ভূস্বামী বা মহাজনের নিযুক্ত কায়স্থের পক্ষে এই অর্থ বিশেষ উপযোগী। কারণ এসব স্থলে কায়স্থসংজ্ঞক কর্মচারী আধুনিক গোমস্তার ন্যায় প্রভুর নিকটে বসে তাঁর প্রতিনিধিরূপে সমস্তকার্য নির্বাহ করত। 'গোমস্তা' (পারসিক ভাষার 'গোমাশ্‌তা') হচ্ছে খাজনাদির আদায়কারী ও হিসাবরক্ষক কর্মচারী। একজন

সম্রাট্ বা স্বাধীন নরপতির কাছে প্রধানমন্ত্রীর যে স্থান, ক্ষুদ্র ভূস্বামী বা মহাজনের কাছে তাঁর গোমস্তা বা কায়স্থের স্থান তদ্রূপ কিংবা তার চেয়ে বেশী।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা এখন বিবেচ্য হয়েছে। সেটা এই যে, শক-কুষাণ আমলের অভিলেখে দেখা যায় ঐ যুগে ইরানদেশীয় কতকগুলি কর্মচারীর পদ ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় প্রবেশ করেছিল, যেমন শরভঙ্গ (ক্ষুদ্র কোনো সংস্থা বা সেনাদলের নায়ক), গঞ্জবর (কোষাধ্যক্ষ), দিবির (দলিলপত্রের লেখক) ইত্যাদি। এর মধ্যে গঞ্জবর 'রাজতরঙ্গিণী'তে (৫।১৭৭) ব্যবহৃত দেখা যায় এবং শরভঙ্গ (সরোভঙ্গ বা সরভঙ্গ) বঙ্গ বিহার ও হিমালয় অঞ্চলের তাম্রশাসনে পাওয়া গিয়েছে। 'কোষাগার' অর্থে 'গঞ্জ' শব্দও 'রাজতরঙ্গিণী'তে (৪।৫৮৯) আছে। নিম্নে আমরা দেখতে পাব যে, এখন গুপ্তযুগের পূর্বেই শক-কুষাণ আমলের লেখমালায় 'কায়স্থ' শব্দের ব্যবহার পাওয়া যাচ্ছে। তবে কি এই শব্দটিও ইরানের শাসনব্যবস্থা থেকে ঐ আমলে ভারতে আমদানী করা হয়েছিল? দুঃখের বিষয়, ইরানী শাসনব্যবস্থায় এই রকমের কোনো শব্দ আমরা দেখতে পাই নে। ইরানদেশে খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত যে হখামনিশীয় বংশ রাজত্ব করেছিল, সেই বংশের আদিম লেখাবলীতে Khshayathiya (ক্ষায়থ্য) শব্দটি পাওয়া যায়। কিন্তু এই শব্দের উত্তরকালীন পারসিক এবং ভারতীয় রূপ হচ্ছে 'শাহি' অর্থাৎ 'শাহ্'। প্রাচীন ইরানীয় ভাষায় Khshayathiya Khshayathiyanam (অর্থাৎ রাজগণের রাজা বা সম্রাট্) কুষাণ রাজোপাধি Shaonano shao এবং উত্তরকালীন পারসিকভাষার 'শাহান শাহ্'। শক-কুষাণ আমলের ব্রাহ্মী অভিলেখে Khshayathiya শব্দ 'শাহি' আকারে ব্যবহৃত হয়েছে এবং সমুদ্রগুপ্তের সুপ্রসিদ্ধ এলাহাবাদ শিলাস্তম্ভলেখে Khshaythiya Kshayathiyanam কথাটিকে লেখা হয়েছে 'ষাহি-ষাহানুষাহি' আকারে। সুতরাং সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বের (আ: ৩৩৫-৭৬ খ্রীঃ) পূর্বে অথবা তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পরে শাহি বা ষাহি স্থলে শব্দটি খোলস বদলে 'কায়স্থ' আকার ধারণ করবে, এটা বিশ্বাসযোগ্য হয় না।

উপরে আমরা শক-কুষাণ আমলের যেসব অভিলেখে 'কায়স্থ' শব্দের ব্যবহার আছে বলে লিখেছি, সেইরূপ লেখসংখ্যা দুটি মাত্র। দুটিই বুদ্ধমূর্তিলেখ এবং মথুরা অঞ্চলে আবিষ্কৃত। তার মধ্যে একটি কুষাণবংশীয় সম্রাট্ বাসুদেবের রাজত্বকালীন, তারিখ কণিষ্কাব্দের ৯৩তম বর্ষ। এই কণিষ্কাব্দ ৭৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে গণিত শকাব্দব্যতীত আর কিছু নয়। সুতরাং অভিলেখটির তারিখ ১৭১ খ্রীস্টাব্দ। পূর্বে কেউ-কেউ কণিষ্কের রাজ্যারম্ভ থেকে গণিত অব্দটির সূচনা দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে ফেলতেন। এখন আফগানিস্থানের দশ্‌ত-এ-নাবুর নামক স্থানে আবিষ্কৃত কণিষ্কের পূর্ববর্তী কুষাণরাজ বিম বা দ্বিতীয় Kadphises-এর একখানি অভিলেখ আবিষ্কৃত হওয়ায় এই সমস্যার সমাধান হয়েছে বলা চলে। কারণ এই অভিলেখের তারিখ ৩২ খ্রীস্টাব্দ। কুষাণরাজ বিম অশীতিপর বৃদ্ধপিতা কুজুল বা প্রথম Kadphises-এর মৃত্যুর পর অর্থাৎ মধ্যবয়সে সিংহাসন লাভ করেছিলেন। সুতরাং তাঁর পক্ষে ৪০।৪৫ বৎসরের অধিককাল অর্থাৎ ৭৮ খ্রীস্টাব্দের পর পর্যন্ত রাজত্ব করা সম্ভব বোধ হয় না। আবার বিম এবং কণিষ্কের রাজত্বের মধ্যে দীর্ঘকালের ব্যবধান থাকাও অসম্ভব। তাই কণিষ্কের রাজ্যারম্ভ এবং শকাব্দের সূচনা ৭৮ খ্রীস্টাব্দে ঘটেছিল বলে বোঝা যায়।

আমাদের আলোচ্য দ্বিতীয় অভিলেখটিতে তারিখ নেই। কিন্তু দুটি অভিলেখের অক্ষরের তুলনামূলক বিচারে দেখা যায়, লেখদ্বয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কম। দুটি অভিলেখের ভাষাই সংস্কৃত-প্রাকৃত মিশ্রিত। এই সময়ে উত্তর-ভারতের লেখাবলীতে প্রাকৃত-ভাষাকে হটিয়ে সংস্কৃত আপন স্থান করে নিচ্ছিল; তবে প্রাকৃতের উচ্ছেদ তখনও সম্পূর্ণ হয় নি। অন্যান্য মূর্তিলেখের ন্যায় আলোচ্য অভিলেখদুটিও ক্ষুদ্র। প্রথম লেখে তিন

পংক্তি এবং দ্বিতীয় লেখে দু-পংক্তি মাত্র উৎকীর্ণ দেখা যায়। অভিলেখদুটির পাঠ এবং ব্যাখ্যা নিম্নে আলোচিত হল।

প্রথম অভিলেখের পাঠ

[১ম পংক্তি] মহারাজস্য দেবপুত্রস্য বাসুদেবস্য সং ৯৩ হে ৪ দি ২৫ অস্যাং পুর্বয়ং ভগেত পি-

[২য় পংক্তি] তামহস্য স্বমতস্য অবিরুধস্য প্রতিমা ছত্রং চ প্রতিস্থাপিতং আর্য্য-ধর্মেশ্বরং আর্য-মাঘং।

[৩য় পংক্তি] আর্য ধনং পিতরং চ গর্বনংদিং মাতরং চ জিবসিরি পুরস্কৃত্য শ্রমণেনং কয়স্তে নং।

সংশোধিত পাঠ

মহারাজস্য দেবপুত্রস্য বাসুদেবস্য সংবৎসরে ৯৩ হেমন্ত-মাসে ৪ দিবসে ২৫। অস্যাং পূর্বায়ং ভগবতো পিতামহস্য স্বমতাবিরুদ্ধস্য প্রতিমা ছত্রং চ প্রতিষ্ঠাপিতং আর্য-ধর্মেশ্বরং আর্য-মাঘং আর্য-ধনং পিতরং গর্বনংদীং মাতরং জীবসিরিং পুরস্কৃত্য শ্রমণেন কায়স্থেন ॥

সংস্কৃত ছায়া

মহারাজস্য দেবপুত্রস্য বাসুদেবস্য সংবৎসরে ত্রিনবতিতমে হেমন্ত-মাসে চতুর্থে (পূর্ণিমান্ত-ফাল্গুনে) দিবসে পঞ্চবিংশে। অস্যাং পূর্বায়াং [তিথৌ] ভগবতঃ পিতামহস্য স্বমতাবিরুদ্ধস্য প্রতিমা ছত্রং চ প্রতিষ্ঠাপিতম্ আর্য-ধর্মেশ্বরম্ আর্য-মাঘম্ আর্য-ধনং পিতরং চ গর্বনন্দিনং মাতরং চ জীবশ্রিয়ং পুরস্কৃত্য শ্রমণেন কায়স্থেন ॥

বঙ্গানুবাদ

[কুষাণবংশীয়] মহারাজ দেবপুত্র বাসুদেবের [রাজত্বকালে] ৯ সংবতের (কণিষ্ক বা শকসংবতের) ত্রিনবতিতম [বর্ষে] হেমন্ত ঋতুর চতুর্থ মাসের ২৫ তারিখ। ঐ তিথিতে শ্রমণ নামক কায়স্থ কর্তৃক ভগবান্ স্বমতাবিরোধী পিতামহের (বুদ্ধের) প্রতিমা ও ছত্র প্রতিষ্ঠিত হল। [পুণ্যলাভের ব্যাপারে] আর্য-ধর্মেশ্বর, আর্য-মাঘ ও আর্য-ধন [নামক বৌদ্ধ ভিক্ষুগণকে] এবং নিজের পিতা গর্বনন্দী ও মাতা জীবশ্রীকে প্রধান স্থির করে [এই পুণ্যকার্য করা গেল] ॥

বাসুদেবের প্রকৃত রাজোপাধি ছিল 'মহারাজ-রাজাতিরাজ-দেবপুত্র'। সেকালে কখনো-কখনো মানুষের ব্যক্তিগত নাম 'শ্রমণ' দেখা যেত, যেমন শাতবাহন বংশীয় কৃষ্ণরাজের নাসিক গুহালেখে উল্লিখিত 'নাসিকবাসী শ্রমণ'। সেযুগের সরকারী বৎসর তিন ঋতুর দ্বারা বিভক্ত রূপে গণিত হত—গ্রীষ্ম (চৈত্র থেকে আষাঢ়), বর্ষা (শ্রাবণ থেকে কার্তিক) এবং হেমন্ত (মার্গশীর্ষ থেকে ফাল্গুন)। প্রতি ঋতুতে চার মাস কিংবা আট পক্ষ গণনা করা হত। বৌদ্ধেরা আপনাদের বুদ্ধের সন্তান বা বংশধর জ্ঞান করত। তাই আদিপুরুষ বা পূর্বপুরুষ অর্থে বুদ্ধদেবকে 'পিতামহ' বলা হয়েছে। পালি বা সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যে 'পিতামহ' শব্দে বুদ্ধের নির্দেশ দেখা যায় না। কিন্তু কতকগুলি প্রাচীন অভিলেখে এই প্রয়োগ পাওয়া গিয়েছে। মহাযানমতাবলম্বী বৌদ্ধেরা সমস্ত জীবের জন্য পুণ্যকার্য করত। মাঝে মাঝে তারা মাতাপিতা এবং অন্য কোনো লোকের পুণ্যলাভের বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করত। 'কয়স্তেনং' শব্দ 'স্থ' স্থলে 'স্ত' অর্থাৎ মহাপ্রাণতার অভাব পৈশাচী প্রাকৃতে দেখা যায়। 'ন' স্থলে 'নং' প্রাকৃত-ভাষায় কখনো কখনো ব্যবহৃত হত।

দ্বিতীয় অভিলেখের পাঠ

[১ম পংক্তি] [ভট্টি-সেন-পুত্রস্য ভট্টি-হস্তি-পুত্রস্য ভট্টি-প্রিয়স্য হংমোরকার কায়স্থস্য কুট্‌বিনিয়ে গ্রহদীনস্য ধীতু যশায়ে

[২য় পংক্তি] হস্তিস্য দত্তস্য চ মাতরে ভগবতো বুদ্ধস্য শক্যমুনিস্য প্রতিমা প্রতি-স্থাপিতা সর্ব্বসত্বানং হিত-সুখার্থ

সংশোধিত পাঠ

ভট্টি-সেন-পৌত্রস্য ভট্টি-হস্তি-পুত্রস্য ভট্টি-প্রিয়স্য হংমোরকার-কায়স্থস্য কুটুম্বিনিয়ে গ্রহদিন্নস্য ধীতু যশায়ে হস্তিস্য দত্তস্য চ মাতরে ভগবতো বুদ্ধস্য শাক্যমুনিস্য প্রতিমা প্রতিষ্ঠাপিতা সর্বসত্বানং হিত-সুখার্থং ॥

সংস্কৃত ছায়া

ভট্টি-সেন-পৌত্রস্য ভট্টি-হস্তি-পুত্রস্য ভট্টি-প্রিয়স্য হংমোরকার-কায়স্থস্য কুটুম্বিন্যা গ্রহদত্তস্য দুহিত্রা যশয়া হস্তিনঃ দত্তস্য চ মাত্রা ভগবতো বুদ্ধস্য শাক্যমুনেঃ প্রতিমা প্রতিষ্ঠাপিতা সর্বসত্বানাং হিত-সুখার্থম্ ॥

বঙ্গানুবাদ

ভট্টি-সেনের পৌত্র ও ভট্টি-হস্তীর পুত্র ভট্টি-প্রিয় হচ্ছেন হংমোরকার-কায়স্থ। তাঁর পত্নী যশা গ্রহদত্তের কন্যা এবং হস্তী ও দত্তের মাতা। সেই যশাকর্তৃক ভগবান্ শাক্যমুনি বুদ্ধের প্রতিমা প্রতিষ্ঠাপিত হল। এর উদ্দেশ্য সকল জীবের মঙ্গল ও সুখলাভ।

প্রতিমা-প্রতিষ্ঠাত্রী যশার স্বামী ছিলেন ভট্টি-প্রিয় এবং প্রিয়ের পিতা ও পিতামহের নামের পূর্বেও 'ভট্টি' শব্দটি দেখা যায়। কিন্তু যশার পুত্রদ্বয়কে ভট্টি বলা হয় নি। তাদের বয়স খুব কম ছিল, এটাই কি এর কারণ? 'ভট্টি' এই পরিবারের পদ্ধতি ছিল কিনা, তাও বলা কঠিন। তবে সেটা অসম্ভব না হতে পারে। 'ভট্টি' শব্দটি সংস্কৃত 'ভর্তৃ' শব্দের প্রাকৃত বিকার। বহুবচনের 'ভর্তারঃ' থেকে 'ভট্টার' ও 'ভট্টারক' উদ্ভূত হয়েছে এবং 'ভর্তৃ' থেকেই বোধ হয় ব্রাহ্মণের 'ভট্ট' উপাধি এসেছে। পঞ্চম শতাব্দীর একখানি ক্ষুদ্র সংস্কৃত কাব্যে রচয়িতার নাম ছিল বৎসভট্টি। 'হংমোরকার-কায়স্থ' শব্দের অর্থ বোঝা কঠিন। হয়তো যশার স্বামী প্রিয় হংমোরকার নামকস্থানে 'কায়স্থ' রূপে নিযুক্ত ছিল। 'শাক্যমুনি' অর্থ শাক্যকুলজাত মুনি। বুদ্ধের একটি নাম ছিল মুনীন্দ্র।

সংস্কৃত 'গ্রহদত্ত' প্রাকৃতে 'গহদিন্ন' হত এবং 'দিন্ন স্থলে 'দীন' হতে পারত।

॥ জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি বিধানে বামফ্রণ্ট সরকারের প্রয়াস ॥

বামফ্রণ্ট সরকারের জনস্বাস্থ্য কর্মসূচিতে রোগ নিবারণ ব্যবস্থা এবং গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের জন্য স্বাস্থ্য প্রযত্নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলার বিস্তীর্ণ পাথুরে অঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের জন্য ৯০০০ টি বিশেষ ধরণের নলকূপ খনন করা হয়েছে। এছাড়া গত পাঁচ বছরে ৮ কোটি টাকা ব্যায়ে ১২,৬৮৮টি নতুন জলের উৎস স্থাপিত হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে নলবাহী জল সরবরাহের জন্য ২৬৩টি এবং পৌর অঞ্চলগুলিতে ৩০টি প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলেছে। সারা রাজ্যে পানীয় জলের অভাব দূর করার জন্য ১০ বছরের এক বিরাট পরিকল্পনা হাতে নেবার কথাও ভাবা হচ্ছে।

পরিবার কল্যাণ প্রকল্পের কাজ জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, যক্ষা কলেরা প্রভৃতি রোগকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য রাজ্যব্যাপী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে বহুমুখী স্বাস্থ্য প্রকল্প চালু করা হয়েছে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং বীরভূমের সমগ্র এলাকাসহ রাজ্যের শতকরা ৭০ জন অধিবাসী কুষ্ঠ নিবারণী কর্মসূচীর আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে ২২,২১৭জন স্বেচ্ছাসেবক কাজ করে চলেছেন। বামফ্রণ্ট সরকার স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বরাদ্দ আগের চেয়ে অনেক বাড়িয়েছেন। হাসপাতালের রোগীদের মাথাপিছু দৈনিক খাদ্যের বরাদ্দ আগের চেয়ে ১ টাকা ৭৫ পয়সা বাড়ানো হয়েছে। রাজ্যে মোট ২৯টি নতুন হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছে এবং গত ছয় বছরে হাসপাতালগুলিতে ১১০০০ নতুন শয্যা সংযোজিত হয়েছে। এছাড়াও স্থাপিত হয়েছে ৩০টি প্রাথমিক ৪৮টি সহায়ক ৩৪০টি উচ্চ স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ৬টি গ্রামীণ হাসপাতাল। পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যে দুটি হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজ পরিচালনভার অধিগ্রহণ করা হয়েছে। ইউনানি কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। সুন্দরবন অঞ্চলে ভাসমান পরিবার কল্যাণ ও রোগ নির্ণয় কেন্দ্র স্থাপন করে সারা ভারতে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে। চলতি বছরে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়-বরাদ্দ দাঁড়িয়েছে প্রায় দুশো কোটি উনত্রিশ লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা।

সুসংহত শিশু-বিকাশ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রসূতি মা ও ৬ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের বিশেষ স্বাস্থ্য-প্রযত্নের আওতায় আনা হয়েছে।

ডাক্তারদের জন্যও বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্টাইপেণ্ড বাড়ানো থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে কর্মরত ডাক্তারদের বেশ কিছু সমস্যা ও অভাব অভিযোগ এর মধ্যেই দূর করা হয়েছে। একটা সুসংহত স্বাস্থ্যনীতি ও ভেষজনীতি গ্রহণের জন্য ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

এখনও অনেক কাজ বাকি রয়েছে। উন্নত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ছাড়া অনেক পরিকল্পনাই বাস্তবে রূপায়ণ করা কঠিন। তবু এই রকম এক কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হয়েই বামফ্রণ্ট সরকার যে কার্যসূচী হাতে নিয়েছেন সকলের সহযোগিতায় তাঁরা তা সম্পূর্ণ করতে পারবেন এ আশা তাঁরা রাখেন।

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥

১৩৯০ বঙ্গাব্দে উপহৃত পুস্তকের তালিকা

অধীর বিশ্বাস; প্রযত্নে আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬, প্রফুল্লকুমার সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

১। চোর, শালিখ আর ভূত—অধীর বিশ্বাস

২। পরের মানুষ— "

অরুণচাঁদ দত্ত ; ৩৮/৩৯ ফিয়ার্স লেন, কলিকাতা-১৩

১। ডায়বিটিকের জীবন ও চিকিৎসা—ডাঃ জি. সি. মুখার্জী

অর্চনা চৌধুরী ; পি—৮০০/এফ, লেকটাউন, কলিকতা-৮৯

১। মমি— অর্চনা চৌধুরী

২। পদচিহ্নের পদাবলী— "

অলোক রায় ; ১/৩ কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রীট, কলিকাতা-৪

১। ধূমকেতু—১ম বর্ষ, ২য়, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ১০ম সংখ্যা ১৩২৯

২। এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ

১৯১৮,	৩৬ খণ্ড,	৪৩ সংখ্যা
"	৫০ "	৪৬ "
"	৫০ "	৪৮ "

৩। চুঁচুড়া বার্তাবহ, ৩৯ বর্ষ, ২৯শ সংখ্যা, ২২ ফাল্গুন ১৩৩৮

৪। Karmayogin, 1909, 19 June, Saturday

৫। Young India, Vol. XII, No. 17, 1930

৬। মন্মথনাথ ঘোষ—১৮৮৪-১৯৫৯ : জন্মশতবর্ষ স্মরণিকা (২ কপি)

৭। মহাকাল, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৩৬

অশোক উপাধ্যায় ; ১৩, লক্ষ্মীনারায়ণ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-৬

১। কলিকাতা দর্পণ, ২য় সং—রাধারমণ মিত্র

২। চতুরঙ্গ, [ত্রৈমাসিক] ৪২ বর্ষ, ১ম-৪র্থ সংখ্যা ১৩৮৮ এবং ৪৩ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা ১৩৮৯

৩। ভারতী পরিষদ : বাংলা গ্রন্থ তালিকা, সাধারণ বিভাগ : নবপর্যায় ৮০০১-১৪৯৫০

৪। Gobra : The story of an Indian life from the memoirs of Gobardhan Das Chowdhury—A. K. Ray

৫। Bibliography of works of Asutosh Bhattacharyya

৬। বালুরঘাট উচ্চ বিদ্যালয় রত্নোত্তর জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ ১৩৯০ (১৯৮৩)

৭। National Library, India—Author Catalogue of printed books in Bengali language Vol. III এবং IV.

৮। গন্ধর্বকন্যা গওহরজান—উমানাথ সিংহ

৯। শালিখার ইতিহাস—হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১০। Dictionary of foreign words in Bengali, compiled by Pt. Gobinlal Bonnerjee & rev. & enl. by Jitendriya Banerjee, C. U. 1968.

১১। মুর্শিদাবাদের রাঢ় এলাকা—কমল বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যরঞ্জন বক্সী

১২। ত্রিপুরার সাহিত্যিক পত্রী, ১ম খণ্ড—ভূদেব ভট্টাচার্য

১৩। পক্ষান্তর—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪। প্রতিক্ষণ, শারদীয়া, ১৩৯০

১৫। প্রতিক্ষণ—১ম বর্ষ, ১ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৩
১৬। দারোগার দপ্তর—প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়
১৬০ সংখ্যা—উভয় সংকট : ১৬১ সংখ্যা—মানিনী : ১৬৫ সংখ্যা—খুনি কে ?
১৬৬ সংখ্যা—বাঁশী : ১৭১ সংখ্যা—অদ্ভুত চিঠি : ১৯৩ সংখ্যা—খুন না চুরি
১৭ ঐ ২য়-৫ম অংশ, ১৫২-৫৫ সংখ্যা— ঠগী কাহিনী
১৮ ঠগী-কাহিনী, ১ম-২য় খণ্ড একত্রে— প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়
১৯ অন্তঃপুরের আত্মকথা—চিত্রা দেব
২০ দাদামশাই কেদারনাথের পত্রাবলী—শান্তিপ্রিয় সমাদ্দার, সং সঙ্ক
২১ সবুজপত্র পত্রিকার সূচী—১-১০ বর্ষ, ১৩২১-১৩২৪—শিবদাস চৌধুরী সং
২২ গোলেবকাঅলি—উমাচরণ মিত্র ও প্রাণকৃষ্ণ মিত্র

অশোককুমার কুণ্ডু ; বাংলা ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি গবেষণা সংস্থা
২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকতা-৯

১। পত্রিকাপঞ্জী, ১ম খণ্ড—অশোককুমার কুণ্ডু

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; ১৪/২, ভট্টাচার্যপাড়া লেন, সাঁত্রাগাছি,হাওড়া-৪

১। পুঁথিপত্রের আঙিনায় সমাজের আলপনা—চিত্রা দেব
বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রসঙ্গ : ভাষা ও সাহিত্য—রশীদ আল ফারুকী
এক নাটক অনেক দৃশ্য—সুমথনাথ ঘোষ
তাসের পেখম—মৃগাঙ্ক রায়
বিষ্ণুপুরী রামায়ণ—চিত্রা দেব
কথাশিল্পী নজরুল—রাজিয়া সুলতানা
শূন্যপুরাণ—ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়
৯ বিচ্ছিন্ন অবিচ্ছিন্ন—পবিত্র মুখোপাধ্যায়
১০ ছন্দে ভারতের মুক্তিসংগ্রাম—জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়

আবদুল হক চৌধুরী ; প্রযত্নে মুহম্মদ আমিন চৌধুরী, অ্যাডভোকেট,
৩৮৯, নবাব সিরাজদ্দৌলা রোড, চট্টগ্রাম

১। সিলেটের ইতিহাস প্রসঙ্গ—আবদুল হক চৌধুরী
২। চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতি— "
৩। চট্টগ্রামের ইতিহাস প্রসঙ্গ— "

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ; ৬২, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

১। জাতি যেদিন গঠনপথে [A Nation in making]—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
অনুবাদক : ভূপেন্দ্রনাথ দাশ

ইণ্ডিয়ান বুক কনসার্ন ; ৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

১। জাহানারার আত্মকাহিনী—মাখনলাল রায়চৌধুরী

ইন্দু দাঁ ; ৫৯ জি, পারমার রোড, উত্তরপাড়া, হুগলী

১। বিরহ বীণ— ইন্দু দাঁ
ন্যাবারাম-চালুরাম— "
কল্পনার ক্যানভাসে— "
বকুলকোরক— "
বিক্ষুব্ধ সংলাপ— "
অবরুদ্ধ অভিমানে— "

৭। উষ্ণ হৃদয় শীতল হাওয়া—ইন্দু দাঁ
৮। মৌন নির্ঝর— ”
৯। মনশ্রী— ”
১০। পীযূষ পেয়ালা— ”
১১। কাব্য-সুষমা— ”

এ. কে. সরকার ; ৯/১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩
১। দেবী চৌধুরাণী—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২। রবীন্দ্র কথাসাহিত্য—শুকদেব সিংহ
৩। অভিজ্ঞান শকুন্তলা—কুড়রাম ভট্টাচার্য

এম. সি. সরকার ; ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩
১। প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প : (নির্বাচিত)—প্রেমেন্দ্র মিত্র
২। উইংস-এর আড়ালে—দেবনারায়ণ গুপ্ত
৩। রেশমী সুতোর ফাঁস—বিভূতিভূষণ চক্রবর্তী
৪। শেষ পাণ্ডুলিপি—বুদ্ধদেব বসু
৫। বিপ্রদাস—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৬। সবারে আমি নমি—কানন দেবী
৭। বীরেশ্বর বিবেকানন্দ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
৮। গড্ডলিকা—পরশুরাম
৯। চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প—পরশুরাম
অনেক দূরে অনেক আগে—ভবানী মুখোপাধ্যায়

এস. এন. ব্যানার্জী ; ২, রাখাল ঘোষ লেন, কলিকাতা-৮৫
১। Mother India, Pt. I—Mr. Quack (pseud)
২। ” ” Pt. II— ” ”
৩। অমর বাঙলা ১ম খণ্ড—কালকূট
৪। ” ২য় খণ্ড— ”
৫। Immortal Bengal—Mr. Quack (p seud)
৬। বাংলা সাহিত্যে ত্রিরত্ন—সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি ও কবিতা প্রকাশন ; ১০, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
১। রবীন্দ্র কবিতাশতক : ৩য় দশক—জগদীশ ভট্টাচার্য

কমল সমাজদার ; ৫, মুরারি মিত্র রোড, কলিকাতা-২৮
১। কালান্তর (শারদীয়) ১৩৮৮ ও ১৩৮৯
৩। আন্তর্জাতিক, ২২শ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা এবং ২৩শ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা

কামরুল আহসান ; ৩১/৬, পল্লবী, মীরপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ
১। ছোটদের নজরুল—কামরুল আহসান
২। নজরুল সাহিত্য পাঠের ভূমিকা— ”
৩। ছয়ফল মুল্লুক বদিউজ্জামান— ”

কালচারাল ইন্‌স্টিটিউট ; পঃ বঃ সরকার, ডাইরেক্টর
পি ১/৪, সি. আই. টি. স্কীম, VII, ভি. আই. পি. রোড, কলিকাতা-৫৪
১। Bulletin of the Cultural Research Inst. vol. XV, No. 1 & 2 : 1983
২। Special series no. 27 : Planning for the Scheduled Tribes and the Scheduled Castes.

৩। Special series no, 28 : To be with Santals.

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত ; পি ৭০৩, লেকটাউন, কলিকাতা-৫৫

১। সপ্তপদী—কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

গোপাল বসাক ; ১এ, সূর্য দত্ত লেন, কলিকাতা-৬

১। পর্যটকের দৃষ্টিতে এই বাংলা—গোপাল বসাক

চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় ; 'শ্যামা', স্টেশন রোড, ব্যারাকপুর

১। আমার লেখা—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২। রবীন্দ্র সাহিত্যে সমালোচনার ধারা—আদিত্য ওহদেদার

৩। ভোজ্য ও ভোজন—অমরেন্দ্রকুমার সেন

৪। সাহিত্য পত্রিকা—১ম খণ্ড [৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ খণ্ড আশ্বিন ১৩০২
" " ১২শ " চৈত্র "
১০ম " ৭ম " কার্তিক ১৩০৬
" " ৮ম " অগ্রহায়ণ "]

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় । [ভূদেব-সুশীলা স্মৃতিসংগ্রহ]

১।	অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত কবিরত্ন	বঙ্কিমচন্দ্র
২।	অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়	ভারতশিল্পের কথা
৩।	অর্চনা চৌধুরী	পদচিহ্নের পদাবলী
৪।	অজিতকুমার চক্রবর্তী	কাব্যপরিক্রমা
৫-৭।	অজিত দত্ত	কবিতাসংগ্রহ ; তখন স্বর্গ খুলিয়া গেল ; বাংলাসাহিত্যে হাস্যরস।
৮।	অজিতকৃষ্ণ বসু	দ্বাদশ সূর্য
৯।	অজিত রায়চৌধুরী	শক্তির সন্ধান
১০।	অজিত সেন	ক্যালেণ্ডারের কাহিনী
১১।	অতীন্দ্রনাথ বসু	নৈরাজ্যবাদ
১২।	অতীন্দ্র মজুমদার	সময় অসময় দুঃসময়
১৩-১৯।	অতুল সুর	দেবলোকের যৌনজীবন ; বাঙলা ও বাঙালী ; বাঙলামুদ্রণের দুশো বছর ; বাঙলার সামাজিক ইতিহাস ; বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ; ভারতে মূলধনের বাজার ; সদ্গোপ জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য।
২০।	অতুলানন্দ চক্রবর্তী	পদ্মাপারের পুরনো কথা
২১।	অর্ধেন্দু চক্রবর্তী ও অশোক সেন	প্রেম ও অপ্রেম
২২।	অনন্ত সাহা	আমি বাড়ী যাচ্ছি
২৩-২৫।	অনন্ত সিং	অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম ; চট্টগ্রামযুববিদ্রোহ ১ম ও ২য়।
২৬।	অনাদিকুমার দস্তিদার	ইন্দিরা
২৭।	অনিল বিশ্বাস	বাঁকাজল ; বিশশতকের বাংলা সাহিত্য
২৮-২৯।	অনিলেন্দু চক্রবর্তী	প্রেম ও কামনা ; বিশ্বসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কিশোর গল্প সংগ্রহ।
৩০।	অপূর্বকুমার রায়	বাঙলা গদ্যচর্চা : বিদ্যাসাগর গোষ্ঠী
৩১।	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী
৩২।	অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল	শরৎচন্দ্রের গ্রন্থবিবরণী

৩৩। অবিনাশ দাশগুপ্ত	লেনিন : রুশ মহাবিপ্লব ও বাঙলা সংবাদ-সাহিত্য
৩৪। অমরেন্দ্র দাস	রাজনারায়ণের কলকাতা
৩৫। অমল মিত্র	কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও নটরাজ শিশিরকুমার
৩৬। অমলশঙ্কর রায়	রবীন্দ্র মানস
৩৭। অমলেন্দু ঘোষ	দ্বৈতস্বর
৩৮। অমলেন্দু দাশগুপ্ত	মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
৩৯। অমলেশ মজুমদার	কুলকুণ্ডলিনী
৪০। অমিত বসু	সব প্রিয় ছায়া
৪১। অমিতা রায়	বিপ্লবী অবনীনাথ মুখোপাধ্যায়
৪২। অমিয় চক্রবর্তী	পারাপার
৪৩। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	পশ্চিম বাংলার গ্রামের নাম
৪৪-৪৫। অমিয়কুমার মজুমদার	বিবেকানন্দের বিজ্ঞান চেতনা; রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান মানস।
৪৬। অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়	জীবনশিল্পী শরৎচন্দ্র
৪৭। অমিয় রায় চৌধুরী	গল্প
৪৮-৫০। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য	অন্যোন্যদর্শন বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ; রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিম; রবীন্দ্রনাথ কেমন করে লিখতেন।
৫১-৫৩। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	জন্মশতবর্ষ স্মরণিকা; বাঙ্গালার প্রথম; সরস্বতী।
৫৪-৫৭। অরবিন্দ পোদ্দার	মানবধর্ম ও বাংলাকাব্যে মধ্যযুগ; রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব; রবীন্দ্রমানস।
৫৭। অরবিন্দ পোদ্দার ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথের কিশোর সাহিত্য
৫৮। অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়	সাঁঝবিহান
৫৯-৬২। অরুণ ভট্টাচার্য	ঈশ্বর প্রতিমা; নন্দনতত্ত্বের সূত্র; রবীন্দ্র সংঘ; আধুনিক বাংলা কবিতা এবং নানা প্রসঙ্গে; স্বনির্বাচিত কবিতা সঙ্কলন।
৬৩-৬৬। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	বাঙলা গদ্য পুঁথি; বাঙলা গদ্যের শিল্পী সমাজ; বীরবল ও বাংলাসাহিত্য; রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ।
৬৭। অরুণ সেন	বিষ্ণু দের রচনাপঞ্জী
৬৮। অশোককুমার কুণ্ডু	ভারতচন্দ্রের স্মরণাঞ্জলি
৬৯। অশোককুমার দে	বাংলা উপন্যাসের উৎস সন্ধানে
৭০। অশোক পালিত	শূন্যে হাত সাবধানী
৭১। অশোক মিত্র	সমাজ সংস্থা আশা নিরাশা
৭২-৭৩। অশোকবিজয় রাহা	ঘণ্টা বাজে পর্দা সরে যায়; পত্রাষ্টক
৭৪। অসীমকৃষ্ণ দত্ত	শস্যের ভিতর রৌদ্র
৭৫। অসীমা মৈত্র	শতবর্ষের আলোয়
৭৬। (বেগম) আখতার কামাল	বিষ্ণু দে'র কাব্য : পুরাণ প্রসঙ্গ
৭৭। আতোয়ার রহমান	সাহিত্য ও বিবিধ ভাবনা
৭৮-৮১। আদিত্য ওহদেদার	গ্রন্থবিদ্যা : কাগজ ও মুদ্রণ; রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনার কথা; রবীন্দ্র সাহিত্যের কয়েক দিক; সমালোচক রবীন্দ্রনাথ।

৮২।	আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	উজ্জয়িনী
৮৩-৮৫।	আনন্দ ঘোষহাজরা	দূরে পাঞ্চজন্য মেঘ ; বনস্থালী জুড়ে শঙ্খ হোক, শীত চলে যাচ্ছে।
৮৬।	আব্দুল মান্নান	নির্বাচিত প্রবন্ধ
৮৭।	আব্দুস সামাদ	বুকের ভিতর অন্য কেউ
৮৮।	আরতি দাস	দু প্রহরী
৮৯।	অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	শিল্পিত স্বভাব
৯০।	আশা গঙ্গোপাধ্যায়	পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
৯১।	আশিস মজুমদার	বঙ্কিম : বাংলার স্কট
৯২।	আশিস সান্যাল	সূর্যের প্রতিবেশী
৯৩-৯৪।	আশুতোষ ভট্টাচার্য	কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা ; সুন্দরী ইন্দোনেশিয়া।
৯৫।	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	নিষিদ্ধ বই
৯৬।	আহমদ ছফা	বাঙালী মুসলমানের মন
৯৭।	ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী	জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য
৯৮।	উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ	কাছাড়ের ইতিবৃত্ত
৯৯।	উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	গ্রন্থাবলী
১০০।	উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য	এলোমেলো জীবনের কয়েকটি অধ্যায়
১০১।	উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,	বৈশেষিক দর্শনম্
১০২-৩।	ঋষি দাস	আধুনিকা ; সোভিয়েত দেশের ইতিহাস।
১০৪।	এফ. এ. সাকীব	নির্ণিমিথ
১০৫।	এরিক ফন দানিকেন	বীজ ও মহাবিশ্ব
১০৬।	কনকভূষণ মুখোপাধ্যায়	অবসরে আমায় খোঁজ
১০৭।	কনহাইয়ালাল শেঠিয়া	নিগ্রন্থ
১০৮-৯।	কমল তরফদার	রাত্রির টানেল থেকে ; সন্নিহিত কোণ।
১১০।	কমল সরকার	শিল্পী-সপ্তক
১১১।	কল্যাণী দত্ত	শ্রাবস্তী
১১২।	কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়	মানুষ রবীন্দ্রনাথ
১১৩।	কানাইলাল দত্ত	পল্লীস্বাস্থ্য
১১৪।	কামাখ্যা ভট্টাচার্য	তুঙ্গভদ্রা
১১৫।	ক্যারেল চাপেক	নীল চন্দ্রমল্লিকা
১১৬-৭।	কালীপদ ভট্টাচার্য	রাজসূয় ; সোভিয়েত ঐতিহাসিক মহাকাব্য।
১১৮।	কালীপদ সরকার	ইতিহাস পুরুষ নেতাজী
১১৯-২১।	কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত	কবিতার রূপরূপান্তর ; দিনযাপন ; মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরকাল।
১২২।	কিশোর অভিধান	
১২৩।	কুঞ্জবিহারী দাস বাবাজী	ভক্তিরস প্রসঙ্গ
১২৪।	কুণাল সিংহ	প্রাচীন গ্রন্থসংগ্রহ
১২৫-৬।	কুমুদকুমার ভট্টাচার্য	আধুনিক শিক্ষা ও মাতৃভাষা ; উনবিংশ শতকের নিষিদ্ধ গ্রন্থ ও কবি গোবিন্দ দাস।

১২৭-৩০ ।	কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য	পথের গান; বাংলাদেশের গ্রন্থাগার; বিষয় শিরোনাম; যোগেন্দ্রনাথ সরকার।
১৩১ ।	কৃষ্ণ মিত্র	লগ্ন
১৩২ ।	কুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	বৈজ্ঞানিক জল-চিকিৎসা
১৩৩ ।	কেশবচন্দ্র সেন	প্রচারকগণের সভার বা শ্রীদরবারের নির্ধারণ
১৩৪ ।	কোকনদ চট্টোপাধ্যায়	কন্যাকুমারী পরিক্রমা
১৩৫ ।	ক্ষেত্রমোহন বসু	আলবার কথা
১৩৬ ।	গিরিশচন্দ্র বসু	সেকালের দারোগার কাহিনী
১৩৭ ।	গুণদাচরণ সেন	বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য
১৩৮ ।	গুরুদাস মুখোপাধ্যায়	মাকড়শা মন ও অন্যান্য কবিতা
১৩৯-৪৪ ।	গোপালচন্দ্র রায়	অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র; জীবনানন্দ; বঙ্কিমচন্দ্র; রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রাবলী; শরৎচন্দ্র; সঞ্জীবচন্দ্র ও কিছু অজ্ঞাত তথ্য।
১৪৫	গোপাল হালদার	ভারতের ভাষা
১৪৬	গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু	বাংলার লৌকিক দেবতা
১৪৭	গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়	রাজকন্যা
১৪৮	গোবিন্দগোপাল সেনগুপ্ত	রাজনগরের ইতিহাস ও অন্যান্য রচনা
১৪৯	গোরাচাঁদ মিত্র	সতীদাহ
১৫০	গৌরকিশোর ঘোষ	পশ্চিমবঙ্গ এক প্রমোদ তরণী হা হা
১৫১-৩ ।	গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত	চীন-ভারত ও ভারত চীন পরিব্রাজক; প্রাচীন ভারতের পথপরিচয়; আমার ভারতীয় বন্ধুগণ (ফ্রীডারিথ ম্যাক্সমূলার)।
১৫৪ ।	চন্দ্রাবতী	কালের কড়চা
১৫৫ ।	চিত্রা দেব, সং	বিষ্ণুপুরী রামায়ণ
১৫৬ ।	চিন্মোহন সেহানবীশ	লেনিন ও ভারতবর্ষ
১৫৭ ।	জগদীশ ভট্টাচার্য	বন্দেমাতরম্
১৫৮ ।	জয়কুমার চট্টোপাধ্যায়	মহাপ্রহরী রবীন্দ্রনাথ
১৫৯-৬০ ।	জয়ন্ত সাহা	ঈথারে সজাগ; বাংলাদেশের হৃদয় হতে
১৬১ ।	জয়ন্তী সেন	তুষারে রোদ
১৬২ ।	জি. সি. দে	প্রিণ্টার্স গাইড
১৬৩ ।	জীবেন্দ্র সিংহ রায়	প্রফুল্ল চৌধুরী
১৬৪ ।	জে. এম. বসুলী	মরণে নাহি ভয়
১৬৫ ।	জ্ঞানেন্দ্রনাথ বক্সি	সপ্ত সিন্ধু
১৬৬ ।	জ্যোৎস্না সিংহ রায়	ক্রান্তি
১৬৭ ।	জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়	একটি ধানের শীর্ষের উপর
১৬৮ ।	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	গ্রন্থাবলী
১৬৯ ।	তরুণ গঙ্গোপাধ্যায়	নকশাল বিপ্লবের প্রথম দর্শন
১৭০ ।	তাপস গঙ্গোপাধ্যায়	শিক্ষার সন্ধানে পশ্চিমবঙ্গ
১৭১ ।	তারাপদ সাঁতরা	বাংলার দারু ভাস্কর্য
১৭২ ।	তারাশঙ্কর তর্করত্ন, অনু	কাদম্বরী
১৭৩ ।	তুলসী মুখোপাধ্যায়	অন্নদাস হেঁটে যায়

১৭৪।	তুষার চট্টোপাধ্যায়	ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি
৫৭৫।	ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	আমার ইউরোপ ভ্রমণ
১৭৬।	দক্ষিণারঞ্জন বসু	ভাইয়ের মুখ
১৭৭।	দিলীপ চট্টোপাধ্যায়	স্ফুলিঙ্গ
১৭৮।	দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়	রক্তকণিকারা জানে
১৭৯-৮০।	দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়	কাব্যে অভিসার ; বিষ্ণুপুর ঘরাণা ; সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু
১৮২ ৩।	দীনেশ দাস	কাস্তে ; পঁচিশজন সাম্প্রতিক কবি
১৮৪-৫।	দীনেশচন্দ্র সরকার	পাল-সেনযুগের বংশানুচরিত ; সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গে
১৮৬।	দীপক গোস্বামী	শরৎ রচনাপঞ্জী
১৮৭।	দীপক চন্দ্র	মনোজ বসু : জীবন ও সাহিত্য
১৮৮।	দীপক চৌধুরী	স্তেফান জোয়াইগের গল্প সংগ্রহ
১৮৯।	দীপঙ্কর নাথ	তোমাকে সুন্দর হতে হবে
১৯০।	দীপঙ্কর সেন	মুদ্রণ শিল্প
১৯১।	দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	লেনিন শতাব্দী
১৯২।	দুর্গাদাস সরকার	একটি গাছে একশ ফুল
১৯৩।	দুলালচন্দ্র দাস	বাংলা ছন্দের নানা কথা
১৯৪-৫।	দেবজ্যোতি বর্মণ	আধুনিক ইউরোপ ; যুগবাণী
১৯৬।	দেবব্রত রেজ	সাহিত্য ও বিজ্ঞান
১৯৭।	দেবীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	উত্তরায়ণ
১৯৮।	দ্বারকানাথ বসু, সং	জীবনী-কোষ
১৯৯।	দ্বিজদাস কর, সং	আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেনের ছন্দচর্চা
২০০।	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	মেঘদূত
২০১-৫।	দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ	আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য ; মোহিতলালের কাব্য পরিক্রমা ; রবীন্দ্রমন ও রবীন্দ্রসাহিত্য ; সাহিত্য ও শিল্পলোক ; সাহিত্যের আকাশ
২০৬।	ধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত	রাজার গাড়ী
২০৭।	নচিকেতা ভরদ্বাজ	বোরিস পাস্তেরনেকের কবিতা
২০৮।		নজরুল জন্মজয়ন্তী
২০৯-১০।	নলীনকান্ত গুপ্ত	কবি মনীষী ; রবীন্দ্রনাথ
২১১-৩১।	নারায়ণ চৌধুরী	অথ বর্ণপরিচয় কথা ; আত্মদর্শন ; আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়ন; উত্তর শরৎ বাংলা উপন্যাস ; ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁন ; কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র ; কথা সাহিত্য ; কাজী নজরুলের গান ; গান্ধীজী ; বাঙালীর গীত চর্চা ; রাগসঙ্গীত ও লোক সঙ্গীত; লঘুপক্ষ ; লিওটলস্টয় : জীবন ও সাহিত্য ; শিশু শিক্ষার ভাষা ; সমকালীন সাহিত্য ; সঙ্গীত পরিক্রমা : সাহিত্য ও সমাজ-মানস ; সাহিত্য-ভাবনা ; সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি ; সাহিত্যের

	নারায়ণ চৌধুরী	সমস্যা ; সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষে।
২৩২-৫।	নিখিল সেন	আমাদের নেহরু ; ইন্দিরা দূরদর্শিনী ; এশিয়ার সাহিত্য ; নার্স বিদ্যাবতী জ্যোতিঃ ; পুরনো বই।
২৩৬।	নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত	সুখৈষণা
২৩৭।	নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	বাণী বাহকরী
২৩৮।	নির্মলকুমার ঘোষ	শয়তানের সমবায়
২৩৯।	নির্মলেন্দু রায়চৌধুরী	বিশ্বসাহিত্যের রূপরেখা
২৪০।	নিরঞ্জন সরকার	জগদানন্দ রায়
২৪১।	নিশিকান্ত মজুমদার	অস্পৃশ্যতা বর্জন
২৪২।	২৮২নং দ্র°	
২৪৩।	নীরদচন্দ্র চৌধুরী	বাঙালী জীবনে রমণী ✓
২৪৪।	নীরদবরণ	অরবিন্দের সংগে কথাবার্তা
২৪৫।	নীরেন ব্যানার্জী	যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
২৪৬।	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	কবিতার কি ও কেন
২৪৭।	নীলরতন সেন	চর্যাগীতি কোষ
২৪৮।	নেপাল মজুমদার	মহাজাতি সদনের অধিকার প্রসংগে
২৪৯-৫৩।	পরিতোষ ঠাকুর, সং	বেদগ্রন্থমালা ১, ৩, ৪, ৫, ৭
২৫৪-৫।	পরিমল গোস্বামী	পত্রস্মৃতি ; যখন সম্পাদক ছিলাম
২৫৬।	পরেশ দত্ত	এই মন তৃষ্ণার্ত হৃদয়
২৫৭।	পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ভারতরত্নমালা
২৫৮।	পশুপতি চট্টোপাধ্যায়	শাশ্বত ভারত
২৫৯।	পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য	সুফীমতের উৎস সন্ধানে
২৬০-৬২।	পুলিনবিহারী সেন, সং	রবীন্দ্রপঞ্জী ; রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ; রবীন্দ্রায়ন ১ম
২৬৩।	পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ
২৬৪।	প্রদ্যোৎ গুহ	কোম্পানী আমলে বিদেশী চিত্রকর
২৬৫-৭।	প্রফুল্ল ঘোষ	ঋষি অরবিন্দ ; জগৎগুরু বিবেকানন্দ ; মহাত্মা গান্ধী।
২৬৮।	প্রফুল্লকুমার দত্ত	এই অন্ধকার আলো
২৬৯।	প্রফুল্লকুমার দাসগুপ্ত	উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম
২৭০।		পৌরাণিক অভিধান
২৭১।	প্রবাসজীবন চৌধুরী	ঈশ্বর অনুসন্ধানে
২৭২-৬।	প্রবোধচন্দ্র সেন	আধুনিক বাংলা গীতি কবিতা ; আমার রচনার তালিকা ; বাংলা ছন্দ সাহিত্য ; ছন্দ পরিক্রমা ; বাংলা ছন্দ সাহিত্য
২৭৭।	প্রভাতকুমার গোস্বামী	দেশাত্মবোধ ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক
২৭৮।	প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	গান্ধীকথা
২৭৯।	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	পৃথিবীর ইতিহাস
২৮০।	প্রমথ চৌধুরী	সনেট পঞ্চাশৎ
২৮১।	প্রবোধ সেনগুপ্ত	ভারতীয় মহাবিদ্রোহ

ক্রম	লেখক	গ্রন্থ
২৮২।	প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী	পূর্বাভাষ
	প্রাণকৃষ্ণ দত্ত	কলিকাতার ইতিবৃত্ত
২৮৩।	প্রিয়রঞ্জন চক্রবর্তী	জীবনবেদ
২৮৪।	প্রিয়দর্শন হালদার	ভগবতী দেবী
২৮৫।	প্রিয়দারঞ্জন রায়	বিজ্ঞান দর্শন ও ধর্ম
২৮৬।	প্রেমেন্দ্র মিত্র	শতাব্দী শতক
২৮৭।	ফকিরমোহন সেনাপতি	আত্মচরিত
২৮৮।	ফজল রাব্বি	ছাপাখানার ইতিকথা
২৮৯।	ফণীভূষণ আচার্য	আমরা ভাসানে যাচ্ছি
২৯০।		ফুলমণি ও করুণার বিবরণ
২৯১।	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	আনন্দমঠ ১২৮৯ ;
২৯২।	স্মারক গ্রন্থ	বন্দেমাতরম শত বার্ষিকী
২৯৩।	বসন্তকুমার দাস	মেদিনীপুরে স্বাধীনতার গণসংগ্রামে খেজুরী থানা
২৯৪।	বার্ণিক রায়	প্রতীক অরণ্য
২৯৫।	বাণী রায়	মোনালিসা
২৯৬-৭।	বাল্মিকী	রামায়ণ : ১ম ও ২য়
২৯৮-৯।	বিজনকুমার লোধ	বাংলা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ; সম্পাদকের কলমে
৩০০।	বিজয়কুমার দত্ত	অরণ্যশীর্ষে গোধূলি
৩০১-২।	বিজয় দেব	কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গণ; রবীন্দ্রনাথ ও এ্যাবসার্ড নাটক;
৩০৩-৫।	বিনয় ঘোষ	জনসভার সাহিত্য ; সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ; স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গ ✓
৩০৬।	বিনোদিনী দাসী	আমার কথা
৩০৭-৮।	বিপিনচন্দ্র পাল	ছোটদের লেখা ; সাহিত্য ও সাধনা
৩০৯।	বিভাসপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	ভক্তিরস
৩১০।	বিমলকুমার দত্ত	গ্রন্থাগার
৩১১।	বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	বিদেশীর চোখে প্রাচীন ভারত
৩১২-৩।	বিমলেন্দু চক্রবর্তী	জ্যোতির্ময় ; পাদপীঠ
৩১৪।	বিমানেশ চট্টোপাধ্যায়	কালো চশমার আড়ালে
৩১৫।		বিলাতী যাত্রা থেকে : স্বদেশী থিয়েটার
৩১৬।	বিশ্বকর্মা	লক্ষ্মীর কৃপালাভ : বাঙালীর সাধনা
৩১৭।	বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	গ্রন্থবিন্যার ক্রমবিকাশ
৩১৮।	বিষ্ণু দে	রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা
৩১৯-২০।	বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য	তামিল গল্প সঞ্চয়ন ; ভারতীয় ভক্তি সাহিত্য
৩২১-৫১।	বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	অমল মানুষ ; আমরা যে গান গাই ; আমার বাংলা ; আমার রাজা হওয়ার স্পর্ধা ; উচ্চারণ ; এই হাওয়া ; এক যে ছিল ; বাহবা সময় তোর সার্কাসের খেলা ; কালপুরুষ ; খাড়া পাহাড় বেয়ে ; চিড়িয়াখানা ; তিন পাহাড়ের স্বপ্ন ;

		তৃণ তরঙ্গ রৌদ্রে··· ; দুর্গমগিরি কান্তার মরু ; নির্বাচিত কবিতা ; পরবাসে খোঁজে স্বদেশ ; বেঁচে থাকার কবিতা ; ব্রাত্য পদাবলী ; ভিসা অফিসের সামনে ; মধুসূদন ও উত্তরকাল ; মহাপৃথিবীর কবিতা ; মানুষের অধিকার ; মানুষের মুখ ; মুখে যদি রক্ত ওঠে ; রবীন্দ্রনাথ উত্তর পক্ষ ; রাস্তায় যে হেঁটে যায় ; লখিন্দর ; শীতবসন্তের গল্প ; সত্তর আশির কবিতা ; সভা ভেঙ্গে গেলে ; সময় অসময়ের গল্প ; সেই মানুষটি যে ফসল ফলিয়েছিল ।
৩৫২ ।	বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অরুণ ভট্টাচার্য সং	এই হাওয়া
৩৫৩ ।	বীরেন্দ্র দত্ত	পাণিত্রাসে শরৎচন্দ্র
৩৫৪ ।	বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	নিশান নাও
৩৫৫ ।	বুদ্ধদেব বসু	হ্যেল্ডার্লিন-এর কবিতা
৩৫৬ ।	বৃন্দাবনচন্দ্র পুততুণ্ড	চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস
৩৫৭-৮ ।	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	বলদেব পালিত ; সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার
৩৫৯ ।	ব্রততী ঘোষ রায়	স্বর্ণলতা ছিঁড়ে যাক
৩৬০ ।	ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক	অপরাধ জগতের ভাষা
৩৬১-২ ।	ভবতোষ দত্ত	অর্থনীতির পথে ; চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র
৩৬৩ ।	ভবসিন্ধু দত্ত	ছত্রপতি শিবাজী
৩৬৪ ।	ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	আর্থিক সমতা
৩৬৫ ।	ভারতচন্দ্র রায়	ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী
৩৬৬ ।	ভি. আর. নাচপা	বীরেশলিঙ্গম
৩৬৭ ।	ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত	বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব ✓
৩৬৮ ।	ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়	আপনার মুখ আপনি দেখ
৩৬৯ ।	মণিময় মুখোপাধ্যায়	মনমর্মর
৩৭০-২ ।	মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	বাঁশীর ডাক ; রাগপ্রধান ; সংকলিতা ।
৩৭৩-৪ ।	মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	বাঙলার নব জাগরণের স্বাক্ষর ; বিবেকানন্দ জীবন জিজ্ঞাসা
৩৭৫ ।	মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	সংস্কৃতির সপক্ষে
৩৭৬ ।	মনোরমা সিংহ রায়	উত্তর নায়িকা
৩৭৭ ৮০ ।	মন্মথনাথ ঘোষ	সাহিত্যিক বর্ণপরিচয় ; রঙ্গলাল ; রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ; হেমচন্দ্র
৩৮১ ।		মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুরের জীবনী
৩৮২ ।	মহেন্দ্রনাথ দত্ত	প্যালেষ্টাইন ভ্রমণ কাহিনী ও ইহুদী জাতির ইতিহাস
৩৮৩ ।	মান য়ুন কান	আধুনিক চীন
৩৮৪ ।	মিরজা আব্দুল হাই	ছায়া প্রচ্ছায়া
৩৮৫ ।	মীরা দেবী	মানুষের কথা

৩৮৬।	মুজফ্ফর আহমদ	কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা
৩৮৭।	মুরারি ঘোষ	পূর্ববাংলা একটি উপনিবেশ
৩৮৮-৯।	মুহম্মদ এনামুল হক	মনীষা মঞ্জুষা ২য়
৩৯০।	মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী	আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ ; গীতাবোধ
৩৯১।	মোহম্মদ আবদুল কাইয়ুম	সাহিত্যিকী
৩৯২।	মৃত্যুঞ্জয় মাইতি	দূরের বন্ধু
৩৯৩-৪।	মৈত্রেয়ী দেবী	ন হন্যতে ; স্বর্গের কাছাকাছি
৩৯৫।	যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য	বাংলা পুথির তালিকা সমন্বয় ১ম
৩৯৬।	যোগনাথ মুখোপাধ্যায়	ইতিহাস অভিধান (ভারত)
৩৯৭।	যোগীন্দ্রনাথ সরকার	শতবার্ষিক স্মরণী
৩৯৮।	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	হিমালয় অভিযান
৩৯৯-৪০৩।	যোগেশচন্দ্র বাগল	বঙ্গ-সংস্কৃতির কথা; বেথুন সোসাইটি; ভারতের মুক্তিসন্ধানী ; মুদ্রণ শিল্পের গোড়ার কথা ; রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
৪০৪।	রণজিত রায়	ধ্বংসের পথে পশ্চিমবঙ্গ
৪০৫।	রণজিত কুমার সেন	আমার কবিতা তুমি
৪০৬-১৪।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	চিঠিপত্র ; ছন্দ ; জাপান যাত্রী ; জীবন স্মৃতি ; পারস্যযাত্রী ; বঙ্কিমচন্দ্র ; শিশুতীর্থ ; সংকলন। সং০ বিদ্যালয় পাঠ্যগ্রন্থ।
৪১৫-৭।	রমাপ্রসাদ দে	অনেক ক্ষতের চিহ্ন ; একপাখি ; বন্দীশব্দ
৪১৮।	রমেন্দ্রনাথ নাগ	হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রতিবেদন
৪১৯-২০।	রমেশচন্দ্র দত্ত	নব ভারত স্রষ্টা ; প্রবন্ধ সংকলন
৪২১-৭।	রাজকুমার মুখোপাধ্যায়	কবি ও কবিতা ; কুমারী আরভ্যার দিনপঞ্জী ; গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক ; গ্রন্থাগার পরিচালনা ও পুস্তকের যত্ন ; গ্রন্থাগার প্রচার ; গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অভিধান ; স্কুল কলেজের গ্রন্থাগার
৪২৮।		রাজমালা
৪২৯।	রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ	শ্রীকণ্ঠ ভবভূতি
৪৩০-১।	রাজ্যেশ্বর মিত্র	আর্যভারতের সঙ্গীতচিন্তা ; মুঘল ভারতের সঙ্গীত চিন্তা
৪৩২।	রাধারমণ মিত্র	কলকাতায় বিদ্যাসাগর
৪৩৩।	রামাই পণ্ডিত বিরচিত	শূন্যপুরাণ
৪৩৪।	রুদেন্দু সরকার	অনির্বান
৪৩৫।	রেজাউল করীম	বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ
৪৩৬-৭।	লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া	আমার জীবন স্মৃতি; রতনমুণ্ডা ও কয়েকটি গল্প
৪৩৮।	লরিন জিলিয়াকাস	ডাকের কথা
৪৩৯-৪৩।	লীলা বিদ্যান্ত	রবীন্দ্রজীবনের অনন্যা ২য়, ৩য়, ৪র্থ ; রবীন্দ্রজীবনের ভ্রষ্টলগ্ন ; রবীন্দ্রসাহিত্যে নারী
৪৪৪।	শওকত ওসমান	ভাব ভাষা ভাবনা

৪৪৫।	শঙ্কর চক্রবর্তী	আকাশের কথা
৪৪৬-৭।	শঙ্কর রুদ্র	এক দশক ; যেমন দেখি
৪৪৮।	শক্তিব্রত ঘোষ	বর্ষা কন্যা
৪৪৯।	শরৎ কুমার রায়	শিখগুরু ও শিখজাতি
৪৫০।	শশধর সিংহ	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
৪৫১-৪।	শান্তনু দাস	কাফের ; দীর্ঘশ্বাস মঞ্চে স্মৃতিময় ; বর্মের আড়ালে একা ; মধ্যাহ্নের ব্যাধ।
৪৫৫-৭।	শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য ; প্রেম ভালবাসা ইত্যাদি ; সংকলিত গল্প
৪৫৮।	শান্তি লাহিড়ী	ইন্দ্রের অসুখ
৪৫৯-৬১।	শামসুল হক	ঘুম গিয়েছে কুটুমবাড়ী ; বাংলা সাহিত্য ; হরফ পেলাম কি করে ; হৃদয়ের গন্ধ।
৪৬২।	শিবনারায়ণ রায়	জিজ্ঞাসা
৪৬৩।	শিবরাম চক্রবর্তী	রস সাহিত্যিক
৪৬৪-৫।	শিব সাধন ভট্টাচার্য	জ্যোতিষ কি বিজ্ঞান ; মানব ধর্ম
৪৬৬।	শিশির কুমার ঘোষ	রবীন্দ্রনাথের উত্তর কাব্য
৪৬৭।	শেখর নাহা	অন্য দ্বীপ দ্বীপান্তর
৪৬৮।	শেখর সেন	নতুন দিগন্ত
৪৬৯।	শোভন বসু	সিপাহী থেকে সুবাদার
৪৭০-২।	শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	আইনষ্টাইনের জীবন জিজ্ঞাসা ; মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী : পল্লী পুনর্গঠন ; সর্বোদয় ও শাসন মুক্ত সমাজ
৪৭৩।	শ্যামাপদ সিংহ	আত্মক্ষরিকা
৪৭৪।	শ্রীমৎস্বামী অনন্ত দাস বাবাজী	রসদর্শন
৪৭৫।	শ্রীপান্থ	যখন ছাপাখানা এলো
৪৭৬।	শ্রীমদ ভক্তিবিলাসতীর্থ গোস্বামী মহারাজ	গৌড়ীয় দর্শনে পরমার্থের আলোক
৪৭৭।	সখারাম গণেশ দেউস্কর	দেশের কথা ; স্মারকগ্রন্থ
৪৭৮।	সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়	সমন্বয় মার্গ
৪৭৯।	সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	জাতীয় আন্দোলনে
৪৮০।	সত্য গুহ	ঘর বাড়ী ও প্রেম
৪৮১।	সত্যেন্দ্রনাথ বসু	বিজ্ঞানের সংকট
৪৮২।	সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার	বিবেকানন্দ চরিত
৪৮৩-৫।	সন্তোষ কুমার অধিকারী	দিগন্তের মেঘ ; শহীদ যতীন দাস ও ভারতের বিপ্লব আন্দোলন।
৪৮৬।	সন্তোষ রঞ্জন সেনগুপ্ত	বর্ষপঞ্জী
৪৮৭।	সমরেশ মুখোপাধ্যায়	খাঁচা ভরা পক্ষী
৪৮৮।		সমালোচনা সংগ্রহ : ৭ম সং
৪৮৯।	সমীর কুমার গঙ্গোপাধ্যায়	ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান : ১ম খণ্ড
৪৯০।	সবিৎ শেখর মজুমদার	উড়ে চলি দক্ষিণে
৪৯১।	সরোজ আচার্য	সাহিত্যে শালীনতা ও অন্যান্য প্রবন্ধ

৪৯২	সাধনা সোম	গান্ধী পঞ্চায়েত
৪৯৩	সানাউল হক	ছড়া হক ঘরে ঘরে
৪৯৪	সারদারঞ্জন পণ্ডিত	রবীন্দ্র পরিচয়
৪৯৫		সাহিত্য দর্পণ
৪৯৬		সিলেট জেলা বিশেষ ইউনিয়ন ক্যাটালগ
৪৯৭	সুকুমার বসু	অপরাধ ও অপরাধী ; হিমালয়
৪৯৮	সুকুমার সেন	বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ
৪৯৯	সুখময় চক্রবর্তী	গণ বার্তা
৫০০	সুদীপ্ত চক্রবর্তী	ভুমিহীন যুদ্ধ
৫০১-২	সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়	অসমীয়া সাহিত্য ; স্বাতী তারকার দ্বীপে
৫০৩	সুধীর চক্রবর্তী	রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প
৫০৪	সুধীর কুমার মিত্র	হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ
৫০৫	সুনীল বিহারী ঘোষ	বিবেকানন্দ গ্রন্থপঞ্জী
৫০৬	সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়	প্রসঙ্গ ও প্রসঙ্গত বিভূতিভূষণ
৫০৭	সুনীল কুমার নন্দী	ভিন্নবৃক্ষ ভিন্নফুল
৫০৮-৯ ।	সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়	কবিতা : নিঃসঙ্গ প্রবাস ও মনোমোহন ঘোষ ; ভাষা পথিক হরিনাথ দে
৫১০ ।	সুনীল কুমার বসু	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫১১ ।	সুনীল কুমার রায়	গ্রন্থাগার গ্রামে ও নগরে
৫১২ ।	সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ	অচিন্ত্য ভেদাভেদ
৫১৩ ।	সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট সংকলন
৫১৪-৫ ।	সুবিমল মিশ্র	আসলে একটি··· ; হারাণ মাঝির ইত্যাদি
৫১৬ ।	সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়	গ্রন্থাগার দর্পণ ; গ্রন্থাগার বিজ্ঞান
৫১৭ ।	সুব্রত নন্দী	একা একা
৫১৮-২০ ।	সুব্রত রুদ্র	ঈশ্বরের জন্ম ; মহাত্মা ; সাত রাজার ধন এক মানিক
৫২১ ।	সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	জীবনকথা
৫২২ ।	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	ব্যাঘ্র কেতন হিউ টয়
৫২৩-৫ ।	সুভাষ সমাজদার	ঐতিহাসিক দুর্ঘটনা ; ঢেউ কথা কয়; বাইবেলের প্রেমকাহিনী
৫২৬ ।	সুরেশ ভদ্র	প্রত্যয়
৫২৭ ।	সুশীল কুমার গুপ্ত	রৌদ্র জ্যোৎস্না
৫২৮ ।	সুশীলকুমার দাসগুপ্ত	এজরা পাউণ্ডের নির্বাচিত কবিতা
৫২৯-৩০ ।	সুশীল রায়	আলেখ্য দর্শন ; স্মরণীয়
৫৩১-২ ।	সৈয়দ কওসর জামাল	ইউক্যালিপ্‌টাস ; নষ্ট অরণ্য
৫৩৩ ।	সোমপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়	কম্পিউটার আজ ও আগামীকাল
৫৩৪ ।	সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলাসাহিত্য
৫৩৫-৬ ।	সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভারতের শিল্পবিপ্লব ও রামমোহন ; শরৎচন্দ্র : দেশ ও সমাজ
৫৩৭ ।	সৌম্যেন অধিকারী	সাঁওতাল পদাবলী
৫৩৮ ।	স্বদেশরঞ্জন দত্ত	ঈশ্বরের সংগে দ্বন্দ্ব

৫৩৯ ।	স্বামী প্রভবানন্দ	নারদীয় ভক্তিসূত্র
৫৪০ ।	স্বামী বিবেকানন্দ	ভক্তিযোগ
৫৪১ ।	স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ	বনের ডাক
৫৪২ ।	স্বামী সোমানন্দ	পুরী জগন্নাথ ধাম
৫৪৩ ।	হরগোপাল বিশ্বাস	আমাদের খাদ্য
৫৪৪ ।	হর প্রসাদ শাস্ত্রী	উদ্দালক
৫৪৫ ।	হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়	উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ
৫৪৬ ।	(ভাষাবিদ) হরিনাথ দে	জন্মশত বর্ষ স্মারক
৫৪৭ ।	হিমাংশু জানা	জলের দুপায়ে ঝরে কথা
৫৪৮ ।	হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	রবীন্দ্র দর্শন
৫৪৯ ।	হেনা চৌধুরী	দেশবন্ধু দুহিতা অপর্ণা দেবী
৫৫০ ।	হেরম্ব চন্দ্র ভট্টাচার্য	ভারতবর্ষের ইতিহাস—বৃটিশ যুগ

এতদ্ব্যতীত কিছু সংখ্যক বাঙ্গালা সাময়িকপত্রের বিচ্ছিন্ন সংখ্যা।

1.	A. Mitra	Tribes and Castes of West Bengal
2-3.	A. K. Mukherjee	Book Selection Principles, etc. ; Reference & its tools
4-5.	A. K. Ohdedar	Growth of library in modern India ; Systematic bibliography and documentation
6-7.	A. K. Sur	Dynamics of synthesis in Hindu culturo, Folk elements in Bengali life
8.	A L. Ganguli	Edmund Burkces speech···
9.	A. P. Dasgupta	Asutosh Mukherjee
10.		Achievement in Soviet studies of India
11.	Acker, Hellen	School train
12.	Adler Ruth *Illus*	The sun and its family
13.	Aiken, H. D.	Age of ideology
14.	Aldiss, Brian W.	Male response
15.	Alokeranjan Dasgupta	Buddhadev Bose
16	Alvarez, A.	School of Doune
17.	Amal Ghosh	Ruby and rouge
18.	Amal Sarkar	Handbook of language and dialects of India
19.	Amar Kr Mukhopadhyay	Bengali intellectual tradition
20.	Amarnath Seth	J. P.
21.	Amarendra Laxman Gadgil	Vande Mataram
22	Amitabha Mukherjee	Transformatisn of caste

23	Amiya Kr. Banerjee	West Bengal Gazetteers : Bankura
24	Analyst	Maruti to Mafia
25		Ancient History—early Europe
26	Anderson, G. K.	Genius of oriental theatre
27	Arabinda Poddar	Renaissance in Bengal
28	Arnold Edwin Sir	Light of Asia and the Indian song of songs
29	Arun Chandra	Light to Superlight
30	Asiatic Society	Aunual report
31		Aspects of Indian poetics
32	Aswini Kumar Datta	Bhaktiyoga
33	Atma Prakash	Understanding Surgery : a family guide
34-5	Atulananda Chakrabarti	Lonesome pilgrim ; Recovery of India
36		Autumn Annual Vol. VII. 1968
37	Bagster, Hubert	Country practice
38	Balachandra Rajan	Too long in the west
39		Basic facts about the U· N·
40	Bauer, Steam	Saturday : a fable
41	Beavoir Simon de	Dijamila Boupacha
42	Bell, W.	Palgrave's golden treasury, etc. Bk. II
43	Bellow, Saul	Adventures of Augie March
44		Benoyendra Nath Sen birth centenary
45	Benoyendra Sengnpta	Book Selection ; Cataloguing ; Library Classification
46		Beowulf
47	Berlin Isaiah	Hedgehog and the fox
48		Bethune College & School centenary volume
49	Bhakti P. Mallik	Dictonary of the underworld argot
50	[Bidhanchandra Roy]	Towards a prosporous India···
51	Bimanbihari Majumdar	Militant nationalism in India
52	Blair and Kling	Partner in empire
53	Blythe, Ronalt	Treasonable growth
54	Bonnerji. J. C.	English philology
55	Bonophul	Betwixt dream and reality
56		Book reading habit : a survey
57	Bostock, Anna	Spring
58	Bown, Betty	Fly away home
59	Bowra, C. M.	Primitive song
60	Brahmagupta	Khandakhadyaka
61	Brajendranath Seal	Birth centenary Vol ; Quest eternal

62	Broad, Lewis	Winston Churchill
63	Brown, Leono	Dublin Castle
64	Buchan, John	Book of escapes and hurried journeys
65		Bulletin of the Victoria Memorial Vol. VI & VII 1972, 73
66	Bunyan John	Pilgrims progress
67	Butler	Erewhen
68	Byron, *Lord*	Letters and journals
69	C. R. Banerjee	Indian national bibliography
70		Caloutta Govt. College of art & craft centenary
71		Calcutta 1690-1900
72	Campbellker, James	Political trouble in India
73	Canuti H. J.	Park aenue net
74	Cantwell Smith, W.	Islam in modern history
75		Census of India 1951 :vol. vi : Bengal Sikkim, Chanderngore
76		Chants a kall de Ramprasad
77	Chekov, A. P.	Vladimir Yermilov
78	Chicherov, A. T.	India : eco. devel.in 16-18th centuries
79	Clark, I. D. L.	Dinobandhu CF Andrews
80	Classer, E.	Lectures on style and compostion
81		Classical readings from German literature
82		Columbus regional geographies
83		Congress souvenir
84		Constitution of the reviewing committee
85	Cooper, F.	Last of the Mohicans
86		Copyright rules 1958
87	Carlyle, T.	Past and present
88	Crossband, Margaret	Young ballet lover's companion
89	Cunningham, T. V.	Problem of style
90	Cury, Hilaire	Ivan Pavlov···
91	D. N. Datta	Libraries and their uses
92	D' Lewis, Mildred	Honourable sword
93	Daiches, David	Robert Burns
94		Contemporary Danish authors
95	Davies, J. L.	On the nature of man
96	Dazai, Osamu	Setting sun
97	De Beauvoir, Simone	Prime of life
98-99	D. P. Chattopadhyay	Nyaya philosophy ; Uttarayan

100	Deledda, Grazia	Mother
101	Derozio, H. L. V.	Memorial volume
102	Dharmavira	New objectives of greater endeavour
103	Dickens, Charles	Oliver Twist, ed by Edward Le Compte
104	Dickson, Mora	Baghdad & beyond
105		Dictionary of psychology
106	Diehl, K. S.	Early Indian imprints
107-8	Drinkwater, John *ed*	Shakespeare's As you like it ; Outline of literature
109	Dudley, D. R.	Civilization of Rome
110	Dumas, Alexandre	Flight to···
111	Durant, Will	Transition : a novel
112	Edwardes, Michael	Last years of British India
113	Ela Sen	Indira Gandhi : a biography
114		Essays, etc on ancient Rome
115		Exile literature : 1933 45
116	Eyre, Jane	Charlotte Bronte
117	Fairservis, W. A., *Jr.*	Origins of oriental civilisation
118	Faludy, George	My happy days in hell
119	Fenton, C. A.	Apprenticeship of Ernest Hemingway
120	Fielding, Henry	History of Tom Jones
121	Finch, Mathew	Beauty Bazar
122		Founders of philosophy
123	Fradier, Georges	East and west ··
124	Freeman, F. N.	How children learn
125	Freud, Sigmund	Totem and taboo
126	G. Rajagopalachari	Avvair : the great Tamil literature
127	G. B. Ghosh	Trends of information service in India
128	Gaev, Arkady	Boris Pasternank and Dr Zhivago
129-30	Gammon, Olive	Creation of the universe ; young angler's companion
131		Gandhi's India : one country one people
132-34	Gandhi, M. K.	Autobiography ; Collected works ; Bibliography
135		Ganga and Rhein
136	George, Eliot	Silas Marners
137	Giddings, F. H.	Principles of Sociology
138	Gilbert, Harding	By his friends
139	Glover, William	Little book of the cardinal virtue
140	Gogol Nikolai	Taras Bulba

141	Green, G. R.	English people : History of
142	Greenough, J. R.	Words and their ways
143	Gregory, Horace	Ovid : the metamorpmogis
144	Guggenheim, Peggy	Confesions of an art addict
145		Guide to the records in the State Archives of West Bengal
146	H. K. Choudhuri	God in Indian religion
147-8	H. P. Chattopadhyay	Indians in Africa ; Sepoy mutiny
149	Haffding, H	Psychology
150	Haldeman Linda	Last born of Elvinwood
151	Hall, Donald	String short to be saved
152	Hammerton John	Practical knowledge for all
153	Hamilton Edith	Roman way to western civilisation
154	Handke, Peter	Sorrow beyond dreams
155-6	Harinath De	Select papers ; souvenir
157	Harris, Frank	My life and loves
158	Harrod, L. M.	Library work with children
159	Hartman, Harold M.	Biology—the easy way
160	Heimann, Betty	Facets of Indian thought
161	Hemchardra Sarkar	Sivanath Sastri
162		Highroads of literature
163	Himansubhusan Sarkar	R. C. Majumdar felicitation
164		Hindusthan year Book
165	Horner, Lance	Tabooed road
166	Howe, Bea	Child in Chile
167-8	Humayun Kavir	Bengali novels ; Saratchandra Chatterjee
169	Huntington, E.	Main springs of civilisation
170	Huxley, Aldous	Antic hay
171	Hyland, F.	Johnson's lives of Swift and Pope
172	I.C. Sekhara Sastry	Learn colloquial Tamil
173	I. K. Gujral	October revolution : impact on
174	Illich I. D.	Energy and equity
175	India Agricultural Society	Horticultural bulletin
176		Introduction to subject study
177	Irving Washington	Sketch book
178	J. C. Mathur	Culural Scene
179	J.K. Mehta	Philosophical interrelaation of economics
180	Jagomohon Mukherjee	Bengali literature in English
181	James, Henry	Ambassadors

182	Jamuna Nag	Raja Rammohan Ray
183	Jasuat Naum	Essays on Soviet economy
184	Johnson, Nora	Step beyond innocence
185	Johnson, Samuel	Voltaire's Candide
186	J. L. Borges	Labyrinths
187	Joseph, H.	If this be treason
188	Joy, Charles R.	Young people of West Africa
189	K. Banerjee, *ed.*	As you like it
190	K. R. Srinivasa Iyengar	Indian literature since independence
191	Kalyan Datta	Seeds of the future
192	Kathleen, B.	Calcutta , past and present
193	Ker W. P.	(The) Dark ages
194	Kerridge, Eric	Agricultural revolution
195	Kirkbride, Ronald	Private life of Guy de Maupassant
196	Kling, B.B	(The) Blue mutiny
197	Knight, Charles	Works of William Shakespeare
198	Knipe, Humphrey	Dominant man
199	Kopf, David	British orientalism
200	Lamplugh. Lois	Rifle house friends
201	Larteguy, J.	Bronze drums
202	Lawrence, D.H.	Sea and Sardinia
203	Lewis, H.R.	Growth games
204	Lewis, Sinclair	Arrowsmith
205	Lila Majumdar	Our poet
206	Lillie, Beatrice	Every inch a lady
207	Long, James (*Rev*)	500 quotations
208	M. K Gandhi	Key to truth
209	M. L. Chakarbarti	Bibliography
210	M. M. Bhattacharya	Speeches and writings of eminent Indians
211	M. N. Roy	Quest for freedom
212	M. S. Rao	New psychiatry
213	McChurney, Ralph	(The) priest
214	McKenzie, John	Manual of ethics
215	McPherson, W.	Principles and methods in the study of English literature
216	Madhusudan Chatterjee	Ripples
217-19	Mahadevprasad Saha, *ed*	Necessity of atheism; Oriental proverbs; Shelley's socialism
220	Mailek, Norman	Presidential papers
221	Maitreyi Devi	Tagore and fireside

222	Malenbaum, W.	Prospects for India development
223	Miller, Keith	S. Mustaf Ali : cricketer
224-25	Manmatha Ghosh	Life of Girish Chunder Ghosh; Memoir of Kaliprasanna singh
226		Manmohon Ghose : Birth centenary
227	Mann, Thomas	Early sorrow
228	Manomohon Ganguly	Swami Vivekananda : a study
229		Manorama year Book
230	Marriott, T. W.	One act plays of today
231	Massinghan, H. T.	Great Victorians
232		Matching employment opportunities
233	Maurois, Andre	Ariel : a Shelly romance
234	Mayani, Zacharie	Etruscans begin to speak
235	Maycock, A. L.	Man who was orthodox
236	Meredith, George	Tragic Comedians
237	Mikes, George	Mortal passion
238-39	Montague, A.	Human heredity; on being human
240	Moraes, F. R.	Introduction to India
241	Mott, Michael	Master Entrick an adventure
242	Murari Ghosh	Calcutta—a study
243	Multing, Anthony	Arnold
244-45	Nanda Mukherjee	Netaji through German lens, Vivekananda's influence on Subhas
246-47	Narayan Chaudhury	Maharshi Devendranath Tagore; Saratchandra Chaterjee : his life & literature
248-52	National Library,	Bibliography of Indology, Carey exhibition brochure; Centenary brochure; Subject Catalogues 3vols; Swami Vivekananda centenary exhibition
253	Nautsolt, Phyllis	Abdoul Moumouni education in Africa
254	Needham, C. D.	Organising knowledge in libraries
255	Nirmal kumar Bose	Selections from Gandhi
256	Nishikanta Chattopadhyay	(The) yatras
257	Norrie, Ian	Hackles rise and fall
258	Nursing Das Agarwalla	Common script system
253	Orgler, Hertha	Alfred Adler : the man ..
260	Orwell, George	1984 : a novell
261	Orvis, Kenneth	Damned and the destroyed
262	P. K. Lohiya	Visvanagari
263	Parkinson, C. N.	East and west

264	Parrinder, Geoffrey	Asian religions
265	Parry, J. H.	(The) gauge of reconnaissance
266	Pearson, R.	Eastern interlude
267	Perry, M. H.	Making retirement pay
268	Phillip, E. E.	From sterility and impotency
269		Picadilly circus
270	Pio Baroja	Restlesness of Shanti Andia & ·····
271-72	Piyus Kanti Mahapatra	Folk culture of Bengal ; Folk lore library
273	Plimpton, G	Out of my league
274	Prabhas Chandra Lahiri	India partitioned and ·········
275	(Swami) Prabhavananda	Upanishads, breath of the eternal
276	Pradip Sinha	Nineteenth century Bengal
277	Prafulla Chandra Ghosh	Mahatma Gandhi as I saw him
278	Pratapranjan Majumdar	Paramahansa Ramakrishna
279	Priolkar	Printing press in India
280	Prithwindra Chakraborti	Baul
281	Puharich Andriya	Beyond telepathy
282 85	Pulin Bihari Sen	A book of English prose ; Lectures and addresses of Rabindranath Tagore; Rabindranath Tagore : contributions & translations ; works of Bipin Chandra Pal : a bibliography
286		Queen Victoria lectures
287	R. K. Dasgupta	Lenin on literature
288 90	Rabindranath Tagore	(The) co-operative principle; Shyamali; Tagore and Czechoslovakia
291		Raja Rammohan Ray : India's great social reformer
292	Ranajit Roy	(The) Agony of West Bengal
293	Randall, John L.	Psychokinesis : a study of paranormal phenomena
294	Rathindranath Ganguly	Dreams of John Pushkin
295	Rathindranath Tagore, *Tr.*	Poems from Puran
296		Rebellion 1857 : a symposium
297	Rhys, Ernest *ed.*	History
298	Rhys, Jean	Tigers are better looking
299	Robson, William A.	Politics and government at home and abroad
300	Rodwell, J. M. *tr.*	(The) koran
301	Rolland, Romain	Birth centenary of···

302	Roseberg, *Lord.*	Pitt
303	Rowe, A. W.	Active anthologies
304	Rugg, H. O.	Statistical methods applied to education
305	Russell, John	Eric Kleiber
306	S. Radhakrishnan	Search for truth
307	S. C. Ghosh	Bangladesh
308	S. C. Sengupta	Bankim Chandra Chatterjee ; Saratchandra : man and artist
309	S. K. Kapoor	Litary scene in Calcutta
310-11	S. K. Mukherjee	Development of libraries and library science; Library organization and library administration
312	S. S. Bhattacharaya	Bhutan in early ages
313	Sackey, Alex Q,	Africa unbound
314	Sandiford Peter	(The) Mental and physical life of school children
315	Sankar Sengupta	Bibliography of Indian folklore, etc.
316-17	Santosh Kr. Mitra	Blossoms in the dust; Vidyasagar and the regeneration of Bengal
318		Sarat Chandra Chatterjee : his life & literature
319	Sartre, Jean Paul	Age of reason
320	Satyajit Das	Selections from Indian journals
321-3	Scott, Walter	Ivanhoe : a romance;········· Tales of a grandfather
324		Sedition committee 1918 : report
325-26	Selley, F.G.	Bacon's essays; Burke's reflections on the revolution in France
327-28	Shakespeare, William	(A) Midsummer night's dream; Tragedy of Othello, the Moor of Venice;
329-30	Shakuntala Sastri	(The) Bhagavadgita; woman in vedic age
331	Sharp, William	Life of Browning
332	Shaw, Bernard	Man and superman
333	Shaw, Graham	Printing in Calcutta to 1880
334	Shri Chattopadhyaya	Indian studies past & present
335		Shri Guruji meets Delhi Museum
336	Shyam Kanta Gupta	Sinners and saints : tales of Hinduism
337	Sillanpaa, F. E.	Meek heritage
338-9	Sisir Kr. Ghosh	(The) Later poems of Tagore ; Tagore for you

340	Slaughter, F. G.	Your body and your mind
341	Smite, F Seymour	Bibliography in the bookshop
342	Smith, B	Etiquette
343	Somnath Dhara	Kalhana
344	Somnath Roy	Recent historical studies about modern Bihar
345	Sri Aurobindo	(The)New thoughts in Indian Politics
346	Srikumar Banerjee	Leaves from English poetry
347	Stall, Sylvanus	Whata young husband ought to know
348	Standing, E· M.	Maria Montessori : her life and work
349	Steffernd, Alfred	(The) Wonderful world of books
350	Steinberg	500 years of printing
351	Stewart, William	(The) Plan and the Soviet
352		(The) Story of Serampore and its college
353	Stubbs, William	(The) Constitutional history of England
354	Subhas Chandra Sarkar	Love lyrics of Vidyapati
355	Subir Roy Choudhuri	Henry Derozio : the Eurasian poet and reformer
356 7	Sunil Kr Chatterjee	(The)Carey library pamphlets, Missions in India : a catalogue of the Carey library
358-59	Suniti Kr. Chatterjee	(The) Scholar and thes man ; In memorium
360	Swinburne, A. C.	Atalanta in Calydon
361	Taine, A. A	History of English literature
362	Tasny, Naum	Essays on the Soviet economy
363	Thackerey, W. M.	Vanity fair—a novel
364	Thompson, G. A.	(The) Technical college library
365	Thompson, John	(The)Penguin books of Australian verse
366		Treasures of West Bengal archives
367		(The) Truth that leads to eternal life
368	Tulsi Das	Kavitavali
369	Turgenev Ivan S.	Virgin soil
370		25 years of freedom
371	Uma Dasgupta	Santiniketan and Sriniketan : a his-cal introduction
372	V. P. Salgaonkar	Selections from Bertrand Russel
373	Vajpeyi J. N.	(The) Political movement in India, Vol. 1
374	Virgil	(The) Aneid

375	Voltaire	Candide
376	Walden	Henry David Thoreau
377	Walf Gagg Koller	Place of value in a world of facts
378	Walker, K	(The) Physiology of sex
379	Wallbank, T. Walter	(A) Short history of India and Pakistan
380	Ware, James R	(A) New translation : the sayings of Mencius
381	Webster, Hutton	Early European history
382	Wells, H. G.	To us Hungary
383	West, M.	Indian school management and inspection
384		Who's who of Indian writers
385	Wilson, Colins	A drift in
386	Wolo, A.	(A)Philosophic and scientific retrospect
387	Worsley, Peter	(The) Trumpet shall sound
388	Wren, P. C.	Lotus book of English verse

Besides these stray copies of some journals.

চিত্রা দেব ; রিজেন্ট পার্ক হাউসিং এস্টেট, ব্লক-১৮,
ফ্লাট-৭, ১৩১ নেতাজী সুভাষ বসু রোড, কলিকাতা-৪০
১। শংকর কবিচন্দ্রের মহাভারত—চিত্রা দেব, সং
জিজ্ঞাসা ; ১/এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯
১। কাব্যমীমাংসা—বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
২। বাংলা গদ্যচর্চায় বিদ্যাসাগর গোষ্ঠী—অপূর্বকুমার রায়
৩। রবীন্দ্র রচনা বীক্ষা—দেবব্রত মল্লিক
৪। বাঙালীর গীতচর্চা—নারায়ণ চৌধুরী
৫। নদী—সুপ্রিয় সেনগুপ্ত
৬। বাঙালী লেখকের রায়তচিন্তা—অরুণ মুখোপাধ্যায়
৭। দুঃখভরা—বসন্ত ঘোষাল
৮। মুদ্রণ শিল্পের গোড়ার কথা—যোগেশচন্দ্র বাগল
জীবন নাথ ; নগাঁও কলেজ, নগাঁও, আসাম ৭৮২০০১
১। স্বগত—জীবন নাথ
২। ত্রিনাথের পাঁচালী (সটীক)—ঐ
জীবন মুখোপাধ্যায় ; বিদ্যাসাগর কলেজ ; কলিকাতা
১। আনন্দমঠ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ—জীবন মুখোপাধ্যায়
তপোধীরকুমার রায় দস্তিদার ; ৩, সত্যেন দত্ত রোড, কলিকাতা-২০
১। শ্রদ্ধাঞ্জলি : পরমারাধ্য স্বর্গতঃ রজনীকান্ত রায় দস্তিদার মহাশয়ের শততম জয়ন্তী স্মরণে

তপোবিজয় ঘোষ ; ৩১ কলেজ রো, কলিকাতা-৯
১। নীলবিদ্রোহের চরিত্র ও বাঙালী বুদ্ধিজীবী—তপোবিজয় ঘোষ, ২ কপি
২। নীল আন্দোলন ও হরিশচন্দ্র—তপোবিজয় ঘোষ, ২ কপি
তীর্থবাস দাস ; ৩৭ রাজা মনীন্দ্র রোড, কলিকাতা-৩৭
১। পিছু ফিরে চায়—শ্রীতীর্থ (ছদ্মনাম)
দিলীপকুমার বিশ্বাস, সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা
১। রামমোহন সমীক্ষা—দিলীপকুমার বিশ্বাস
দেবব্রত ভট্টাচার্য ; ১৩ বি গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন, কলিকাতা-৯
১। নানা চোখে ঋষি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র—দেবব্রত ভট্টাচার্য ও অজয় চক্রবর্তী, যুগ্ম সং
দেবীশংকর চক্রবর্তী ; ৩৩ এইচ. দুর্গাচরণ মুখার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
১। বিপথের পাঁচালী—দেবীশংকর চক্রবর্তী
ধীরাজ বসু ; গোরাচাঁদ ভবন ১৮।১, সাহিত্য পরিষৎ স্ট্রীট কলিকাতা-৬
১। বিবেকানন্দ স্মরণিকা, ১৯৮২-৮৩ (১৩৮৯ ৯০)—রজত জয়ন্তী প্রকাশন—ধীরাজ বসু, সমর সরকার, সং
নিরঞ্জন দাস ; প্রযত্নে, কারেন্ট বুক শপ, ৫৭সি কলেজ রো, কলিকাতা-৭৩
১। প্রতীক্ষা—সুশীল আচার্য
২। তুমি কোথায়—মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়
নির্মলচন্দ্র চৌধুরী ; উত্তরবঙ্গ অনুসন্ধান সমিতি, পাণ্ডাপাড়া রোড, জলপাইগুড়ি
২। A Brief history of Varendra and other essays—Kshitish Chandra Sarkar
২। জলপাইগুড়ি জেলা আনন্দমঠ শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, ১৯৮২
৩। রায়কত বংশ ও তাঁহাদের রাজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ—জগদীন্দ্রদেব রায়কত।
পঞ্চানন মণ্ডল ; রাঢ় গবেষণা পর্ষদ, পল্লীশ্রী গ্রন্থাগার, রতনপল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম ৭৩১২৩৫
১। ভারতশিল্পী নন্দলাল, ১ম খণ্ড—পঞ্চানন মণ্ডল
পত্রলেখা পাবলিকেশন্‌স ; ১৪ এ টেমার লেন, কলিকাতা-৯
১। ছোটদের লেখা—বিপিনচন্দ্র পাল
পবিত্রকুমার মিত্র ; ১৭, ব্লক-ডি, বাঙ্গুর এভিনিউ, কলিকাতা-৫৫
১। অর্ঘ্যসঙ্গীত—পবিত্রকুমার মিত্র, (২ কপি)
২। অর্ঘ্য-বিচিত্রা — ঐ
পি. আর. কুণ্ডু (এজেন্টস) এণ্ড কোং ; পি-৪৭, এল. আই. সি-টাউনশিপ
১। নারীপ্রধান সমাজ কি ফিরে আসছে ?—প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডু ✓
২। মঙ্গল গ্রহের মানুষ— ঐ
৩। বন্দীর চিঠি—প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডু, কালীপদ ভট্টাচার্য, যুগ্ম সং
পুলকেন্দু সিংহ ; পাঁচথুপী, মুর্শিদাবাদ
১। মহাজীবনের কবিতা—পুলকেন্দু সিংহ
পুস্তক বিপণি ; ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯
১। পশুপতি সম্বাদ—চন্দ্রনাথ বসু, অলোক রায় সম্পাদিত
২। শুভবিবাহ—শরৎকুমারী চৌধুরাণী
৩। গণ-অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ—স্বপন বসু

প্রজ্ঞাভারতী ; ১ ন্যায়রত্ন লেন, কলিকাতা-৪

১। আপনার মুখ আপনি দেখ—ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

২। ফিরিঙ্গি বণিক—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

৩। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

৪। জগৎ শেঠ—নিখিলনাথ রায়

৫। গঙ্গাধর শর্মা ওরফে জটাধারীর রোজনামচা—চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রদীপকুমার সরকার ; অধ্যক্ষ, হীরালাল মজুমদার মহিলা মহাবিদ্যালয়, দক্ষিণেশ্বর

১। Hiralal Majumder Memorial College for Women: Silver Jubilee Souvenir, 1983

প্রভা রায় ; আনন্দলোক, ডি-২, ডি. আই. পি. রোড, কলিকাতা-৫৪

১। বাজলো সে বীণ—প্রভা রায়

প্রশান্তকিশোর রায় ; ৩২ এ লেক রোড, কলিকাতা-২৯

১। কিরীটি অমনিবাস

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্মিসংঘ ; কলিকাতা-৬

১। নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার, ১ম-৩য় খণ্ড—সাধন ভট্টাচার্য
রবীন্দ্রনাথ ও রাশিয়ার চিঠি—সোমেন্দ্রনাথ বসু
কবি ভারতচন্দ্র—সনাতন গোস্বামী
শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ—ধ্রুব মুখোপাধ্যায়
সারদামঙ্গল—বিমল মুখোপাধ্যায়
জনা—আশুতোষ ভট্টাচার্য

৭ রক্তকরবীর লোকায়ত ভাবনা—দীনেন্দ্র সরকার

৮ রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে—শুদ্ধসত্ত্ব বসু

৯ পুনশ্চের কবি রবীন্দ্রনাথ—সমীরণ চট্টোপাধ্যায়

১০ কবি শ্রীমধুসূদন—মোহিতলাল মজুমদার

১১ নাট্যকার মধুসূদন—ক্ষেত্র গুপ্ত

১২ সিরাজদ্দৌলা—ক্ষেত্র গুপ্ত, সং

১৩ বৈষ্ণব সাহিত্য—ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী

১৪ শাক্তসাহিত্য—ঐ

১৫ মেবার পতন—সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১৬ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প—প্রমথ বিশী

১৭ সুধীন্দ্রনাথের কাব্য বিচার—শুদ্ধসত্ত্ব বসু

১৮ কবি জীবনানন্দ দাশ—সঞ্জয় ভট্টাচার্য

১৯ কবি জীবনানন্দ—শুদ্ধসত্ত্ব বসু

২০ আধুনিক বাংলা কবিতা পাঠ—অরুণকুমার ঘোষ

২১ বাংলা মঙ্গলকাব্যের আলোচনা—গুপ্ত ও চৌধুরী

২২ বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (রাধাবিরহ খণ্ড)—চিত্তরঞ্জন সাহা

২৩ কল্লোলের কোলাহল ও অন্যান্য প্রবন্ধ—রবিন পাল

২৪ শরৎ সাহিত্যের ভূমিকা—সুরেশ মৈত্র

২৫ শরৎচন্দ্র—ভবানী মুখোপাধ্যায়

২৬। বাংলা ছোটগল্প—শিশির দাস

২৭। প্রশ্নোত্তরে এম. এ. বাংলা—নাটক, নাট্যমঞ্চ, নাট্যতত্ত্ব
২৮। „ —লোকসাহিত্য ও গীতিসাহিত্য
২৯। „ —মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব সাহিত্য
৩০। ডঃ অমরেশ দাস—রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : নবমূল্যায়ণ

বন্দিরাম চক্রবর্তী ; ৪০/১ ট্যাংরা রোড, ব্লক-ভি, ফ্ল্যাট-১২, কলিকাতা-১৫
১। পদার্থবিদ্যার নবযুগ—চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
২। ইন্দিরা গান্ধী—বন্দিরাম চক্রবর্তী

বাগবাজার রীডিং লাইবেরী ; ২ কে. সি. বোস রোড, কলিকাতা-৪
১। বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী শতবার্ষিক উৎসব
(১৬ই জুন, ১৯৮২-১৬ই জুন, ১৯৮৩) স্মারক গ্রন্থ ১৯৮৩।

(শ্রীশ্রী) বিজয়কৃষ্ণ সাধন আশ্রম ; পো : নরেন্দ্রপুর/২৪ পরগনা,
১। বাণী-সঞ্চয়ন—ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী, সং
২। শ্রীশ্রীবিজয়লীলা-গাথা—অমিয়ভূষণ দাশগুপ্ত
৩। নির্জন প্রহর—পরমানন্দ সরস্বতী
৪। আনন্দ জাতক— ঐ
৫। পুনর্বসু— ঐ
৬। উত্তর মীমাংসা ও অন্যান্য রচনা—ঐ
৭। নিঃসঙ্গ মাথুর— ঐ
৮। কালমৃগয়া— ঐ
৯। পঞ্চমুখ— ঐ
১০। বপারা— ঐ
১১। অক্ষর, ১ম খণ্ড—ঐ
১২। অক্ষর, ২য় খণ্ড—ঐ
১৩। নির্জন স্বাক্ষর— ঐ
১৪। অভিজ্ঞান— ঐ
১৫। বহুরূপী— ঐ
১৬। নিগম— ঐ
১৭। অন্তরঙ্গ— ঐ
১৮। বসন্ত-বহ্নি— ঐ
১৯। আহিতাগ্নি— ঐ

বীরেন্দ্র মল্লিক ; ৪৬, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট, কলিকাতা-৭
১। কাল থেকে আমার নাম ময়ূরাক্ষী—বীরেন্দ্র মল্লিক, (২ কপি)
২। অপহৃতা—বীরেন্দ্র মল্লিক
৩। শেষ কথা— ঐ

বীরেন্দ্রচন্দ্র সরকার ; গাঙ্গুলীবাগান (গড়িয়া), কলিকাতা-৮৪
১। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র—বীরেন্দ্রচন্দ্র সরকার

বেঙ্গল পাবলিশার্স ; ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
১। নগর দর্পণে—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
২। জন্মান্তর রহস্য—তারাপ্রসন্ন ব্রহ্মচারী
৩। মল্লিকা—বিমল কর
৪। বিশ্বক্রীড়া অলিম্পিক—অজয় বসু

৫। আমার ফাঁসি হল—মনোজ বসু
৬। ঝরা বকুলের গন্ধ—নীহাররঞ্জন গুপ্ত
৭। ত্রিশূল তীর্থের পথে—সুনীল চৌধুরী
৮। নীল দরিয়ায়—অজিত চট্টোপাধ্যায়

ভবতোষ দত্ত ; বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম
১। সাহিত্যমেলা—শান্তিনিকেতন, ২৭ ২৮ নভেম্বর, ১৯৮২, ২ কপি

ভবানীকুমার ঘোষ সহকারী গ্রন্থাগারিক, ব্রিটিশ কাউন্সিল গ্রন্থাগার, কলিকাতা
১। রেফারেন্স সার্ভিস প্রসঙ্গ: তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক—দীপককুমার রায় ও ভবানীকুমার ঘোষ

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড ; ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩
১। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য স্বদেশপ্রেম—অঞ্জলি কাঞ্জিলাল
২। আমার এলোমেলো জীবনের কয়েকটি অধ্যায়—উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

মণ্ডল বুক হাউস ; ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯
১। লস্ট আটলান্টিস—চিরঞ্জীব সেন
২। রামকৃষ্ণ ও তাঁর শিষ্যগণ—ক্রিস্টোফার ইশারউড, অনু০ রবিশেখর সেনগুপ্ত
৩। আশাপূর্ণা দেবীর বাছাই গল্প—আশাপূর্ণা দেবী
৪। সুর নৃত্যের উর্বশী—শঙ্করীপ্রসাদ বসু
৫। অমরাবতী আসাম—শঙ্কু মহারাজ
৬। বিস্ময়—সুবোধকুমার চক্রবর্তী
৭। সুধীন্দ্রনাথের কাব্যবিচার—শুদ্ধসত্ত্ব বসু
৮। শংকর-নর্মদা—নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
৯। অলঙ্কার জিজ্ঞাসা—শুদ্ধসত্ত্ব বসু
১০। আমি ও আপনারা—আশাপূর্ণা দেবী

মনুজচন্দ্র সর্বাধিকারী ; ১৫ এ, শ্রীনাথ মুখার্জী লেন, কলিকাতা-৩০
১। ক্রীড়া সম্রাট: নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী—শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ
২। প্রাচ্য দেশীয় শিল্পে দুর্গা প্রতিমা—মনুজচন্দ্র সর্বাধিকারী

মনোমোহন প্রকাশনী ; ৫৪/৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩
১। হুতোম প্যাঁচার নক্শা, আলালের ঘরের দুলাল, সমাজ কুচিত্র—কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাঁদ মিত্র, ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (২ কপি)

মলয় সিকদার ; বাণী পাবলিকেশন, ৩০ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলিকাতা-৯
১। কলিঙ্গযুদ্ধের প্রান্তরে—মলয় সিকদার

মহাদিগন্ত প্রকাশ সংস্থা ; বারুইপুর, ২৪ পরগনা
১ ভারতবর্ষের একজন—উত্তম দাশ
২ এই স্রোত, ইতিহাস—সূর্যকান্ত বসু
৩ দীর্ঘতম রাত্রি আসে—ক্ষিতীশ দেব সিকদার

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স ; ১০ শ্যামচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩
১ সব ফুল ফোটে না—মন্মথনাথ ঘোষ
২ লাদাকের পথে—শঙ্কু-মহারাজ
৩ বাসভূমি—সমরেশ মজুমদার
৪। পালামৌর জঙ্গলে—উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
৫। পয়সা পরমেশ্বর—বিমল মিত্র

৬। আর এক উপন্যাস—গজেন্দ্রকুমার মিত্র
৭। আপন ঘরে—প্রফুল্ল রায়
৮। দেবী মাহাত্ম্য—প্রবোধকুমার সান্যাল

যোগমায়া প্রকাশনী ; ৪ নারকেলডাঙ্গা নর্থ রোড, ব্লক-সি/ফ্লাট-৩, কলিকাতা-১১
১। সোনার দাগ—গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ
২। সরস গল্প—পার্থ চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
১। আমরা আজও কেন অন্ধকারে—দেবশিশু (ছদ্মনাম)

শ্রীমতী রমা মিত্র ; ৯/৬ ফার্ন রোড, কলিকাতা-১৯
১। সজনীকান্ত দাস [১৯০০-১৯৬২]—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (২ কপি)

রেবতীমোহন গুপ্ত ; অমৃতবাজার পত্রিকা, বার্তাবিভাগ, কলিকাতা-৪
১। অপরাধতত্ত্ব : অপরাধজগত—সুনীলকুমার মিত্র
২। খেলাধূলার বিচিত্র কাহিনী—শচীন সেন

ললিত কলা অ্যাকাডেমি ; রবীন্দ্র ভবন, নিউ দিল্লী-১১০০০১
১। ভারতশিল্পী নন্দলাল—পঞ্চানন মণ্ডল

শঙ্কর রুদ্র ; ৩/এ বিডন স্কয়ার, কলিকাতা-৬
১। ভজগোবিন্দ অ্যাডভেঞ্চার : প্রথম পর্ব—অতীতে পাড়ি—শঙ্কর রুদ্র

শশাঙ্ক হাইত ; গ্রাম কনকাসাই, পোঃ পশরআড়া, ভায়া মাদপুর, জেলা মেদিনীপুর
১। প্রতিশব্দ—শশাঙ্ক হাইত
২। ঐ, পরিবর্ধিত সং—ঐ

শিব মুখোপাধ্যায় ; ২৪ বনমালী চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-২
১। গানবাজনা শেখো—বৈদ্যনাথ ঘোষ

শিবদাস চক্রবর্তী ; পি ১২৪/১, ব্লক-এ, লেক টাউন, কলিকাতা-৮৯
১। সঙ্গীত কলিকা—শিবদাস চক্রবর্তী (২ কপি)
২। বিপিনচন্দ্র পাল : জীবন সাহিত্য ও সাধনা—শিবদাস চক্রবর্তী

শীতল ঘোষ ; গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ, গোবরডাঙ্গা
১। বাংলা নাটকে ট্রাজেডি তত্ত্বের প্রয়োগ—শীতল ঘোষ

শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ ; ১২ বি মোহন বাগান লেন, কলিকাতা-৪
১। মাসিক পত্রিকা—বালম ২নং ৪-১ অগ্রহায়ণ ১২৬২, পৃ ৩১ নং (১২—১ শ্রাবণ ১২৬৩) পৃ. ১৪৪ পর্যন্ত
২। বেশ্যাশাস্ত্র—মুকুন্দলাল চট্টোপাধ্যায়

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ; ২৫ মহিম হালদার স্ট্রীট, কলিকাতা-২৬
১। ব্রেশট ও তাঁর থিয়েটার—সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার ; ২৯/এ কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
১। পটভূমি কাঞ্চনজঙ্ঘা—সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

সন্তোষকুমার দে ; ১৬৪ কবি নবীন সেন রোড, কলিকাতা-২৮
১। শেষ সঞ্চয়—সন্তোষকুমার দে

সপ্তর্ষি ; ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩
১। কুয়াশা—এম. টি. বাসুদেবন নায়ার, ভাষান্তর আশিস সান্যাল
২। মার্কসবাদের বিচারে রামমোহন—এবাদত হোসেন
৩। যুধিষ্ঠিরের রথের চাকা—অমল আচার্য

৪। ঘাতক—বরেণ গঙ্গোপাধ্যায়

সমকাল প্রকাশনী ; ৮/২ এ গোয়ালটুলি লেন, কলিকাতা-১৩

১। সিরাজদ্দৌলা—শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

সম্পাদক, কিশোর বাংলা, মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ; পোঃ রিশড়া (হুগলী), ৭১২২৪৮

১। কিশোর বাংলা, শারদীয় বার্ষিক সংকলন, ১৩৯০—সন্তোষকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, সং

সম্পাদক, চাঁদসী সম্মিলনী ; ৩৫/৯ অভয় বিদ্যালঙ্কার রোড, কলিকাতা-৬০

১। চাঁদসী পুরাণ—জগদীশচন্দ্র মুখার্জী

সারস্বত সংস্কৃতি সংস্থা ; ১১৭ একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১৯

১। হে মহাজীবন—স্মরণ অর্ঘ্য

সাহিত্য প্রকাশ ; ৬০ জেমস লঙ্ সরণি, কলিকাতা-৩৪

১। শেক্সপীয়র ও বাঙলা নাটক—সনৎকুমার মিত্র

সাহিত্যলোক ; ৩২/৭ বীডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ (১ম খণ্ড)—দীনেশচন্দ্র সরকার

ঐ, (২য় খণ্ড)—ঐ

পাল সেনযুগের বংশানুচরিত—ঐ

ভারতশিল্পের কথা—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

গৌড়ের কথা—ঐ ✓

৬ প্রাচীন কলিকাতা—নিশীথরঞ্জন রায় ও অশোক উপাধ্যায়, সং

সুকুমার মিত্র ; এ ৯২/৮ কালিন্দী হাউসিং এস্টেট, কালীদহ, কলিকাতা-৮৯

কার্ল মার্কস : যুগ থেকে যুগান্তর—সুকুমার মিত্র

তাপস স্মরণে

৩ বাঁকাউল্লার দপ্তর—সুকুমার সেন, স'

উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহের চিত্র—সুকুমার মিত্র

৫ মহানগর, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা-৬ষ্ঠ সংখ্যা

৬। „ , ২য় খণ্ড—১ম-১২শ সংখ্যা

৭। শারদীয় দেশ, ১৩৮৯

৮। অর্থশাস্ত্র বিকাশের ধারা—আন্দ্রেই আনিকিন, বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়, অনু·

৯। পবিত্রতার অদল-বদল—কেশব দাশ

১০ পরিচয়, ৫১ বর্ষ, ১২ সংখ্যা—৫২ বর্ষ, ৫ সংখ্যা

১১ পরিচয়, ৫২ বর্ষ ৬-১২ সংখ্যা

১২ The Carey exhibition of Early printing and fine printing at the National Library, Calcutta, 1955

১৩ Leo Tolstoy : 50 th birth anniversary, Nov. 21-27, 1[illegible]0.

১৪ A Brief history of the Statesman

১৫ Leonid I. Brejhnev : pages from his life.

১৬ Small land re-birth—L. I. Brejhnev

১৭ A Short history of the world—H. G. Wells

১৮ স্বাধীনতা সংগ্রামে দ্বীপান্তরের বন্দী—নলিনী দাস

১৯ মূল্যায়ন, ৩য় বর্ষ, ১৩৭৪, বৈশাখ-চৈত্র

২০ „ ৪র্থ বর্ষ, ১৩৭৫, বৈশাখ-চৈত্র

সুজিত চৌধুরী ; ৮ বি পাইকপাড়া রো, কলিকাতা-৩৭
১। দেশলোক : সংবাদ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা, ১৯৮১, ১৫ আগস্ট—১৯৮২, ১ আগস্ট

সুজিত কুমার পালিত ; ৪ জগদীশনাথ রায় লেন, কলিকাতা-৬
১। পণ্ডিচেরী কত দূর—সমর বসু (২ কপি)

সুনীল রাহা ; ১৭/৯৭ সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্ট কোয়ার্টার্স, পর্ণশ্রী, কলিকাতা-৬০
১। মহাত্মা শ্রীহরিপদানন্দ— সুনীল রাহা
২। ঠাকুর শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল—শ্রীমৎ পরমানন্দ অবধুত
৩। বংশপর্য্যায় আট মুহুরী মজুমদার বংশ—মনোজকুমার মজুমদার
৪। অনিন্দ্যসুন্দর শ্যামসুন্দর—সুনীল রাহা

সুনীলময় ঘোষ, প্রযত্নে-ঘোষ দস্তিদার পাবলিশিং কনসার্ন ; ৯/১ টেমার লেন, কলিকাতা-৯
১। সাহিত্য-সম্মেলন পরিক্রমা—সুনীলময় ঘোষ

সুবোধ সেনগুপ্ত ; দাসপুর, মেদিনীপুর
১। শ্রীশ্রীচণ্ডী (মহিষাসুর বধ)

সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় ; ১২এ রাজা গোপেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৫
১। Christ the Saviour and Christ myth—Swami Prajnananda

হরেন্দ্রনাথ সমাদ্দার (ভগ্নদূত) ; হরগৌরীধাম, নন্দনপল্লী, কলিকাতা-৮
১। পরিচয় (কাব্যগ্রন্থ)—ভগ্নদূত
২। স্মরণিকা- ১৯৮১ (নমঃশূদ্র জাগরণের শতবর্ষ পূর্তি উৎসব ও সম্মেলন)

হৃষীকেশ ঘোষ ; ৩৯-এ ধর্মতলা লেন, শিবপুর, হাওড়া-২
১। মহানকে প্রণাম—হৃষীকেশ ঘোষ
২। How to increase your word power
৩। International review of modern sociology, vol. 6, no. 1, Spring 1976
৪। Issues and Themes
৫। Isolation or interdependence ? ..tomorrow's world—Morton A. Kaplan
৬। Democracy : theory and practice—C. R. Irani
৭। Press freedom and human rights—C. R. Irani
৮। Socialism in rich countries and poor—John. K. Galbraith
৯। On Planning and finance in India—A. D. Shroff
১০। In the human interest—Lester R. Brown
১১। Mass communication : the press—N. S. Jagannathan, *ed.*
১২। Disciplined democracy : quest for stability—Rajni Patel
১৩ Nickel mountain—John Gardener
১৪ Communication via public speaking—Hari Chaudhuri
১৫ Vat and some other indirect taxes
১৬ Stay younger live longer...—J. V. Carney
১৭ Secret of success in interview—S. K. Sachdeva

১৮। Man and Environment D. M. Kalapesi
১৯। Humanity and God—Ranajit Kr. Baksi
২০। Indian women—Devaki Jain, *ed*
২১। The Consumer in India—Krishna Basrwe, *ed*
২২। Peace, food and the aged—Hrishikesh Ghosh
২৩। Today's academic condition—S. B. Gould
২৪। Sri Aurobindo & navajata
২৫। Trade unions in a democracy V. B. Karnik
২৬। Guru Gobind Singh, book I
২৭। Yogic cure for common disease—Dr. Phulgenda Sinha
২৮। This is it—Sudhir Dut
২৯। Twentieth century socialism
৩০। The Public sector : a manager's report—I. C. Lal
৩১। Pluralism & mixed economy—a basis for centre-state relations —V K. Narasimhan
৩২ Commerce pamphlets series, vol 1-4—Rohit Dave, *ed.*
৩৩ Commerce pamphlet, 73, 75, 76, 78-81, 87-91, 95, 107
৩৪ Leadership : India's greatest shortage—S. H. F. J. Manekshaw
৩৫ The world of Gurus—Vishal Mangalwadi
৩৬ Why scarcities D. R. Pendse & others
৩৭ The Inside out of CIA—Pauly Parakal
৩৮ The Theory of the leisure class—T. Veblen
৩৯ Earth resources—C. F. Perk, *ed*
৪০ Let us Know Gandhiji—U. R. Rao
৪১ The voyages of Apollo & the exploration of the Moon—R.S.Lewis
৪২ Vikas Encyclopaedia of general Knowledge—S. K. Sachdeva
৪৩ The Future of motherhood—J Bernard
৪৪ The Role of mass media—Mehra Masani
৪৫ The Oil crisis in India—G. Murthy & F. P. Antia
৪৬ Consumerism—M. C. Munshi
৪৭ The Light of the constitution—N. A. Palkhivala
৪৮ The Tasks before a free people—N. A. Palkhivala
৪৯ A Solution to the housing problem in India—H. T. Parekh
৫০ The Position of women in India—G. Despande
৫১ Sri Aurobindo : his life and teachings—Sankarprasad Mitra
৫২ Some questions and the child—H. Ghosh
৫৩ দালাই লামা : স্বদেশ ও স্বজন—অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়, অনু:
৫৪ শ্রীনিত্যানন্দ : সমীক্ষা ও পরিক্রমা—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর
৫৫ মহাকবি কালিদাসের সিদ্ধি-স্থান মাহাত্ম্য—তারাপদ ঘোষ
৫৬ মহাকবি কালিদাসের বাঙ্গালীত্ব— ঐ
৫৭ শিশুর জনমন আখ্যায়িকা—বুধ মুনী ; পরীক্ষিৎ, অনু:
৫৮ ভারত ও ভবিষ্যৎ—সুধাংশু গুপ্ত

৫৯। ছিন্ন ছন্দাংশ — হৃষীকেশ ঘোষ
৬০। ভূষি কেলেংকারী—হলধর পটল
৬১। আর্থনীতিক বিকাশের স্তর—ডব্লিউ. ডব্লিউ. রসটো ; নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, অনু°
৬২। অন্যদিন—সুধীর বেরা
৬৩। মস্ত ঘরের দরজা—মুকুল ভট্টাচার্য
৬৪। রূপের খেয়া—টেনেসি উইলিয়ামস
৬৫। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ১ম ভাগ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর
৬৬। ঐ " " ২য় ভাগ—ঐ
৬৭। পরিবার কল্যাণের ধারা হৃষীকেশ ঘোষ
৬৮। জা নের খতিয়ান—হেনরি জেমস ; গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, অনু°
৬৯। শিক্ষা, সাক্ষরতা, নিরক্ষরতা—হৃষীকেশ ঘোষ
৭০। মার্কিন সুরকারদের জীবন কাহিনী—সি. এল. বেক্লেস ; সুধীর চক্রবর্তী অনু°

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, ৪১ দেব লেন কলিকাতা-১৪

১ বন্দে মাতরম—যোগীন্দ্রনাথ সরকার, সঙ্ক°
২ কুরুক্ষেত্র সংবাদ—চন্দ্রশেখর মিশ্র
৩ ঈশ্বরাশ্রয় দর্শন—রামচন্দ্র অধিকারী
৪ স্বদেশ মঙ্গল—অমরেন্দ্রনাথ রায়
৫ আমার দেশ—সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
৬ নিশান নাও—ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৭ যুধিষ্ঠিরের সময়—হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য
৮ নিজ প্রকাশিত মহাভারতের ইতিহাস—ঐ
৯ উদ্বাস্তু : দণ্ডকারণ্য ও আন্দামান—দুর্গাদাস আচার্য
১০ শক্তিসাধনা—অপর্ণাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
১১ রুক্মিণী মাহাত্ম্য— ঐ
১২ মুরাপাড়ার জমিদার পরিবার—সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩ Annie Besant and the changing world—Bhagavan Dasgupta
১৪ মহাত্মা সুধীররঞ্জন সেনগুপ্তের সংক্ষিপ্ত পরিচয়
১৫ A Short life of Mahamahopadhaya Haridas Siddhantabagis
১৬ স্বাধীনতার অগ্রদূত : অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার সংস্থাপিত হওয়ার রৌপ্য জয়ন্তী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে
১৭ যেখানে জীবন—মৃণাল করগুপ্ত
১৮ চিত্ত যেথা ভয়শূন্য : দেশাত্মবোধক কবিতার সংকলন
১৯ সুতানুটি গেজেট : অথ কলিকাতা কাহিনী (পুস্তিকা)
২০ দেশের গান—পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকর্তার পক্ষ থেকে প্রকাশিত
২১ চাণক্যশ্লোক:—হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য সাহিত্যবিনোদ
২২ স্বদেশী সঙ্গীত—মুরারি দে, সং
২৩ স্বদেশী কবিতা—প্রভাত বসু, সং
২৪ কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা—আশুতোষ ভট্টাচার্য, সং
২৫ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অজিতকুমার চক্রবর্তী

॥ আলোচনা ॥

॥ কৃষ্ণলীলামৃত সিন্ধু ॥

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় [৯০ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা—পৌষ ১৩৯০] কৃষ্ণলীলামৃত সিন্ধুর রচনাকাল সম্বন্ধে শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল মহাশয়ের আলোচনা পড়লাম। এর আগে ডঃ বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রমীলার উৎস সন্ধানে—দেশ পত্রিকায় পড়েছিলাম। যা হোক্ হাতে তথ্য ও প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও, গত ৪/৫ বছর ধরে অসুস্থ থাকার জন্য নিজেকে ঐ বিষয়ে যুক্ত করিনি। শ্রীযুক্ত কয়াল মহাশয় আমার গবেষণার বিষয়ে খোঁজ রেখেছেন জেনে সুখী হলাম। শ্রীযুক্ত কয়াল মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানাই:—
(ক) "কৃষ্ণলীলামৃত সিন্ধুর মূল পুঁথি"-১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভুলুই গ্রামেরই ২/৩ কিলোমিটার দূরে"ভাড়া" গ্রামের এক শ্রদ্ধেয় অশীতিপর বৃদ্ধ আমার হাতে তুলেদিয়ে বলেছিলেন—"তোমাকে আসল জিনিস দিয়ে দিলাম; যদি কিছু করতে পার কো'র।" তিনি হয়ত গ্রন্থটির প্রচার বা প্রকাশ চেয়েছিলেন।

(খ) পুঁথিটি যে মূল পুঁথি সে বিষয়ে কাগজ, কালি, লেখার ছাঁদ, ও পাটার উপর অঙ্কিত ছবি দেখলেই বুঝতে পারা যায়। এই বৈজ্ঞানিক যুগে কোন্ পুঁথি আসল আর কোনটি নকল তা প্রমাণ করতে বেশী সময় লাগে না। বৃদ্ধ পুঁথিটি বত্নযত্নে রেখেছিলেন; এবং অখণ্ড [আদি অন্ত] পুঁথিই আমার কাছে দিয়েছিলেন। পুঁথি আমার কাছে আছে; কয়াল মহাশয় আমার বাড়ীতে এসে দেখে যেতে পারেন—এবং আমার মনে হয় তাঁর তীব্র দৃষ্টি ও বিবেচনা বোধ থেকে সহজেই বুঝতে পারবেন আসল-নকলের প্রভেদ।

(গ) রামপ্রসাদ যে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক একখানি কাব্য লিখেছিলেন এ কথা ডঃ দীনেশ সেন মহাশয় ও ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় তাঁদের সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আসল নাম কিন্তু তাঁরা জানতেন না বা পুঁথিও দেখেন নি। বসন্তরঞ্জন মহাশয় মূল পুথির নকলীকৃত আদি লীলার কিছু অংশ পেয়েছিলেন। এ ছাড়াও আমি ভুলুই [কবির গ্রাম] অঞ্চলেও দু-এক জনের কাছে অতি সামান্য নকল করা পৃষ্ঠাও দেখেছি। পুঁথিটি সুবিপুল ও সুসম্পূর্ণ। মূল সম্পূর্ণ পুঁথির আবিষ্কর্তা কে—এ বিচার শ্রীযুক্ত কয়াল মহাশয় আমার পুঁথি দেখলেই বুঝতে পারবেন।

(ঘ) কোন অপ্রকাশিত নূতন পুঁথির উপর গবেষণা করলে মূলপুঁথির অনুলিপি (copy) গবেষণা গ্রন্থের উপর দিতে হয়। তা না হলে পরীক্ষক কি করে পরীক্ষা করবেন। আমি মূল পুঁথিটি প্রায় চার বছর ধরে copy করেছি। তিনটি copy তিনজন পরীক্ষকের জন্য ও এক copy আমার কাছে আছে।

(ঙ) Fools cap কাগজে ডুকলমে লিখে পুঁথিটির নকল করে ৬০০ পৃষ্ঠা হয়েছে। এর সঙ্গে গবেষণা অংশ ৩৮০ পৃষ্ঠা। পুঁথিটি ছাপলে হাজার পৃষ্ঠারও বেশী হবে।

(চ পুঁথিতে সুস্পষ্ট অক্ষরে শেষ পৃষ্ঠায় রচনা কাল দেওয়া আছে। আমার গবেষণা গ্রন্থে শেষ পৃষ্ঠার Photostart copy দিয়েছি।

(জ) শ্রীযুক্ত কয়াল মহাশয়কে জানাই আমার পৈতৃক নিবাস তিরাট গ্রামে। কবির গ্রাম থেকে চার মাইল হবে। ঐ ভুলই,ভাড়া, অর্ধগ্রাম, মেজিয়া, কালিকাপুর অঞ্চলে শৈশব থেকেই আমার যাতায়াত। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত কয়াল মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে জানাইযে—

এই সব অঞ্চলে এবং আসানসোল, রাণীগঞ্জ, মেজিয়া, শালতোড়া এই বিস্তৃত রাঢ় অঞ্চলের গ্রামে "রাম" শব্দে এক ধরা হয়। আমরা ছোটবেলা থেকেই ধান মাপবার সময় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের বল্‌তে শুনেছি ও শুনি,—"রাম, দুই, তিন ·· ইত্যাদি।" তবে শ্রীযুক্ত কয়াল মহাশয়ের সঙ্গে আমি একমত যে রাম শব্দে পণ্ডিত মহলে তিন ধরা হয়।

কৃষ্ণলীলামৃত গ্রন্থ গ্রামে গীত হওয়ার জন্য রচিত। **পুঁথির মধ্যভাগে** কবি নিজ বংশ পরিচয় সহ সবই লিখে রেখেছেন।—পুঁথিটির এইটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কৃষ্ণ-লীলামৃত সিন্ধুর সুসম্পূর্ণ পুঁথি আমি নকল করে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়েছি। পুঁথি আমার হাতে আছে। গ্রন্থটির কতকগুলি বিশেষ দিক আছে। শ্রীযুক্ত কয়াল মহাশয়কে আমন্ত্রণ জানালাম—পুঁথি দেখার জন্য ও সাক্ষাতে আলোচনার জন্য।

[কবে কখন আসবেন আগে থেকে জানালে ভালো হয়।]

পরিষৎ সংবাদ

১৩৯০ বঙ্গাব্দের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশ করিতে অভাবিত বিলম্ব ঘটিল। তাহার জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ ছাড়া অন্য কোন কারণ দেখান সম্ভব নহে।

এই সংখ্যায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার নব্বই বছর পূর্ণ হইল। অবশ্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল ৮ই শ্রাবণ, ১৩০০ বঙ্গাব্দ ২৩ জুলাই ১৮৯৩। তখন এই প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল দি বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার।' এবং এই নামেই আগষ্ট, ১৮৯৩ হইতে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে। এই পত্রিকা প্রথমে ইংরাজীতে এবং পরে ইংরেজী ও বাঙ্গালা দ্বিভাষায় একত্রে প্রকাশিত হইত। এই পত্রিকার অষ্টম সংখ্যা অর্থাৎ মার্চ, ১৮৯৪ পত্রিকার শিরোনামায় নাম দি বেঙ্গল একাডেমী অব লিটারেচারের পূর্বে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' নাম মুদ্রিত হয়।

ফাল্গুন, ১৩০০ বঙ্গাব্দে বাঙ্গালায় প্রতিষ্ঠানের নামকরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক পরিবর্তন ঘটে। ১৩০১ বঙ্গাব্দ হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের যথার্থ কার্যক্রম শুরু করা হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম বার্ষিক কার্য-বিবরণে আছে :

"কিঞ্চিদূন দুই বৎসর পূর্বে, ১৮৯৩ অব্দের জুলাই মাসের ২৩শে তারিখে কলিকাতা শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটে শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ২/২ ভবনে বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার নামে একটি সভা স্থাপিত হয়।...

১৩০১ সালের ১৭ বৈশাখ রবিবার অপরাহ্ণে পূর্বোল্লিখিত বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার, বর্তমান ভিত্তির ওপর পুনর্গঠিত করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ নামে অভিহিত হইল।"

তখন হইতে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার বয়স গণনা করা হয়। আমাদের এই আর্দ্র বায়ুর দেশে একটি প্রতিষ্ঠান ও তাহার গবেষণাধর্মী। মুখপাত্রের নব্বই বৎসর আয়ু তাই গর্বের বিষয়। নানা ঝড়-ঝঞ্ঝা অতিক্রম করিয়া এই পত্রিকা অগ্রসর হইয়াছে। পত্রিকা সম্পাদনারও নানা রীতি বদল হইয়াছে। আশা করিয়াছিলাম নব্বই বৎসর পূর্তি উপলক্ষে তাহার একটি পরিচয় প্রকাশ করিতে পারিব কিন্তু অনিবার্য কারণে তাহা সম্ভব হয় নাই। আশা রাখি, এই গৌরবোজ্জ্বল পত্রিকা ভবিষ্যতে আরও দক্ষতার সঙ্গে প্রকাশিত হইবে।

শোক-সংবাদ

১৩৯০ বঙ্গাব্দের মাঘ হইতে চৈত্র এই কার্যসীমার মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য বিখ্যাত সাহিত্যিক নলিনীকান্ত গুপ্ত, পরিষদের বর্ষীয়ান সদস্য রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিষদের প্রাক্তন সহ-সভাপতি এবং লোক সাহিত্যের বিখ্যাত গবেষক ও অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য, প্রখ্যাত দার্শনিক কালিদাস ভট্টাচার্য এবং খ্যাতনামা সাংবাদিক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হইয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি বিভিন্ন অধিবেশনে প্রয়াত ব্যক্তিগণের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া শোক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

আনন্দ সংবাদ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছেন। পরিষদের বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক

জগদীশ ভট্টাচার্য 'রবীন্দ্র তত্ত্বাচার্য' উপাধি লাভ করিয়াছেন। পরিষদের বর্তমান অন্যত সহকারী সভাপতি শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত 'বাংলা নাট্যশালার শতবার্ষিকী' পদক .. করিয়াছেন। কার্যনির্বাহক সমিতি গভীর আনন্দের সঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প হইতে ডঃ সুকুমার সেন, অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য এবং শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্তকে আন্তরি অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছেন।

স্মরণ সভা

১৩ই ফাল্গুন, ১৩৯০ সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একনি সেবক, প্রয়াত সাহিত্যসেবী নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের শতবার্ষিক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য। শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত বিশেষ অতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

সভায় স্বর্গীয় নলিনীরঞ্জনের একখানি তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। চিত্রখানি নলিনী রঞ্জনের দৌহিত্রী শ্রীমতী জয়শ্রী চক্রবর্তী পরিষৎ মন্দিরে উপহার দিয়াছেন। বিশিষ্ট অতি ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল নলিনীরঞ্জনের স্মৃতিচারণ করেন।

আজীবন সদস্য নির্বাচন

১৯শে ফাল্গুন, ১৩৯০ এবং ১৭ই চৈত্র, ১৩৯০ দুইটি মাসিক অধিবেশনে নিম্নোক্ত ব্যক্তি গণের আজীবন সদস্যপদ গ্রহণের আবেদনপত্র গৃহীত হইয়াছে।

১। শ্রীবলাইচন্দ্র পাল ৮০/১৩এ গৌরীবাড়ি লেন, কলিকাতা-৪

২। শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য ১০ রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

৩। শ্রীসুশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ১১এ রাজাগোপেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাত-৫

ন্যাসরক্ষকের শূন্যপদ পূরণ

১৭ই চৈত্র, ১৩৯০ তারিখের মাসিক অধিবেশনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ন্যা রক্ষকের শূন্যপদে শ্রীপ্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়কে ন্যাসরক্ষক সমিতির অন্যতম সদস্যহিসা মনোনীত করা হইয়াছে।

নব্বইবছর পূর্তি সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান পত্রিকাধ্যক্ষের পাঁচবছ কার্যকালও শেষ হইল। সেইজন্য পত্রিকাধ্যক্ষের পক্ষ হইতে পত্রিকা প্রকাশের স সংশ্লিষ্ট সকলকে পত্রিকা প্রকাশে সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

R. N. 41097/81

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত

মূল্য—ত্রিশ টাকা

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১ম খণ্ড : টা: ২০.০০

২য় খণ্ড : টা: ৩০.০০

বাংলা সাময়িক পত্র

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১ম খণ্ড : টা: [illegible]

২য় খণ্ড : টা: [illegible]

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

(১৭৯৫-১৮৭৬)

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডঃ সুশীলকুমার দে লিখিত ভূমিকা

পঞ্চম সংস্করণ। মূল্য—৩০.০০

বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক

(মধ্যযুগ)

ডঃ জগদীশনারায়ণ সরকার

মূল্য—১০.০০

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

১ম হইতে ১৪শ খণ্ড। মূল্য—২৩০.০০

বাংলার সাহিত্যিকগণের প্রামাণ্য জীবনী ও গ্রন্থসূচী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক শ্রীকানাইচন্দ্র পাল পি-এইচ্.ডি. (লণ্ডন) ব্যারিস্টার-এট্-ল, কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীহরি প্রিণ্টার্স, ১২২/৩, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৪ হইতে শ্রীমতী রেখা দে কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য : চার টাকা